মক্কার প
The Road To Mec
ca

"The Road to Macca" গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ। গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক শাহেদ আলী।

'মক্কার পথ' লেখকের নাটকীয় জীবনের বহু কথা তিনি অবলিলাক্রমে ব্যক্ত করেছেন। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন— এর বাহ্য জাকজমকের অন্তরালে লুকায়িত অতল-গর্ভ শূন্যতাকে দুনিয়ার সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে, তিনি সাংবাদিকতার উদ্দেশ্যে জেরুযালেম আসেন এবং আরবদের জীবন পদ্ধতির প্রতি আকৃ

উৎসর্গ

স্বকীয় তাহযীব তমদ্দুনের ভালোবাসায়
গর্বিত, আনন্দ-স্নাত,
একান্ত শুভানুধ্যায়ী, অগ্রজ-প্রতিম
শামসুল হুদা চৌধুরী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

"দুটি কথা"

'মক্কার পথ' প্রখ্যাত চিন্তাবিদ, লেখক ও সাংবাদিক মুহাম্মদ আসাদ কর্তৃক লিখিত 'The Road to Mecca' গ্রন্থ এর অনুবাদ। মুহাম্মদ আসাদ জাতিতে ছিলেন ইহুদী। কিন্তু কিশোর বয়সেই তিনি ইহুদী ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। বয়োবৃদ্ধির সংগে সংগে তিনি পাশ্চাত্যের নব্য আধুনিক জীবন-পদ্ধতি ও তার জীবনাচরণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। একদিকে পাশ্চাত্যের জড়বাদী ভোগবাদ, অন্যদিকে যাজকদের অপার্থিব শরীর-বিমুক্ত আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা তাঁকে পাশ্চাত্য বলয় থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং তাঁকে প্রাচ্যমুখী করে তোলে। তিনি আরবীয় এবং দেহ ও আত্মার সামঞ্জস্যবাদী মধ্যপন্থী ইসলামী জীবনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ১৯২১ সালে তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং মুহাম্মদ আসাদ নাম গ্রহণ করেন।

'The Road to Mecca' বা 'মক্কার পথ' মুহাম্মদ আসাদের রূহানী আত্মজীবনী। দেশ সফরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসংগে তিনি তাঁর আত্মিক উন্মোচনের কাহিনী তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থে তাঁর ভ্রমণ-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, আরবীয় দুনিয়ার জীবনধারা এবং তার সংগে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের জীবনধারার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য যেমন গল্পের আংগিকে বর্ণিত হয়েছে, তেমনি চিত্রিত হয়েছে এক অতৃপ্ত সত্যসন্ধানী চিত্তের সত্যোপলব্ধির মর্মস্পর্শী কাহিনী।

বলাবাহুল্য, এ বইটি লিখেছেন এ যুগের এমন একজন চিন্তাশীল মনীষী, যিনি সাধারণ যুক্তিহীন আবেগাক্রান্ত ধর্মান্তরিত মুসলিম নন। তিনি এক অনন্যসাধারণ প্রতিভান্বিত ব্যক্তি যিনি ধর্ম গ্রহণের পূর্বে তাঁর সমস্ত বিদ্যা ও বুদ্ধির আলোকে ধর্মকে বুঝতে এবং তার মর্ম উপলব্ধি করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

এই অতি উঁচু মানের সাহিত্য-গুণসম্পন্ন চিত্তাকর্ষক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী ও ইসলামী চিন্তাবিদ, 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা' ও 'সবুজ পাতা'র সাবেক সম্পাদক শাহেদ আলী। গল্প লেখার ভাষা তাঁর জাদুকরী হাত এই গ্রন্থটির বর্ণনাধর্মী সাহিত্যিক ভাষার অনুবাদে যে দারুণভাবে সফল হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই এবং যে-কোন পাঠক এর প্রাঞ্জল প্রসাদগুণ উপভোগ করে আনন্দ উপভোগ করবেন এবং এর বিশাল পৃষ্ঠাযাত্রায় যে ক্লান্ত হবেন না, আনন্দের সংগে সে সংবাদ আমরা দিতে পারি। আর এ কারণেই পাঠকদের উপহার দিতে আমরা এ গ্রন্থখানির পুন: নবকলেবরে প্রকাশ করছি। 'মক্কার পথ'কে অনুবাদ না বলে বলা যায় নতুন সৃষ্টি, বাংলা সাহিত্যে এটি একটি অভিনব সংযোজন।

আমরা আশা করি, এ গ্রন্থ পাঠে পাঠক ইসলামের ধর্মাদর্শ উপলব্ধিতে নতুন চিন্তার খোরাক পাবেন এবং ইসলামের প্রতি আরও গভীর বিশ্বাসে জেগে উঠবেন।

—শরীফ হাসান তরফদার
প্রকাশক

পূর্বকথা

লিও-পোলড্ উইস নামক একজন ইহুদী পণ্ডিত ইসলাম কবুল করেছেন—এ খবর সম্ভবত স্কুল জীবনেই শুনেছিলাম; কিন্তু তিনি যে একজন লেখক, একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী চিন্তাবিদ একথা জানলাম অনেক পরে। তাঁর মুসলিম নাম মুহাম্মদ আসাদ। আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রইলেও তাঁর কোনো রচনা পড়ার সৌভাগ্য তখনো আমার হয়নি। ব্রিটিশ আমলে তিনি ভারতে ছিলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পশ্চিম পাঞ্জাব সরকারের ইসলামী পুনর্গঠন সংস্থার পরিচালক ছিলেন এবং তিনি 'আরাফাত' নামক একটি অতি উন্নতমানের ইংরেজি সাময়িকী সম্পাদনা করতেন। এর বেশি কিছু তাঁর সম্পর্কে জানতাম না।

একদিন, খুব সম্ভব ১৯৫৮-এর দিকে ব্যারিস্টার এ. টি. এম. মুস্তাফা, যিনি পরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন, কথা প্রসংগে বলেন, "ভাইয়া, আপনি কি 'The Road to Mecca' পড়েছেন? জীবনে আমি যত বই পড়েছি সেগুলোর মধ্যে এটি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বই।"

মুস্তাফা ভাই কেবল একজন মশহুর আইনবেত্তাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন আপোসহীন সক্রিয় ইসলামী সংস্কৃতিকর্মী এবং সুধী পাঠক; দুনিয়ার কোথায় কোন্ শ্রেষ্ঠ লেখক ইসলামের উপর বই-পুস্তক লিখেছেন তিনি তার আপ-টু-ডেট খবর রাখতেন। তাঁর মুখে 'The Road to Mecca'-র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে বইটি সংগ্রহ করার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং কিছুদিন পর এক কপি বই লাহোর থেকে পার্শেল করে আনাই। বইটি হাতে পেয়ে তার মধ্যে ডুবে যাই, শৈশব থেকে ইসলাম গ্রহণ পর্যন্ত আসাদের দীর্ঘ চাঞ্চল্যকর আধ্যাত্মিক সফরে তাঁর সহযাত্রী হয়ে আমিও ঘুরি ইউরোপ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, পথে-প্রান্তরে, হাটে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে, সমুদ্রে, আর নতুন করে দেখি জগতকে; ধীরে ধীরে ইসলামের পরিপূর্ণ রূপটি পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে বিকশিত হয়ে ওঠে আমার দৃষ্টির সম্মুখে। বার বার পড়লাম 'The Road to Mecca' এবং পড়তে পড়তেই অন্তরে এই উপলব্ধি হলো—এ বই-এর বাংলা তরজমা বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য ইসলামী জীবন-দৃষ্টির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে।

সীমিত সামর্থ্য আর সময়ের অভাব সত্ত্বেও আমি বইটির তরজমায় হাত দিই এবং আমার সম্পাদিত ইসলামিক একাডেমী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপাতে থাকি। বিষয়বস্তু এবং আসাদের অপূর্ব রচনাশৈলীর গুণে আমার অক্ষম তরজমাও পাঠক মহলে প্রবল সাড়া জাগায়; কেবল এই তরজমার জন্যই বহু পাঠক ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা'র গ্রাহক হন এবং পত্রিকাটির প্রকাশনা কখনো অনিয়মিত হয়ে পড়লে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

'The Road to Mecca' বা মক্কার পথ মুহাম্মদ আসাদের রূহানী আত্মজীবনী। আসাদ গল্পচ্ছলে নিজের জীবনের কাহিনী লিখেছেন। উপন্যাসের চেয়েও সরস এ কাহিনী আসাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রামাণিকতায় হয়ে উঠেছে এ-কালের মানুষের জন্য ইসলামের এক অনাস্বাদিতপূর্ব বিশ্লেষণ। বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে এক

নতুন স্বাদ, এক অভিনব রস, যা পাঠককে কেবল আনন্দই দেয় না, এক সুগভীর তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতায় করে ঐশ্বর্যবান; লেখকের সফর সংগী হয়ে পাঠকও অন্তিমে গিয়ে পৌঁছান মক্কা তথা ইসলামী জীবন-দৃষ্টির মর্মকেন্দ্রে, আর ইসলামের পথে তাঁর দীর্ঘ অভিযাত্রা হয় পূর্ণ, আসাদের ভাষায় যা হচ্ছে home-coming—স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন।

মুহাম্মদ আসাদ সাংবাদিক, চিন্তাবিদ, ইসলামের এক অনন্য ব্যাখ্যাতা—কিন্তু মূলত তিনি দিব্যদৃষ্টির অধিকারী সৃজনধর্মী এক প্রতিভা; 'The Road to Mecca' তাঁর এক অপূর্ব সৃষ্টি। বইটি তিনি উৎসর্গ করেন তাঁর স্ত্রী পোলা হামিদা আসাদকে। তাঁর এই সৃষ্টিকে বাংলা ভাষার আধারে পরিবেশন করতে গিয়ে যতদূর সম্ভব মূলের ছন্দ প্রবাহ, বাকভঙ্গি ও রচনাশৈলী অক্ষুণ্ন রেখে আসাদের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনো সৃষ্টিকেই তো হুবহু ভাষান্তরিত করা যায় না। তাই আমি এ দাবী করি না যে, আসাদের এই অনুপম সৃষ্টিকে আমি পুরোপুরি আমার নিজের ভাষায় তুলে ধরতে পেরেছি। তবে আমার সান্ত্বনা এই যে, এ বই-এর তরজমার পেছনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল সৃজনধর্মী রচনার প্রতি আমার সহজাত অনুরাগ এবং ইসলামী জীবনাদর্শের প্রতি আমার আশৈশব ভালোবাসা। বইটির তরজমা বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আমার নিজের উপর স্ব-আরোপিত একটি দায়িত্ব পালন করেছি, যার জন্য পুরস্কার পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'আলার কাছে মুহাম্মদ আসাদেরই প্রাপ্য। তরজমা সম্পূর্ণ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য অগণিত উৎসুক এবং আগ্রহী পাঠক আমাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাগিদ দিয়েছেন; দেখা হলেই এ প্রসংগ তুলেছেন। তাঁদের সাগ্রহ প্রতীক্ষার এতদিনে অবসান হলো, তাঁদের দাবী এতদিনে পূর্ণ হলোঃ এজন্য আমি নিজেকে ভারমুক্ত মনে করছি এবং আল্লাহতা'আলার প্রতি শুকরিয়া জানাচ্ছি। এই সব অগণিত পাঠকের মধ্যে ভাই শাহ্ আবদুল হান্নানের কথা কিছুতেই ভুলবার নয়; তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও দাবী, আমার মধ্যে যখনি অনুবাদে শৈথিল্য এসেছে, আমাকে নতুন করে উৎসাহিত করেছে।

বইটির তরজমার প্রথম পর্যায়ে সাবেক ইসলামিক একাডেমীর মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম ও শেখ তোফাজ্জল হোসেন দীর্ঘদিন আমার মৌখিক তরজমা লিপিবদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই দায়িত্বের পুরোটাই পালন করেছেন কবি মসউদ-উশ-শহীদ। এতোটা আনন্দের সংগে মসউদ তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের একটা মূল্যবান অংশ এ কাজে আমার সংগে ব্যয় করেছেন যে তার কোনো তুলনা হয় না। মোহাম্মদ আজিজুল ইসলামের সংগে এই বই-এর প্রুফ দেখার দায়িত্ব সানন্দে বহন করেছেন আবদুল মুকীত চৌধুরী। বইটির নির্ঘণ্ট তৈরি করে দিয়েছেন ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেসের কালাম আজাদ। এঁরা প্রত্যেকেই আমার স্নেহভাজন; ধন্যবাদ দিয়ে এঁদের আন্তরিক সহযোগিতার মূল্যকে আমি লঘু করতে চাই না।

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে গোটা বাংলা-ভাষী পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

শাহেদ আলী

আল্লামা মুহাম্মদ আসাদের নাটকীয় জীবনের কিছু কথা

—অধ্যাপক শাহেদ আলী

মুসলিম বিশ্বের আকাশ থেকে প্রজ্ঞা ও মনীষার উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটি খসে পড়ে ১৯৯৪ সনে। পশ্চিমা জগতের দৃষ্টিতে এই নক্ষত্রটির আলো ছিলো প্রখর, চোখ ধাঁধানো; তাই তারা প্রায় শতাব্দীকাল একে চোখের সামনে দেখেও না দেখার ভান করেছে। এই মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন পশ্চিমে ইউরোপীয় পরিবেশে। অথচ তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন—এর বাহ্য জাকজমকের অন্তরালে লুক্কায়িত অতল-গর্ভ শূন্যতাকে দুনিয়ার সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন। এজন্য পাশ্চাত্য জগত তাঁকে বরাবর বিরক্তির সাথে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেছে। তাঁর ইন্তেকালের খবর কোন প্রচার পায়নি পশ্চিমী প্রচার মাধ্যমে।

আর রাতকনা মানুষ যেমন চাঁদ-নক্ষত্র কিছুই দেখেনা, অন্ধ যেমন সূর্য দেখেনা, তেমনি মুসলিম বিশ্বের দৃষ্টিতেও এই নক্ষত্রের কিরণের জ্যোতি কখনো পুরোপুরি প্রতিবিম্বিত হয়নি। তাই তার আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটি খসে পড়লেও তার কোন শূন্যতা মুসলিম বিশ্ব অনুভব করেনি—সূর্য বা নক্ষত্রের উদয়-অস্তে অন্ধের কিছুই আসে যায় না। তাদের নিজস্ব কোন প্রচার মিডিয়াও নেই। তাছাড়া যা কিছু আছে তাতেও এই মৃত্যু তেমন কোন গুরুত্বই পায়নি। তাঁর নাকি অসিয়ত ছিলো— তাঁর কবর যেন হয় মক্কায়— যেখানে তিনি দীর্ঘদিন বসবাস করে ইসলামকে আবিষ্কার করেছিলেন, ইসলামের সেরা ব্যাখ্যাতা এবং প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিলেন, ইসলাম কবুল করে সারা বিশ্বের মোকাবেলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরেছিলেন, লিখেছিলেন Road to Macca-র মত বিশ্বে আলোড়ন জাগানো বই। কিন্তু তাঁর সে সাধ পূরণ হয়নি। তিনি স্পেনে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ আসাদ, ইসলাম কবুল করার আগে যার নাম ছিলো লিওপোল্ড লুইস, তাঁর স্ত্রী পোলা হামিদা আসাদকে নিয়ে প্রায় ২৬/২৭ বছর বাস করেছিলেন মরক্কোর তানজিয়ার্স শহরে। তিনি রাবাত আল-আলম্ই ইসলামের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন কোরানুল করিমের একখানি সংক্ষিপ্ত তফসীরসহ তর্জমা করার জন্য। প্রথম ১০ পারার তফসির প্রকাশিত হলে কোন কোন আলিম, তাঁর কোন কোন ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করেন। তখন আসাদ রাবিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মরক্কো চলে যান এবং আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও, কেবল তাঁর স্ত্রী ও কতিপয় বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায় তিনি একাই অনুবাদ ও তাফসীর সম্পূর্ণ করে তা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। সুদীর্ঘ ২০ বছরের সাধনার পর তাঁর তরজমা ও তাফসীর তিনি প্রকাশ করেন। আধুনিক বিশ্ব কোরআনুল করিমের আধুনিকতম তরজমা ও তফসীরকারের দায়িত্ব পালন করেন।

লিওপোল্ড লুইসের জন্ম ১৯০০ সনে, বর্তমান পোলাণ্ডের লেমবার্গ শহরে, এক ইহুদী পরিবারে। তাঁর পিতামহ ছিলেন কয়েক পুরুষ বিস্তৃত এক ইহুদী রাব্বী বা পুরোহীত

পরিবারের শেষ রাব্বী হিসাবে। তাঁর পিতাকে ট্রেডিশনাল ইহুদী রাব্বী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা দেয়া হলেও তিনি সে পারিবারিক ঐতিহ্য ত্যাগ করে ব্যারিষ্টারী অধ্যয়ন করেন, নামকরা আইনজীবী হয়ে উঠেন এবং বিয়ে করেন এক ব্যাংকার পরিবারে। স্কুলের সাধারণ পড়াশুনার সঙ্গে লুইস লাভ করেন হিব্রু ধর্মগ্রন্থসমূহের সঙ্গে গভীর পরিচয়। ১৩ বছর বয়সেই লুইস হিব্রু ভাষা অনর্গল বলতে ও পড়তে শিখেন, এবং আর্মায়িক ভাষার সঙ্গেও সুপরিচিত হয়ে উঠেন। এই বয়সেই তিনি তালমুদের মূল পাঠ ও ভাষ্যের সঙ্গে সম্যক পরিচয় লাভ করেন। বহু বছর পর এ বিষয়ে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক আত্মচরিত Road to Macca-তে লিখেন "আমার মনে হলো ওল্ড টেষ্টামেন্ট এবং তালমুদের আল্লাহ্ যেন তাঁর পূজারীরা কিভাবে তাঁর পূজা করবে তার অনুষ্ঠানগুলো নিয়েই ব্যস্ত। আমার আরো মনে হতো আল্লাহ্ যেন বিশেষ একটি জাতির ভাগ্য নিয়ে বিস্ময়কররূপে ব্যস্ত রয়েছেন পূর্ব থেকেই। ইব্রাহীমের বংশধরগণের ইতিহাসরূপে ওল্ড টেষ্টামেন্টের কাঠামোটিই এমন যে মনে হয় আল্লাহ্ যেন গোটা মানবজাতির স্রষ্টা ও পালনকর্তা নন, বরং তিনি যেন এক উপজাতীয় দেবতা, যে দেবতা একটি মনোনীত জাতির প্রয়োজনের সঙ্গে গোটা সৃষ্টির সংগতি বিধান করে চলেছেন।"

ইহুদী মতবাদ নিয়ে নিরাশ হলেও, লুইস কিন্তু অন্য কোন পন্থায় আধ্যাত্মিক সত্যানুসন্ধানে গেলেন না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং অনেকটা উন্নাসিকতার সঙ্গে শিল্প ও দর্শনের ইতিহাস অধ্যয়নে মনোযোগী হন। কিন্তু এই একাডেমিক জীবন তাঁর ধর্মীয় তাৎপর্য অনুসন্ধানের অন্তর্নিহিত তৃষ্ণা নিবারণে ব্যর্থ হলো। তাঁর অ্যাডভেনচারের বাসনাও তাতে তৃপ্ত হলোনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভিয়েনা কিন্তু মরিয়া হয়ে নিয়োজিত ছিলো তার স্বকীয়তা ও আত্মপরিচয় লাভের প্রয়াসে। যুদ্ধ এবং ৬০০ বছরের পুরানো হ্যারসবুর্গ রাজতন্ত্রের পতন পুরানো মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যগুলোর ভিত্তি ধ্বসিয়ে দেয়। অবশ্য এর পূর্বে এগুলো শিল্পবোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আক্রমণের বিষয় হয়ে উঠেছিলো। এক সংশয়বাদী পরিবারের প্রভাবে লুইস তাঁর তরুণ বয়সের অন্য বহু বালকের মতোই সকল আনুষ্ঠানিক ধর্মকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বসেন। তাঁর তখন লক্ষ্য ছিলো কর্ম, দুঃসাহসিক অভিযান এবং উত্তেজনা। এই তাড়নাবশে তিনি অষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন এক ছদ্মনামে, কারণ তখনো তাঁর বয়স ১৮ বছর হয়নি। ফলে তাঁর স্বপ্ন ব্যর্থ হলো। চার বছর পর যখন তিনি আইনত ভর্তি হলেন সামরিক বাহিনীতে তার আগেই তাঁর সামরিক গৌরবের স্বপ্ন ভেঙে গেছে। কারণ কয়েক সপ্তাহ পরেই ঘটলো বিপ্লব, অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল এবং যুদ্ধও শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু আন্ত-একাডেমিক জীবনের কোন আকর্ষণই লুইসের ছিলোনা। তিনি অনুভব করছিলেন, জীবনের সাথে গভীরভাবে মোকাবেলা করার আকাংখা— জীবনে প্রবেশ করার বাসনা। নিরাপত্তা-প্রিয় মানুষ নিজের চারপাশে যে-সব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে লুইস সেগুলোর আশ্রয় না নিয়ে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন জীবনে—চেয়েছিলেন সবকিছুর পিছনে যে আধ্যাত্মিক নিয়ম-শৃংখলা রয়েছে তা উপলব্ধির পথ নিজেই খুঁজে বের করতে।

বিশ শতকের গোড়ার দিকের দশকগুলোর একটি বিশেষ লক্ষণ ছিলো আধ্যাত্মিক

শূন্যতা। বহুশত বছর ধরে ইউরোপ যে-সব মূল্যবোধে অভ্যস্ত ছিলো, সে সমুদয়ই, ১৯১৪-১৯১৮-এর মধ্যে যা ঘটলো তাতে নিজস্ব রূপরেখা হারিয়ে নিরাকার, নিরবয়ব হয়ে পড়লো। সে শূন্যতা পূরণ করতে পারে এমন নতুন কোন মূল্যবোধ কোথাও দেখা যাচ্ছিলো না। ক্ষণভঙ্গুরতা ও অনিশ্চয়তার ভাব, সামাজিক, মানসিক ওলটপালটের পূর্বাভাষ মানুষের চিন্তা ও প্রয়াসে স্থায়ী বলে কিছু নেই এমন একটা সন্দেহের জন্ম দেয় তরুণ মনে। তরুণের আত্মিক চাঞ্চল্য কোথাও কোন নির্ভর খুঁজে পাচ্ছিলো না লুইস এবং তাঁর মত নবীনেরা যে-সব প্রশ্নে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলো নৈতিকতায় কোন নির্ভরযোগ্য মানের অভাবে কেউ তাদের সেইসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারছিলেন না। লুইস দেখতে পেলেন, "বিজ্ঞান বলে জ্ঞানই সব অথচ একটা নৈতিক লক্ষ্য ছাড়া জ্ঞান কেবল বিশৃংখলাই সৃষ্টি করতে পারে।" এতে সন্দেহ নেই যে, সে সময়কার সমাজ সংস্কারক, বিপ্লবী এবং কমিউনিষ্টরা একটা মহত্তর এবং অধিকতর সুখী দুনিয়া নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লুইসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়লো এরা সকলেই চিন্তা করছে, কেবল বাহ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে এবং এসব ক্ষেত্রে এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য ওরা 'জিয়ন'বাদী ধারণাকে এক নতুন অধিবিদ্যা বিরোধী অধিবিদ্যায় উন্নীত করেছে। তারা দেখতে পেল, তাদের চারপাশের পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে অনেক সময় কল্পিত ঐশী গুণাবলীর সঙ্গে তার অসঙ্গতি প্রচন্ড। আল্লাহ্‌র প্রতি যে-সব গুণ আরোপ করা হয়, মানবভাগ্যের নিয়ন্ত্রক শক্তিগুলো যেন সেগুলো থেকে স্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র ও আলাদা। এ থেকে তারা সিদ্ধান্তে এলো আল্লাহ্ বলে কিছু নেই। ধর্মের আত্মাভিমানী অভিভাবকেরা আল্লাহ্‌কে তাদের নিজেদের পোষাক পরিয়ে মানুষের ভাগ্য থেকে আল্লাহ্‌কে বিচ্ছিন্ন, সম্পর্কহীন করে ফেলেছিলো। কিন্তু এতে তো সমস্যার সমাধান হলো না, ব্যক্তি-জীবনে কিংকর্তব্য সম্বন্ধে এই অনিশ্চয়তা ও পরিবর্তনশীলতা ঘোর বিশৃংখলার কারণ হয়ে উঠতে পারে, সৃষ্টি করতে পারে মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সৌন্দর্য বোধের প্রতি অশ্রদ্ধা। এই সহজাত উপলব্ধির কারণে লুইস এখানেই থামলেন না। তাঁর জন্য মহত জীবনকে গড়ে তোলা তাঁর দিকে আশার একটি সৃজনধর্মী পথ অনুসন্ধানের জন্য সহায়ক হয়ে উঠলো। এই তাগিদেই তিনি ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তার মূল পাঠ্য-বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন শিল্পকলার ইতিহাস। কিন্তু পাঠ্য বিষয় লুইসকে তৃপ্ত করতে পারলো না। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর শিক্ষকেরা—যাদের মধ্যে স্ট্রজিগোভস্কি এবং দ্‌ভোরাক ছিলেন বিখ্যাত এবং বিশিষ্ট সৌন্দর্যতত্ত্বের যে-সব নিয়ম-কানুন দ্বারা শিল্প সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলো আবিষ্কার করতেই ছিলেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত; এর মর্মমূলে যে আধ্যাত্মিক তরঙ্গাভিঘাত রয়েছে তা উৎঘাটনের চেষ্টা খুব সামান্যই করেছেন, অর্থাৎ লুইসের মতে শিল্পকলার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সেইসব রূপ ও আঙ্গিকের মধ্যে ছিলো সংকীর্ণভাবে সীমাবদ্ধ, যেগুলোর মাধ্যমে আর্ট লাভ করা অভিব্যক্তি।

লুইস তাঁর যৌবনোচ্ছল বিভ্রান্তির দিনগুলোতে ইউরোপ নবীন মনোবিকোলন শাস্ত্রের যে-সব সিদ্ধান্ত নিয়ে মেতে উঠেছিলো তার সঙ্গে পরিচিত হয়েও তিনি তাতে তৃপ্তি পেলেন না—পেলেন না তার জিজ্ঞাসার জবাব, যদিও তখন মনোবিকোলন তত্ত্ব দেখা দিয়েছিলো একটা প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবরূপে। মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে নির্জ্ঞান মনের কামনা-বাসনার যে ভূমিকা রয়েছে তার আবিষ্কার গভীরতর আত্মোপলব্ধির পথ সন্দেহাতীতভাবে মুক্ত করে

দিয়েছে—তরুণ লিওপোল্ড লুইসের এই বিশ্বাস বেশীদিন স্থায়ী হলো না। তাঁর কাছে ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার উদ্দীপনা ছিলো মদের মাদকতার মতোই তীব্র। ভিয়েনার ক্যাফেগুলোতে তিনি তন্ময় হয়ে শুনেছেন মনোবিকোলন তত্ত্বের শুরুর দিকের কয়েকজন পথিকৃত—আলফ্রেড এডলার, হার্মান ষ্টিকেল এবং অটোগ্রোস প্রমুখ পন্ডিতদের নিজেদের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ তর্ক-বিতর্ক, কিন্তু লুইস এই নতুন বিজ্ঞানের বুদ্ধিগত ঔদ্ধত্যে বিচলিত হয়েছেন। কারণ তাঁর মতে, "এ বিজ্ঞান মানুষের আত্মার সকল রহস্যকে কতগুলো স্নায়বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় পর্যবসিত করতে চায়।" তিনি উপলব্ধি করলেন পরম সত্যগুলোর কাছাকাছি পৌঁছানোর ক্ষমতাও এই নতুন শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলোতে নেই। তাছাড়া, মহত ও উন্নত জীবনের দিকে কোন নতুন পথের নির্দেশও তিনি এতে পেলেন না। মহাযুদ্ধের পর পর সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত মূল্যগুলোর ব্যাপক ভাঙন শুরু হলো, সেই ভাঙনের ধারায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান অনেক বাধা-নিষেধও শিথিল হয়ে পড়লো। এ ছিলো একটি অবস্থা থেকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত আর একটি অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হওয়া, যেখানে সবকিছু হয়ে পড়েছিলো বিতর্কের বিষয়, অর্থাৎ অবস্থাটা এই দাঁড়ালো ঃ কান পর্যন্ত মানুষের নিরবচ্ছিন্ন উর্ধ্বাভিসারী অগ্রগতিতে মানুষের যে বিশ্বাস ও আস্থা ছিলো তা থেকে মানুষ নিক্ষিপ্ত হলো স্পেসলারের তিক্ত নৈরাশ্যের দিকে, নীটশের নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ ও মনোবিকলন সৃষ্ট আধ্যাত্মিক শূন্যতার মধ্যে। শরীরের যুক্তি অভিলাসী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক হলো নির্বিচার আপতিক, অবাধ। লিওপোল্ড লুইসের মনে হতো এ আর কিছুই নয়, ফাকা প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তাঁর মনে হলো একজন পুরুষ থেকে আর একজন পুরুষকে যে ভয়ংকর নিঃসঙ্গতা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে হয়তো তার দূর হতে পারে একটি নারী ও পুরুষের মিলনে। এই মানসিক চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হলো না। তাঁর আব্বা তাঁকে পন্ডিত, পি, এইচ, ডি বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা ছেড়ে দিয়ে তিনি তাঁর পিতার অমতে বেছে নিলেন সাংবাদিক জীবন—তিনি লেখক হবেন এবং লেখাই হবে তার পেশা। ভিয়েনা থেকে তিনি পৌছুলেন প্রাগে—যেখানে তিনি একটি পুরানো ক্যাফে, দ্য ওয়েষ্টেনসে শিল্পী-সাহিত্যিকদের এক ঐন্দ্রজালিক চক্রের সঙ্গে পরিচিত হলেন। কিছুদিন পর তাঁর পিতা খবর পেয়ে চিঠি লিখলেন, "আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি এক ভবঘুরে বাউন্ডলে হিসাবে মরে পড়ে রয়েছ রাস্তার পাশে নর্দমায়।" প্রবল আত্মবিশ্বাসী জেদী তরুণ লুইস জবাব দিলেন— "না। আমার জন্য রাস্তার পাশে নর্দমা নেই, দেখবেন আমি উঠবো একেবারে শীর্ষচুড়ায়।" তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি লেখক হতে চান; তাঁর এই বিশ্বাস জন্মেছিলেন—তাঁর জন্য সাহিত্যিকদের জগত অপেক্ষা করছে সাগ্রহে, দরাজ দু'হাত বাড়িয়ে।

কিন্তু সেদিনে মশহুর কোন সংবাদপত্রে প্রবেশাধিকার ছিলো কঠিন ব্যাপার। বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় দিনের পর দিন তিনি পায়চারী করেছেন, সাবওয়ে বা ট্যাক্সির ভাড়া নেই। বহু সপ্তাহ তিনি কাটালেন, কেবল চা এবং বাড়ীওয়ালী সকালে যে দু'টি পাউরুটীর টুকরা দিতেন তা খেয়ে। তাঁর তখনকার এই দিনগুলোর নিয়তি ছিলো নির্জলা উপবাস। আর তাঁর রাতের স্বপ্ন ঠাসা থাকতো সসেজ আর মাখন মাখানো পুরু রুটির টুকরায়।

এই চরম আর্থিক দৈণ্যের মধ্যে এক চলচ্চিত্র প্রযোজকের সহকারী হিসাবে কাজ করে এবং পরে তাঁর ভিয়েনিজ বন্ধু এন্তোন কুহের জন্য ফিল্মের সিনারিও লিখে দিয়ে এবং পরে আরো একটি সিনারিও লিখে কিছু অর্থ উপার্জন করে কিছুদিন কাটালেন। এরপর আরো একটি বছর মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন শহরে নানারকম অস্থায়ী কাজ করে শেষপর্যন্ত তিনি প্রবেশ করলেন খবরের কাগজের জগতে ১৯২১ সনে। জার্মান ক্যাথোলিক সেন্টার পার্টির বিত্তশালী সদস্য ডর ডেমার্ট, জার্মান রাজনৈতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যিনি ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকার সহযোগিতায় ইউনাইটেড টেলিগ্রাফ নামে একটি বার্তা সংস্থা শুরু করতে যাচ্ছিলেন। তাঁরই প্রতিষ্ঠানে সহকারী হিসাবে কাজ করার আবেদন জানিয়ে পেলেন টেলিফোনিষ্টের কাজ। তাঁর উচ্চাকাংখার জন্য এ ছিলো একটি অতি অবসানজনক কাজ। কিন্তু কাজটি গ্রহণ না করে লুইসের উপায় ছিলনা। এভাবে একমাস কাজ করার পর তিনি, গোপনে বার্লিনে আগত মাদাম ম্যাক্সিম গোর্কী, যিনি ১৯২১-এর রাশিয়ার চরম দুর্ভিক্ষের সময় এখানে এসেছিলেন মধ্য ইউরোপীয় রাজধানীগুলোতে কার্যকরি ত্রাণ ও সাহায্যের জন্য জনমত গঠন করতে। তাঁরই সঙ্গে এক সাক্ষাতকার ঘটিয়ে টেলিফোনিষ্ট লিওপোল্ড লুইস হয়ে পড়লেন এক রিপোর্টার। তিনি হলেন এক সাংবাদিক।

লিওপোল্ড লুইস তখন ২২ বছরের উত্তাল তরুণ। সমাজ বদলে দেবার, সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলার বাসনায় লুইস এবং তাঁর বয়সী তরুণেরা তখন অস্থির। সমাজকে কিভাবে গঠন করা উচিত যাতে করে মানুষ যথার্থ এবং পরিপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারে। কিভাবে বিন্যস্ত হওয়া উচিত তাদের সম্পর্ক যাতে করে যে একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতা প্রত্যেকটি মানুষকে ঘিরে রেখেছে তা ভেঙে-চুরে সকলে বেরিয়ে আসতে পারে এবং সত্যিকার পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মধ্যে কাটাতে পারে জীবন? ভাল কি, মন্দ কি, ভাগ্য কি, কিংবা ভিন্নভাবে বলতে গেলে মানুষের কি করা উচিত যাতে করে সে যথার্থ অর্থে কেবল মুখে নয় তার জীবনের সাথে এক ও অভিন্ন হতে পারে এবং বলতে পারে আমি এবং আমার অদৃষ্ট আলাদা নয়— একই!

সর্বত্র যখন নৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তার আবহাওয়া প্রবল তাই জন্ম দিয়েছিলো বেপরোয়া আশাবাদের। আর তার প্রকাশ ঘটেছিলো একদিকে, —তাঁর সে সময়কার সঙ্গীতে, চিত্রকলা ও নাটকে দুঃসাহসিক পরীক্ষণ-নিরীক্ষণে, অন্যদিকে সংস্কৃতির কাঠামোও রূপরেখার সম্পর্কে অন্ধভাবে হাতড়ানোতে প্রায়শ বৈপ্লবিক অনুসন্ধানে রত ছিল। কিন্তু এই জোর করে বাঁচিয়ে রাখা আশাবাদের পাশাপাশিই তখন চলছে একটি আধ্যাত্মিক শূন্যতা। একটা অস্পষ্ট উন্নাসিক আপেক্ষিকতাবাদ ক্রমবর্ধমান এক নৈরাশ্যবাদের মধ্যে যার জন্ম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর উচ্চগ্রামে বাঁধা ভাবাবেগ পীড়িত অসন্তুষ্ট উত্তেজিত ইউরোপীয় জগতে কিছুই আর চলছিলোনা আগের মত স্বাভাবিক ও সুশৃংখলভাবে। লুইসের চোখে ধরা পড়লো পশ্চিমা জগতের আসল মাবুদ আর আধ্যাত্মিক কিছু নয়। এর একমাত্র উপাস্য হচ্ছে কমফোর্ট, আরাম-আয়াস—গড়পড়তায় একজন ইউরোপীয়, সে গণতন্ত্রী কমিউনিষ্ট, মজুদুর বুদ্ধিজীবি যেই হউক তাঁর কাছে অর্থপূর্ণ বিশ্বাস ছিলো একটি বৈষয়িক উন্নতির পূজা, কারণ জীবনকে ক্রমাগত সহজতর করে তোলা ছাড়া জীবনের আর কোন লক্ষ্য থাকতে পারে না। সাম্প্রতিক ভাষায় প্রকৃতির কবল থেকে মানুষকে আজাদ করাই জীবনের

একমাত্র উদ্দেশ্য। এই নতুন ধর্মের মন্দির হচ্ছে বিশাল কলকারখানা, সিনেমা, রাসায়নিক গবেষণাগার, নৃত্যশালা, প্রাণিবিদ্যা সংস্থাসমূহ। আর এ ধরনের মন্দিরের পুরোতঠাকুর হচ্ছে ব্যাংকার, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনীতিবিদ, চিত্রতারকা, পরিসংখ্যানবিদ, শিক্ষা পরিচালক, রেকর্ড স্রষ্টা, বৈমানিক এবং কমিসারেরা। ভালো এবং মন্দের ধারণার ক্ষেত্রে সার্বিক মতানৈক্য এবং সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের সুবিধাবাদের আশ্রয় গ্রহণ—এর মধ্যে ঘটলো নৈতিক ব্যর্থতার প্রকাশ—সেই সুবিধাবাদীতার যা রাস্তার বারঙ্গনার সাথে তুলনীয়, যে বারঙ্গনা যখনই এবং যারই বাঞ্ছিতা হয় তখনই তার কাছে দেহ দান করে। সেই বয়সেই লুইস দেখতে পেলেন ক্ষমতা এবং সুখের অতৃপ্ত লালসাই পাশ্চাত্য জগতকে অনিবার্যভাবেই পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে রেখেছে। যে দলগুলোর প্রত্যেকেই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এবং যখনই সেখানে তাদের পারস্পরিক স্বার্থে আঘাত লাগছে, তারা একে অপরকে ধ্বংস করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে। তখন ন্যায়-অন্যায়ের সর্বোচ্চ মাপকাঠিই ছিলো বাস্তব উপযোগিতা, জাগতিক সাফল্য। লুইসের সেই সময়কার অবস্থা, লুইসের ভাষায় "আমি দেখতে পেলাম জীবন কতো অসুখী এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ কতো সামান্য। যদিও সমাজ ও জাতির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে কান ফাটানো উন্মত্ত চিৎকারের সঙ্গে। আমরা আমাদের সহজাত অনুভূতির দুনিয়া থেকে কত দূরে সরে পড়েছি। আর আমাদের আত্মা কতো সংকীর্ণ এবং দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তখন আমাদের সকল চিন্তার আদি এবং অন্ত ছিলো ইউরোপ।"

এসব বিভ্রান্তি ও জটিলতার একটি সমাধান অন্তত আংশিক সমাধান হয়তো ইউরোপের নিজের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার বাইরে আর কোথাও থাকতে পারে। এ চিন্তা তখন লিওপোল্ড এবং তাঁর চারপাশের আর কারো মনে কখনো জাগেনি। এ সময় চৈণিক দার্শনিক লাওসের দর্শন তাঁকে কিছুকাল মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। কিন্তু কালে তা তার কাছে হয়ে উঠলো সুন্দর কবিতার বাহন—আর কিছু নয়। লাওসের পুস্তকটি তিনি রেখে দিলেন এই মনে করে যে, "এ কোন হাতির দাঁতের তৈরী মিনারের দিকে স্বপ্নে ডাকছাড়া আর কিছু নয়। তিনি যে জগতের অংশ সেই বেশুরো তিক্ত ঘৃণ্য জগতের সাথে লুইস তাল মিলিয়ে চলতে পারছিলেন না।"

লুইস বলেন, "কিন্তু আমার চারপাশে যারা রয়েছে তাদের কিংবা তাদের মধ্যকার কোন দলের বিভিন্নমুখী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আশা-আকাংখায় শরিক হতে আমার অক্ষমতা কালক্রমে আমার মধ্যে এই অস্পষ্ট ধারণার রূপ নেয় যে, আমি ঠিক ওদের কেউ নই, ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই এবং তারই সঙ্গে আমার এ বাসনা জন্মাল যে আমাকে কারো অঙ্গীভূত হতেই হবে— তবে কার? কোনকিছুর অংশ হতে হবেই— তবে কিসের ?" বুকভরা এই আকুতি ও অস্থিরতা নিয়েই তিনি ১৯২২ সনে তাঁর মাথা কোরিআনের আহবানে ২২ বছর বয়সে পাড়ি দিলেন আরব মূলক জেরুযালেমে। দীর্ঘদিন আরবদের সঙ্গে মেলামেশা করে তিনি পেলেন সেই জবাব। —তিনি কার অঙ্গীভূত হবেন, কিসের অংশ হবেন। ফ্রাংকফুর্টার শাইটুম নামক এক জগত বিখ্যাত কাগজের সংবাদদাতা হয়ে তিনি আসেন জেরুযালেম এবং কয়েক বছর সফর করেন মিশরে, ফিলিস্তীন, ট্রান্সজর্ডান, ইরাক, পারস্য, আফগানিস্তান। জেরুযালেমে অবস্থানকালে,

তিনি প্রথম ইসলামের সংস্পর্শে আসেন এবং আরবদের জীবন পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। আরবদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মেলামেশার পর তিনি আবিষ্কার করলেন, ট্রাডিশনাল মুসলিম সমাজের মধ্যে রয়েছে মন ও ইন্দ্রিয়ের এক সহজাত সঙ্গতি, —যা ইউরোপ হারিয়ে বসেছে। তিনি তাদের মধ্যে আবিষ্কার করলেন হৃদয়ের নিশ্চয়তা এবং আত্ম-অবিশ্বাস থেকে মুক্তি, যে মুক্তি ইউরোপীয়দের স্বপ্নেরও অগোচর। তিনি কিসের অংশ হবেন, অবশেষে সেই জিজ্ঞাসার জবাব পেলেন লিওপোল্ড লুইস এবং ১৯২৬ সনে ইউরোপ ফিরে তিনি সস্ত্রীক কবুল করলেন ইসলাম। তাঁর মুসলিম নাম হলো মুহাম্মদ আসাদ। আসাদের আত্মকথা 'মক্কার পথ' গ্রন্থ তাঁর এই ইসলাম কবুলকে বলা হয়েছে 'স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন'। ইসলামে দীক্ষিত হবার পর আসাদ প্রায় ৬ বছর আরব দেশে বাস করেন, আরব জীবন ও ভাষার সঙ্গে তাঁর হয় গভীর পরিচয়। তিনি বাদশা ইবনে সউদের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেন। এরপর তিনি আরব দেশ ছেড়ে ভারতে যান এবং মহান মুসলিম কবি ও দার্শনিক আল্লামা ইকবালের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁরই পরামর্শে আসাদ তাঁর পূর্ব তুর্কীস্থান, চীন এবং ইন্দোনেশিয়া সফরের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন, ইসলামী রাষ্ট্রের বুদ্ধিবৃত্তিক সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য তিনি ভারতে থেকে যান। ইসলামী রাষ্ট্র তখন এক স্বাপ্নিক কবির স্বপ্ন বিহবল মনের স্বপ্ন-মাত্র ছিলো। মুহাম্মদ আসাদের ভাষায় "আমার কাছে ইকবালের মতই স্বপ্ন ছিলো— ইসলামের সমস্ত ঘুমন্ত আত্মাকে পুনর্জীবিত করে তোলার একটি পথের—বস্তুত একমাত্র পথের পথিক ঃ একটি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সত্তা সৃষ্টি, যার সংহতির ভিত্তি একই রক্ত-মাংস নয়, বরং এটি আদর্শের প্রতি সাধারণ আনুগত্য। বহু বছর আমি নিজেকে নিবেদিত রাখি এই লক্ষ্যে অধ্যয়ন, রচনা ও বক্তৃতায় এবং কালে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যাতা হিসাবে কিছুটা খ্যাতি অর্জন করি।" কিন্তু এই অর্জন কিছুটা নয়, আসলে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে এই রাষ্ট্রের সরকার ইসলামী পুনর্গঠন বিভাগ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং পরিচালনার জন্য মুহাম্মদ আসাদকে আহবান করে, —এর লক্ষ্য রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে আদর্শগত ইসলামী ধ্যান-ধারণাগুলোকে বিশদভাবে তুলে ধরা, যার উপর নবজাত রাজনৈতিক সংগঠনটি তার আদর্শিক দিক-নির্দেশনার জন্য নির্ভর করতে পারে। মুহাম্মাদ আসাদ দু'বছর এই অতিশয় উদ্দীপনাপূর্ণ কাজটি চালিয়ে যাবার পর পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগদান করেন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরে তিনি হন মধ্যপ্রাচ্য ডিভিশনের প্রধান। ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তীনিদের পক্ষে পাকিস্তান জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে যে যুক্তি ও তথ্যের লড়াই সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে তার সমর্থনে সকল ঐতিহাসিক তথ্য ও দলিল প্রমাণাদি সরবরাহ করেন মুহাম্মদ আসাদ। পররাষ্ট্র দপ্তরে তিনি আত্মনিয়োগ করেন, পাকিস্তান ও মুসলিম বিশ্বের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করে তোলার জন্য। এই সময়ে মুহাম্মদ আসাদ নিযুক্ত হলেন জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে পাকিস্তানী মিশনে মিনিষ্টার প্লেনিপোটেনশিয়ারী হিসেবে। পরে ১৯৫২ সালের শেষের দিকে তিনি এই পদে ইস্তফা দিয়ে তাঁর অমর গ্রন্থ "The Road to Macca" রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

সূচী

কাহিনীর কাহিনী

আমি এ বইয়ের যে কাহিনী বলতে যাচ্ছি তা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভূমিকার জন্য বিশিষ্ট কোনো মানুষের আত্মকাহিনী নয়; এটি দুঃসাহসিক অভিযানের বর্ণনামূলক কোনো কাহিনীও নয়—কারণ আমার জীবনে বহু বিস্ময়কর এ্যাডভেঞ্চার ঘটে থাকলেও সেগুলি আমার ভেতরে যা ঘটে চলছিল তারই আনুষঙ্গিক মাত্র, তার বেশি কখনো ছিলো না, ধর্ম-বিশ্বাস অনুসন্ধানে সচেতন প্রয়াসের কাহিনীও এ নয়—কারণ সে বিশ্বাস বহু বছরে আমার জীবনে এসেছে, আমার পক্ষ থেকে তা অর্জনের কোনো চেষ্টা ছাড়াই। আমার কাহিনী হচ্ছে—একজন ইউরোপীয়'র ইসলাম আবিষ্কার এবং মুসলিম সমাজের মধ্যে তার মিশে যাওয়ার সাদামাঠা কথা।

আমি কখনো এ বই লেখার কথা ভাবিনি। কারণ আমার কখনো মনে হয়নি, আমার জীবন আমি নিজে ছাড়া অন্য কারো কাছে বিশেষ কোনো আকর্ষণের কারণ হতে পারে। কিন্তু যখন পাশ্চাত্য জগত থেকে পঁচিশ বছর বাইরে কাটানোর পর আমি প্যারিসে এলাম এবং সেখান থেকে এলাম নিউইয়র্ক ১৯৫২ সালের শুরুর দিকে, তখন আমি আমার এ মত পাল্টাতে বাধ্য হই। আমি তখন জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে পাকিস্তানের পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে কাজ করছিলাম বলে স্বভাবতই সকলের চোখ ছিলো আমার উপর; আমার ইউরোপীয় ও মার্কিন বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনের মধ্যে আমি বিপুল ঔৎসুক্যের কারণ হয়ে উঠি। প্রথমে ওদের মনে হয়েছিলো আমার কাজ হচ্ছে একজন ইউরোপীয় 'বিশেষজ্ঞের', যাকে প্রাচ্য দেশের একটি সরকার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেছে, আর আমি যে জাতির চাকরি করছি তাদের চালচলনের সঙ্গে আমার সুবিধার খাতিরেই মানিয়ে নিয়েছি। কিন্তু জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে আমার কার্যকলাপ যখন স্পষ্ট হয়ে উঠলো, আমি কেবল 'কাজের দিক' দিয়েই নয়, বরং আবেগ-অনুভূতি এবং বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়েও সাধারণভাবে মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক এবং তামদ্দুনিক লক্ষ্যের সাথে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছি তখন ওরা কিছুটা বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়ে। যতই দিন যেতে লাগলো, ক্রমবর্ধমান হারে বেশি বেশি লোক জিজ্ঞাসা করতে লাগলো আমার অতীত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে। ওরা জানতে পেলো, আমি আমার জীবনের একেবারে প্রথমদিকে কাজ শুরু করেছিলাম কন্টিনেন্টাল পত্র-পত্রিকাগুলির এক বৈদেশিক সংবাদদাতা হিসাবে এবং মধ্যপ্রাচ্যের সর্বত্র কয়েক বছর ব্যাপক সফরের পর আমি ১৯২৬ সালে মুসলমান হই; ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর প্রায় ছ'বছর আমি আরব দেশে বাস করি এবং বাদশাহ্ ইবনে সউদের বন্ধুত্ব লাভে সমর্থ হই; এরপর আমি আরব দেশ ছেড়ে যাই ভারতে, আর সেখানে আমার সাক্ষাৎ ঘটে পাকিস্তান চিন্তার আধ্যাত্মিক জনক এবং মহান মুসলিম কবি-দার্শনিক মুহাম্মদ ইকবালের সংগে। তিনিই আমাকে অল্প সময়ের মধ্যে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করান। আমার পূর্ব তুর্কিস্তান, চীন এবং ইন্দোনেশিয়া সফরের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে এবং ভাবী ইসলামী রাষ্ট্র, যা তখনো ইকবালের স্বাপ্নিক মনের স্বপ্নের বেশি কিছু

ছিলো না, তার বুদ্ধিবৃত্তিক সূত্রগুলির ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণের জন্য ভারতে থেকে যেতে। আমার কাছে, ইকবালের মতোই এ স্বপ্ন ছিলো ইসলামের সমস্ত ঘুমন্ত আশাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার একটি পথের, বস্তুত, একমাত্র পথের প্রতীক ঃ একটি জনগোষ্ঠীর একটি রাজনৈতিক সত্তার সৃষ্টি, যার সংহতির ভিত্তি একই রক্ত–বংশ নয়, বরং একটি আদর্শের প্রতি সাধারণ আনুগত্য। বহু বছর আমি নিজেকে নিবেদিত রাখি এই লক্ষ্যে অধ্যয়ন, রচনা ও বক্তৃতায় এবং কালক্রমে ইসলামী আইন ও তমদ্দুনের ব্যাখ্যাতা হিসাবে আমি বেশ কিছুটা খ্যাতি অর্জন করি। ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো, আমাকে তখন ঐ রাষ্ট্রের সরকার 'ইসলামী পুনর্গঠন বিভাগ' নামক একটি ডিপার্টমেন্ট গড়ে তোলা এবং পরিচালনার জন্য আহ্বান করলেন; এর উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে আদর্শগত ইসলামী ধ্যান–ধারণাগুলিকে বিশদভাবে তুলে ধরা, যার উপর নবজাত রাজনৈতিক সংগঠনটি তার আদর্শিক দিক–নির্দেশের জন্য নির্ভর করতে পারে। দু'বছর ধরে এই অত্যন্ত উদ্দীপনাময় কাজটি চালিয়ে যাওয়ার পর আমি পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগদান করি। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দফতরে আমাকে মধ্যপ্রাচ্য ডিভিশনের প্রধান নিযুক্ত করা হয়। এখানে আমি পাকিস্তান এবং অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বন্ধন ও সম্পর্ক মজবুত করে তোলার জন্য আত্মনিয়োগ করি; আর এ সময়েই একদা আমি নিউইয়র্কে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে পাকিস্তানী মিশনে নিযুক্ত হই।

এ সবই একজন ইউরোপীয় যে–মুসলিম সমাজের মধ্যে ঘটনাক্রমে বাস করছে তার সংগে নিছক বাহ্যিক খাপ খাইয়ে নেয়ার চাইতে অনেক বেশি গভীরতরো কিছুর দিকে ইংগিত করেঃ বরং এতে করে একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রতি আনুগত্য সজ্ঞানে সর্বান্তকরণে প্রত্যাহার করে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা বোঝায়। আমার বহু পাশ্চাত্য বন্ধুর কাছে এটা খুবই বিস্ময়কর ঠেকে। তারা তাদের মনে এই চিত্র আনতে সক্ষম হলো না— যে–মানুষ জন্মেছে পাশ্চাত্য জগতে এবং সেখানেই বড় হয়েছে ও শিক্ষা–দীক্ষা পেয়েছে সে কেমন করে এমন সম্পূর্ণভাবে এবং বাহ্যত, মনে কোন কিছু চেপে না রেখে মুসলিম জগতের সাথে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছে; তার পক্ষে কী করে পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বদলে সম্ভব হলো ইসলামী সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার গ্রহণ, এবং কী সেই জিনিস যা তাকে বাধ্য করেছে অমন একটি ধর্মীয়–সামাজিক আদর্শ গ্রহণ করতে, যা আমার মনে হয়, সকল ইউরোপীয় ধ্যান–ধারণা থেকেই অতি ব্যাপকভাবে নিকৃষ্টতরো বলে ওরা স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে ধরে নিয়েছে।

কিন্তু কেন, আমি নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলাম, আমার পাশ্চাত্য বন্ধুরা এ বিষয়টিকে এমন একটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিচ্ছে? ওরা কি কখনো সত্যি সত্যি সরাসরি ইসলামের মর্মে পৌঁছানোর চেষ্টা করার প্রয়োজন বোধ করেছে? অথবা ওদের মতামতের ভিত্তি কি পূর্ববর্তী পুরুষ পরম্পরায় পাওয়া বিকৃত ধ্যান–ধারণা এবং কতিপয় ধরাবাঁধা বুলি? হতে পারে কি যে–সনাতন গ্রীক ও রোমান চিন্তা–পদ্ধতি পৃথিবীকে একদিকে গ্রীক ও রোমান এবং অন্যদিকে বারব্যারিয়ান্স তথা বর্বর জাতিপুঞ্জ, এই দুই ভাগে ভাগ করেছিলো তা পাশ্চাত্য মানসে আজো এতো পরিপূর্ণভাবে মিশে আছে যে তার নিজের সাংস্কৃতিক কক্ষপথের বাইরে যা কিছু পড়ে তার কোন স্পষ্ট নির্দিষ্ট মূল্য আছে বলে তত্ত্বগতভাবেও সে

স্বীকার করতে অক্ষম?

গ্রীক এবং রোমানদের আমল থেকে, ইউরোপীয় চিন্তাবিদ এবং ঐতিহাসিকেরা ইউরোপীয় ইতিহাস ও কেবল পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার আলোকে এবং অর্থেই পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা করতে উন্মুখ ও ইচ্ছুক। এ চিত্রে অপাশ্চাত্য সভ্যতাগুলি কেবল তখনি প্রবেশ করে যখন ওদের অস্তিত্ব অথবা ওদের মধ্য থেকে উত্থিত বিশেষ বিশেষ আন্দোলন পাশ্চাত্য মানুষের ভাগ্যের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে বা করে থাকে; আর এ কারণে, পাশ্চাত্যবাসীর দৃষ্টিতে পৃথিবীর ইতিহাস এবং তার বিভিন্ন সংস্কৃতি শেষ পর্যন্ত একটা সম্প্রসারিত পাশ্চাত্য ইতিহাসের বেশি কিছু নয়!

স্বভাবতই এ ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ একটি বিকৃত পরিপ্রেক্ষিতের জন্ম দিয়ে থাকে। পাশ্চাত্যের মানুষ যেহেতু সেই সব লেখার সাথেই পরিচিত যা তার নিজের সংস্কৃতিকে চিত্রিত করে অথবা নিজের সভ্যতার সমস্যাগুলি আলোচনা করে তার খুঁটিনাটি সমেত এবং উজ্জ্বল রঙে, আর বাকি বিশ্বের প্রতি এখানে-ওখানে ঘাড় বাঁকিয়ে মাঝে মাঝে তাকানোর বেশি কিছু করে না; এজন্য গড়পড়তা একজন ইউরোপীয় অথবা আমেরিকান সহজেই এই ভ্রান্ত ধারণার শিকার হ'য়ে পড়ে যে, পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা বাকি বিশ্বের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার চাইতে কেবল উৎকৃষ্টতরোই নয়, বরং আয়তনেও এতো বিপুল যে, দু'য়ের মধ্যে কোন তুলনাই হয় না; আর এ কারণে, পাশ্চাত্য জীবন পদ্ধতি হচ্ছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য আদর্শ যার মানদণ্ডেই কেবল অন্যান্য জীবন-পদ্ধতিকে বিচার করা যেতে পারে। এর দ্বারা অবশ্য এ কথাই বোঝানো হয় যে, যে-কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ধ্যান-ধারণা, সামাজিক অনুষ্ঠান অথবা নৈতিক মূল্যায়ন, যা এই পাশ্চাত্য আদর্শ বা নমুনার সংগে মিলে না, তা বস্তুতই একটি নিম্নস্তরের জীবনের বস্তু। গ্রীক এবং রোমানদের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে পাশ্চাত্য জগত ভাবতে পছন্দ করে যে, ঐসব ভিন্ন সভ্যতা, এককালে যা বিদ্যমান ছিলো বা বর্তমানে আছে সে সবই প্রগতির যে-পথ পাশ্চাত্য অভ্রান্তভাবে অনুসরণ করে চলেছে সে পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ কতকগুলি পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ মাত্র; অথবা, বড় জোর একথা বলা যায় (যেমন জনক সভ্যতাগুলির ক্ষেত্রে, যা সরাসরিভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্বে বিকাশ লাভ করেছিলো একই রেখায়) এগুলি একই পুস্তকের পরপর কয়েকটি অধ্যায় মাত্র— অবশ্যই পাশ্চাত্য সভ্যতা হচ্ছে এর শেষ অধ্যায়।

আমি যখন আমার এই মতের কথা আমার কোন এক মার্কিন বন্ধুর নিকট ব্যক্ত করি—বন্ধুটি ছিলেন বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে বেশ কৃতিত্বের অধিকারী এবং মানসিক প্রবণতার দিক দিয়ে তাঁকে পণ্ডিত বলা যায়—তিনি প্রথমে কিছুটা সংশয়ই প্রকাশ করেন।

'মেনে নিলাম', তিনি বললেন, 'প্রাচীন গ্রীক এবং রোমকরা বিদেশী সভ্যতার বিচার করতে গিয়ে সীমিত দৃষ্টিভংগির পরিচয় দিয়েছিলো; কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা কি ওদের এবং বাকি দুনিয়ার মধ্যে যোগাযোগের অসুবিধারই অনিবার্য ফল নয়? আর এই অসুবিধা কি আধুনিককালে অনেকখানি কাটিয়ে ওঠা যায়নি? যা-ই হোক, আমরা, পাশ্চাত্যবাসীরা আজকাল আমাদের আপন সাংস্কৃতিক কক্ষপথের বাইরেও যা ঘটছে তার সংগে অবশ্যই নিজেদেরকে সম্পর্কিত রাখি। গত সিকি শতকে প্রাচ্য শিল্পকলা ও দর্শন সম্পর্কে এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন জাতির মনকে যেসব রাজনৈতিক চিন্তাধারা দখল করে আছে সেসব বিষয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকাতে যে বহু সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে আপনি কি সেগুলির

কথা ভুলে যাচ্ছেন না? অন্যান্য সংস্কৃতির কী দেবার থাকতে পারে তা বোঝার জন্য পাশ্চাত্যবাসীর এ আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করা নিশ্চয়ই সুবিচার হবে না!'

'হয়তো আপনার কথা কিছুটা সত্য', আমি জবাব দিই, 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেই আদি গ্রীক-রোমক দৃষ্টিভংগি আজকাল আর সম্পূর্ণ সক্রিয় নয়। এর কঠোরতা তার ধার উল্লেখযোগ্যভাবে হারিয়ে ফেলেছে, অন্য কোন কারণে নয়, কেবল এ কারণে যে, পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণের মধ্যে যাঁরা অধিকতরো পরিণত চিন্তাশক্তির অধিকারী তাঁরা তাদের নিজেদের সভ্যতার বহু দিক সম্পর্কেই হতাশ এবং সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছেন। ওঁদের কারো কারো মনে এই উপলব্ধির সূচনা হতে শুরু করেছে যে, মানব প্রগতির কেবল একটিমাত্র কিতাব এবং একটিমাত্র কাহিনী না-ও থাকতে পারে, বরং বহু কিতাব এবং বহু কাহিনী থাকা সম্ভবঃ আর এর কারণ কেবল এই যে, ঐতিহাসিক অর্থে মানবজাতি একটি সমজাতীয় সত্তা নয়, বরং বিভিন্ন গ্রুপের এক বিচিত্র সমবায়, যাদের মধ্যে মানব জীবনের অর্থ এবং লক্ষ্য সম্পর্কে অনেক দূর ব্যবধানের ভিন্ন ভিন্ন ভাবধারা রয়েছে। তবু আমি মনে করি না যে, পাশ্চাত্য জগত গ্রীক ও রোমকদের চাইতে বিদেশী সংস্কৃতির প্রতি কৃপাশীল পৃষ্ঠপোষকের মনোভাব সত্যি কম পোষণ করতে শুরু করেছে ঃ বলা যায়, পাশ্চাত্য কেবল অধিকতর সহনশীল হয়ে উঠেছে। কিন্তু মনে রাখবেন—এ সহনশীলতা ইসলামের প্রতি নয়—কেবল কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতি যা পাশ্চাত্যের অধ্যাত্ম ক্ষুধায় পীড়িত মানুষের জন্য এক ধরনের আধ্যাত্মিক আকর্ষণ যোগায় এবং একইসাথে তা পাশ্চাত্য বিশ্বদৃষ্টি থেকে অতো বেশি দূরের যে, এর মূল্যগুলির বিরুদ্ধে কোন সত্যিকার চ্যালেঞ্জ বলে তা গণ্য হয় না।'

'আপনি এর দ্বারা কি বোঝাতে চান?'

'দেখুন', আমি জবাব দিই, 'যখন একজন প্রতীচ্যবাসী, ধরা যাক, হিন্দু ধর্ম অথবা বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করে তখন সে ব্যতিক্রমহীনভাবেই এ-সব মতবাদ ও তার নিজের মতবাদের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্যগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকে। এ-সব মতবাদের এটা-ওটা তার প্রশংসা পেতে পারে, কিন্তু স্বভাবতই সে কখনো তার নিজের ভাবধারার বদলে এগুলি গ্রহণ করার সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখতে রাজী হবে না। যেহেতু সে পূর্ব থেকেই এ অসম্ভাব্যতা স্বীকার করে নেয় সে কারণে এসব বিজাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে মানসিক স্থৈর্য এবং প্রায়ই সহানুভূতিপূর্ণ সমঝদারের মনোভাব নিয়ে সে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে। কিন্তু ইসলামের প্রসংগ যখন আসে, যা হিন্দু অথবা বৌদ্ধ দর্শনের মতো পাশ্চাত্য মূল্যগুলির মোটেই ততটা বিরোধী নয়, তখন এ পাশ্চাত্য মানসিক স্থৈর্য প্রায় সব-সময় এবং অনিবার্যভাবেই আবেগাত্মক পক্ষপাত দ্বারা বিচলিত হয়ে পড়ে। এর কারণ কি সম্ভবত এই যে, মাঝে মাঝে আমি সবিস্ময়ে ভাবি, ইসলামী মূল্যবোধগুলি পাশ্চাত্য মূল্যবোধের খুব বেশি কাছাকাছি বলেই তা আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের বহু পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার প্রতি প্রচ্ছন্ন চ্যালেঞ্জ বিশেষ?'

এবং আমি তাঁকে আমার একটা থিওরীর কথা বলতে আরম্ভ করি, যা আমার চিন্তায় এসেছিল কয়েক বছর আগে; এটি এমন এক থিওরী, যা আমার মতে, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সমসাময়িক চিন্তাধারায় ইসলামের বিরুদ্ধে প্রায়ই যে গভীর মূল বিদ্বেষ দেখতে পাওয়া যায় তা স্পষ্টতরোভাবে বোঝার সহায়কও হতে পারে।

'এই বিদ্বেষের একটা সত্যিকার বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা পেতে হলে,' আমি বললাম, 'আপনাকে তাকাতে হবে অনেক পেছনদিকে, ইতিহাসের অভ্যন্তরে—এবং পাশ্চাত্য ও মুসলিম জগতের মধ্যকার প্রথমদিকের সম্পর্কগুলির মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। পাশ্চাত্যের লোকেরা আজকের দিনে ইসলাম সম্পর্কে যা চিন্তা এবং অনুভব করে তার শিকড় রয়েছে সেইসব গভীর প্রভাবের চাপ এবং স্মৃতির ছাপের মধ্যে যা জন্ম নিয়েছিলো ক্রুসেডের সময়ে।'

'ক্রুসেড!' আমার বন্ধু বিস্মিত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন, 'আপনি নিশ্চয়ই বলতে চান না যে প্রায় হাজার বছর আগে যা ঘটেছিলো তা এখনো, এই বিশ শতকের লোকের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে?'

'কিন্তু তা অবশ্যই করে থাকে। আমি জানি, এ অবিশ্বাস্য শোনাবে। কিন্তু আপনার কি স্মরণ নেই মনোবিকলনকারীদের প্রথমদিকের আবিষ্ক্রিয়াগুলিকে কী অবিশ্বাসের সংগে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিলো, যখন ওঁরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছিলেন একটা বয়স্ক মানুষের আবেগময় দিকের বহুলাংশেরই—এবং ইডিওসিন্‌ক্রেসিস বা 'বিশেষ মেজাজ-মর্জি' শব্দটিতে যেসব আপাত অহেতুক প্রবণতা, রুচি ও সংস্কার নিহিত রয়েছে তারও প্রায় সবটারই—উৎস খুঁজে পাওয়া যেতে পারে তার শৈশবের প্রথমদিকের, তার বয়সের সবচাইতে ফর্মেটিভ সময়টির বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে? আচ্ছা, জাতি এবং সভ্যতা কি যৌথ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছু? ওদের ক্রমবিকাশও ওদের শৈশবের প্রথমদিকের অভিজ্ঞতার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। শিশুদের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি ওদের শৈশবের এসব অভিজ্ঞতাও হয়তো আনন্দদায়ক ছিলো অথবা ছিলো পীড়াদায়ক; ঐসব অভিজ্ঞতা হতে পারে সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত, অথবা বিপরীত পক্ষে, সেগুলি হতে পারে কোনো ঘটনার শিশুসুলভ সরল ভুল ব্যাখ্যার ফল ঃ এ ধরনের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতারই মন-মানস বদলে দেয়ার ক্ষমতা প্রধানত নির্ভর করে সেই অভিজ্ঞতার সূচনাকালীন তীব্রতার উপর। ক্রুসেডের অব্যবহিত পূর্বের শতকটিকে, অর্থাৎ খ্রিস্টীয় সনের প্রথম হাজার বছরের সমাপ্তিকালটিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার শৈশবের প্রথম দিক বলে সহজেই বর্ণনা করা যেতে পারে.......

আমি আমার বন্ধুকে স্মরণ করিয়ে দিই—তিনি নিজেও একজন ইতিহাসবিদ—এ হচ্ছে সেই যুগ যখন রোম সাম্রাজ্যের ভাঙনের পরবর্তী অন্ধকার শতাব্দীগুলির পর এই প্রথম ইউরোপ তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক পথ দেখতে শুরু করেছে। প্রায় বিস্মৃত রোমান ঐতিহ্যের-সাথে কোন সম্পর্ক না রেখেই ঠিক সেই মুহূর্তে ইউরোপের জনসাধারণের বিভিন্ন মাতৃভাষায় নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টি শুরু হয়েছে ঃ যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে গথ, হূন এবং অভরদের স্থান হতে স্থানান্তরে বিচরণের ফলে যে মানসিক অবসাদ এসেছিলো, তা কাটিয়ে উঠে পাশ্চাত্য খ্রিস্টধর্মের ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রেরণায় চারুকলা ধীরে ধীরে জীবন্ত হয়ে উঠছে। মধ্যযুগের প্রথমদিকের অপরিণত অবস্থার মধ্য থেকে জন্ম নিচ্ছিলো এক নতুন সাংস্কৃতিক জগত। ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে, ক্রুসেড থেকে তার আত্মবিকাশের সেই চরম নাজুক সংবেদনময় মুহূর্তটিতে পেলো তার জীবনের সবচেয়ে প্রচণ্ড আঘাত—আধুনিক ভাষায় যাকে বলা হয়, 'ট্রওমা' বা আবেগজনিত আঘাত, যা হয়ে উঠতে পারে মানসিক ব্যাধির হেতু.......

ক্রুসেডগুলি হচ্ছে এমন এক সভ্যতার উপর প্রচণ্ড সমষ্টিগত চাপ, যা সবেমাত্র

আত্মসচেতন হয়ে উঠতে শুরু করেছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বলতে গেলে, ক্রুসেডের যুদ্ধগুলি হচ্ছে একটা সাংস্কৃতিক সংহতির আলোকে নিজেকে দেখার জন্য ইউরোপের প্রথমতম এবং সম্পূর্ণ সফল এক প্রয়াস। প্রথম ক্রুসেড যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলো তার আগে কিংবা পরে ইউরোপ আর তেমন কোন অভিজ্ঞতাই অর্জন করেনি, যা এর সাথে তুলনীয় হতে পারে। ইউরোপ মহাদেশের উপর দিয়ে উন্মাদনার এক প্রবল ঢেউ বয়ে গেলো—এমন এক আনন্দ-উল্লাস যা এই প্রথম বিভিন্ন রাষ্ট্র, গোত্র ও শ্রেণীর মধ্যকার সকল প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে গেলো। এর আগে ছিলো ফ্রাঙ্ক, স্যাক্সন, জার্মান, বুর্গাণ্ডীয়, সিসিলীয়, নরম্যান এবং লুম্বার্ডেরা—বিভিন্ন গোত্র ও জাতের এক জগাখিচুড়ি, যাদের মধ্যে সাধারণ কিছু ছিলো না বললেই চলে, কেবল একটি বিষয় ছাড়া ঃ ওদের প্রায় সবকটি সামন্ততন্ত্রী রাজ্য ও প্রদেশ ছিলো রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ, আর ওরা সকলেই ছিলো খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী ঃ কিন্তু ক্রুসেডের যুদ্ধগুলিতে, এবং এসব যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এই ধর্মীয় বন্ধন উন্নীত হয় এক নতুন সমতলে, যা সকল ইউরোপীয়রই সাধারণ লক্ষ্য ঃ 'খ্রিস্টান রাজের' রাষ্ট্রীয়-ধর্মীয় ধারণা। পরিণামে তা-ই জন্ম দেয় ইউরোপ-ভিত্তিক সাংস্কৃতিক চেতনার। ১০৯৫ সালের নভেম্বরে পোপ দ্বিতীয় আরবান তাঁর ক্লারমন্টের বিখ্যাত বক্তৃতায় যখন পবিত্র ভূমি দখল করে রাখা 'পাষণ্ড জাতির' বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন তখনি তিনি সম্ভবত তাঁর নিজের অজান্তেই পাশ্চাত্য সভ্যতার চার্টার বা সনদ ঘোষণা করেন।

ক্রুসেডের যুদ্ধের ফলে আবেগজনিত প্রচণ্ড আঘাতের যে অভিজ্ঞতা হয় তা-ই ইউরোপকে দেয় তার সাংস্কৃতিক সচেতনতা এবং তার ঐক্য; কিন্তু পরিণামে এই একই অভিজ্ঞতাই তখন থেকে সেই মিথ্যা রঙের পোঁচ দিতে থাকলো, যে-রঙে পাশ্চাত্যবাসীর চোখে ইসলাম প্রতিভাত হয়েছে পরবর্তীকালে—কেবল এ কারণে নয় যে, ক্রুসেডের অর্থই হচ্ছে যুদ্ধ এবং রক্তপাত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অমন কত যুদ্ধই তো সংঘটিত হয়েছে—যার কথা পরবর্তীকালে বেমালুম ভুলে গেছে সে-সব জাতি—এবং কতো শত্রুতা ও বৈরিতা, যা তাদের কালে মনে হয়েছিলো অনপনেয়, পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়েছে বন্ধুত্বে! বিভিন্ন ক্রুসেডে যে ক্ষতি হলো তা অস্ত্রের ঝনঝনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি ঃ প্রথমত এবং সর্বাগ্রে এ হচ্ছে এক মনোজাগতিক ক্ষতি—ইসলামের শিক্ষা এবং আদর্শের একটি ইচ্ছাকৃত অপব্যাখ্যার মাধ্যমে পাশ্চাত্য মনকে মুসলিম জগতের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলাই সেই ক্ষতি; কারণ ক্রুসেডের আহবানের যুক্তিযুক্ততা যদি বজায় রাখতে হয় তাহলে মুসলমানদের নবীকে অপরিহার্যভাবেই চিহ্নিত করতে হবে খ্রিস্ট-বিরোধীরূপে এবং তাঁর ধর্মকে জঘন্যতম ভাষায় চিত্রিত করতে হবে, লাম্পট্য ও বিকৃত রুচির উৎসরূপে। ইসলাম যে একটি স্থূল ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং পাশবিক হানাহানির ধর্ম, চিত্ত-শুদ্ধির ধর্ম নয়, অনুষ্ঠানাদি পালনের ধর্ম, ক্রুসেডের আমলেই এ হাস্যকর ধারণা প্রবেশ করে পাশ্চাত্য মানসে এবং তখন থেকেই তা ওখানেই রয়ে গেছে; আর সেই সময়ে নবী মুহাম্মদের নাম—সেই একই মুহাম্মদ যিনি তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছিলেন—অন্যান্য ধর্মের নবীগণকে শ্রদ্ধা করতে—ইউরোপীয়রা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সংগে রূপান্তরিত করে 'মাহৌন্দ'-এ, ইউরোপে স্বাধীন অনুসন্ধিৎসা সূচিত হওয়ার যুগ তখনো অনেক সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার। তখন যেসব শক্তি বিদ্যমান ছিলো তাদের পক্ষে পাশ্চাত্য ধর্ম এবং

সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক ধর্ম ও সভ্যতার বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষের কালো বীজ বপন করা ছিলো খুবই সহজ। কাজেই, এ কোন আকস্মিক ব্যাপার নয় যে, এই সব যুদ্ধ যখন চলছিলো তখন জ্বালাময়ী শ্যাঁজো-দ্য রোঁলা—যাতে দক্ষিণ ফ্রান্সে মুসলিম বে-দ্বীনদের উপর খৃষ্টান রাজ্যের অলীক বিজয় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে—রচিত হয়নি, রচিত হয়েছিলো তিন শতাব্দী পরে—অর্থাৎ প্রথমে ক্রুসেডের ঠিক কিছু আগে—এবং সংগে সংগেই তা হয়ে দাঁড়ালো ইউরোপের 'জাতীয় সংগীত'-স্বরূপ; এবং এ-ও আকস্মিক ব্যাপার নয় যে, এই যুদ্ধ নিয়ে রচিত মহাকাব্য হচ্ছে এক 'ইউরোপীয়' সাহিত্যের আরম্ভ যা আগেকার আঞ্চলিক সাহিত্য থেকে সুস্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র ঃ কারণ ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবাবস্থার উপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের প্রতি নিদারুণ বিদ্বেষ।

এটা ইতিহাসেরই একটা পরিহাস বলে মনে হয় যে, ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতীচ্যের যুগ যুগ লালিত শত্রুতা, যা আদিতে ছিলো ধর্মীয়, আজো, এমন এক সময়েও টিকে আছে তার অবচেতন মনে যখন পাশ্চাত্য মানুষের কল্পনার উপর ধর্ম তার কর্তৃত্ব প্রায় সবটাই হারিয়ে ফেলেছে। অবশ্য, আসলে তা বিস্ময়কর নয়। আমরা জানি, মানুষকে তার শৈশবে যেসব ধর্মীয় বিশ্বাস শেখানো হয় সেসব বিশ্বাস সে সম্পূর্ণ হারিয়ে বসতে পারে, যদিও তা সত্ত্বেও, ঐসব বিশ্বাসের সংগে সম্পর্কিত কোন কোন বিশেষ আবেগ অযৌক্তিকভাবেই সক্রিয় থাকে তার শেষ জীবনব্যাপী—'আর এই-ই', আমি আমার বক্তব্য শেষ করে বলি, 'ঠিক এ-ই ঘটেছিলো সেই সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার জীবনে। ক্রুসেডের ছায়া আজো পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে আছে পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর ; আর ইসলাম এবং মুসলিম জগতের প্রতি তার সকল প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে সেই মরেও-মরে না প্রেতের....'

আমার বন্ধু কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থাকেন। আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি লম্বা হালকা-পাতলা সেই মানুষটি কামরার ভেতরে পায়চারী করছেন। তাঁর হাত দুটি তাঁর কোটের পকেটে, মাথা ঝাঁকাচ্ছেন যেন কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে এবং অবশেষে তিনি বললেন ঃ

'আপনি যা বলছেন তাতে কিছু সারবস্তু থাকতে পারে—সত্যি হয়তো থাকতে পারে—যদিও, হঠাৎ করে আমি আপনার এই থিওরী বিচার করে দেখতে পারছি না, সে অবস্থা আমার নেই। তবে যা-ই হোক, আপনি আপনার নিজের সম্পর্কে এইমাত্র আমাকে যা বললেন তার আলোকে আপনার কি মনে হয় না যে, আপনার জীবন, যা আপনার কাছে খুবই সরল এবং জটিলতা মুক্ত, পাশ্চাত্যের লোকদের কাছে অবশ্যই পরম বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক ঠেকবে? আপনি আপনার আত্মজীবনী লিখছেন না কেন? আমি নিশ্চিত যে, এটি খুবই চমকপ্রদ এবং আকর্ষণীয় পুস্তক হবে।'

উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে আমি জবাব দিই ঃ হ্যাঁ, এ ধরনের একটি বই লিখতে গিয়ে আমি হয়তো ফরেন সার্ভিস ত্যাগের জন্য মানিয়ে নিতে পারি নিজেকে। মোদ্দা কথা, লেখাই তো আমার মূল পেশা.....'

আমি রসিকতা করে যে জবাব দিয়েছিলাম পরবর্তী কয়েক হপ্তা এবং মাসে আস্তে আস্তে আমার অজান্তেই তা উবে গেলো। আমি আমার জীবনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করার জন্য এবং এতে ক'রে, যত তুচ্ছভাবেই হোক না কেন, যে পুরু যবনিকা ইসলাম এবং তার সংস্কৃতিকে প্রতীচ্য-মন থেকে আড়াল করে রেখেছে তা সরাতে সাহায্য করার জন্য চিন্তা

করতে শুরু করি, গভীরভাবে। ইসলামে আমার প্রবেশ অনেক দিক দিয়ে একটি একক, অতুলনীয় ব্যাপার ঃ মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘকাল বসবাস করেছি বলেই আমি মুসলমান হইনি, পক্ষান্তরে আমি তাদের মধ্যে বাস করার সিদ্ধান্ত নিই এ কারণে যে, আমি ইসলাম কবুল করেছি। আমি কি আমার একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্য পাঠকদেরকে অবগত ক'রে ইসলামী জগত ও পাশ্চাত্য জগতের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে বেশি অবদান রাখতে পারি না, সেই কূটনৈতিক পদে অবস্থান ক'রে যা করতে পারি, তার চেয়ে যে-পদ আমার দেশের অন্য লোকদের দ্বারা পূরণ করা যেতে পারে একই রকম প্রকৃষ্টরূপে! মোদ্দা কথা যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি পাকিস্তানের মন্ত্রী হতে পারেন জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে—কিন্তু আমার পক্ষে পাশ্চাত্যের লোকদের নিকট ইসলাম সম্পর্কে যেভাবে কথা বলা সম্ভব ক'জন লোক তা করতে সক্ষম? আমি মুসলমান, কিন্তু এ-ও সত্য যে, আমার জন্ম পাশ্চাত্য জগতে ঃ কাজেই ইসলাম এবং পাশ্চাত্য জগত, দুয়েরই সুধীজনের ভাষায় কথা বলতে পারি আমি....

আর এ কারণে, ১৯৫২ সালের শেষের দিকে আমি পদত্যাগ করি পাকিস্তান ফরেন সার্ভিস থেকে এবং এ বইটি লিখতে শুরু করি। আমার আমেরিকান বন্ধুটি যে রকমটি আশা করেছিলেন এটি সে রকম 'চিত্তাকর্ষক বই' হয়েছে কিনা আমি বলতে পারি না। কেবল কিছু পুরোনো নোট, বিচ্ছিন্ন রোজনামচা এবং সে সময়ে আমি সংবাদপত্রের জন্য যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলাম তারই কয়েকটির সাহায্যে, স্মৃতি থেকে—এক ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের জটিল রেখাগুলি ধরে ফের অতীতের দিকে যাত্রা করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিলো না—যে বিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে বহু বছর এবং ভৌগোলিক স্থানের এক বিশাল বিস্তার জুড়ে।

আর এই যে কাহিনীঃ আমার সমগ্র জীবনের কাহিনী নয়, কেবল সেই বছরগুলির কাহিনী, ভারতের পথে আরবদেশ ছেড়ে বের হওয়ার আগেকার বছরগুলির কাহিনী—সেই উত্তেজনাময় বছরগুলি, যা আমি সফরে সফরে কাটিয়েছি লিবিয়ার মরুভূমি থেকে পামীর মালভূমির বরফ-ঢাকা পর্বত শৃংগগুলির মধ্যবর্তী এবং বসফরাস ও আরব সাগরের মধ্যকার প্রায় সকল দেশের ভেতর দিয়ে। এ কাহিনী বলা হয়েছে একটি পটভূমিতে—এবং মনে রাখতে হবে, আরবের অভ্যন্তর থেকে মক্কায় ১৯৩২-এর গ্রীষ্মের শেষের দিকে, আমার সর্বশেষ মরু সফরের সময়ের প্রেক্ষিতে ঃ কারণ ঐ তেইশ দিনের মধ্যেই আমার জীবনের প্যাটার্ন সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো আমার কাছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে যে আরবের বর্ণনা করা হয়েছে তা এখন আর নেই। এর নির্জনতা এবং সংহতি ধ্বসে পড়েছে অকস্মাৎ প্রবল বেগে উৎক্ষিপ্ত তেলের প্রচন্ড ধাক্কায় এবং তেল যে স্বর্ণ নিয়ে এসেছে তারই চাপে। এর মহৎ সরলতা হারিয়ে গেছে এবং তার সংগে হারিয়ে গেছে মানবিকতার দিক দিয়ে যা ছিলো একক অনন্য তা-ও। মানুষ যখন মহামূল্য কোন কিছুর জন্য বেদনা অনুভব করে, যা এখন হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য, যা ফিরে পাওয়া যাবে না আর কখনো, সে বেদনার সাথে আমার মনে পড়ছে সেই শেষ দীর্ঘ মরুপথে চলার কথা—যখন আমরা দুজন, সওয়ারী হাঁকিয়ে চলেছি; আর চলেছি, দুজন দুটি উটের উপরে, সাঁতরে চলা আলোর ভেতর দিয়ে....

তৃষ্ণা

এক

আমরা দু'জন দু'টি উটের উপর, চলেছি তো চলেছি; মাথার উপর সূর্য জ্বলছে, সর্বত্র আলো ঝলমল করছে, ঝলসাচ্ছে, সাঁতার কাটছে। লালচে আর নারাংগী রঙের বালিয়াড়ি— বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি, একাধারে নির্জনতা আর রোদ-ঝলসানো নীরবতা এবং তারই মধ্য দিয়ে চলেছি আমরা দুটি মানুষ, দুটি উটের উপর—চলেছি দুলতে দুলতে, চলার সেই ছন্দে ও ভংগীতে যা মানুষকে নিদ্রালু করে তোলে, আর তাকে ভুলিয়ে দেয় দিনের কথা, রোদের কথা, উষ্ণ হাওয়া আর সুদীর্ঘ পথের কথা। বালিয়াড়ির মাথায় কোথাও কোথাও হলদে ঘাসের গুচ্ছ আর এখানে ওখানে গ্রন্থিল হাম্‌দ-লতার ঝোপ, মস্ত বড় অজগরের মত বালির উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। ইন্দ্রিয়গুলি যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। জিনের উপর বসে আমি দুলছি। কিছুই টের পাচ্ছি না উটের পায়ের নিচে বালি গুঁড়ানোর আওয়াজ এবং হাঁটুর ভেতরের দিকে জিন-আঁটানো কাঠের পেরেকের ঘষা ছাড়া। রোদ আর বাতাস থেকে মুখটাকে বাঁচানোর জন্য পাগড়ীর গুচ্ছ দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছি। মনে হলো, আমি যেন আমার আপন নিঃসংগতাকে একটি বস্তুরই মতো ধরাছোঁয়া যায় এমন একটা পদার্থেরই মতো এরই মধ্য দিয়ে, হ্যাঁ ঠিক এরই মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছি তায়েমার কুয়াগুলির দিকে....তায়েমার সেই গহীন কুয়াগুলির দিকে, যা পানি যোগায় তৃষ্ণার্তকে...ঠিক নুফুদের ভেতর দিয়ে তায়েমার দিকে—আমি একটা স্বর শুনতে পেলাম, জানি না স্বপ্নে শোনা স্বর, না আমার সংগীর কণ্ঠস্বর ঃ

—'তুমি কিছু বলছিলে জায়েদ ?'

—'বলছিলাম' আমার সংগী জবাব দেয়, 'তায়েমার কুয়া দেখার জন্য ঠিক আড়াআড়িভাবে নুফুদ পাড়ি দেবার দুঃসাহস খুব বেশি লোক করবে না।'

আমি আর জায়েদ গিয়েছিলাম নজ্‌দ-ইরাক সীমান্তের কসর আসাইমিনে, বাদশাহ ইবনে সউদের অনুরোধে। সেখান থেকে আমরা দু'জন ফিরছিলাম। আমার কাজ শেষ করার পর হাতে ছিল প্রচুর অবসর। তাই ঠিক করলাম, প্রায় দু'শ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তায়েমার সুদূর এবং প্রাচীন মরূদ্যানটি একবার দেখতে যাবো। ওল্ড টেস্টামেন্টের সেই 'তেমা'—আর এর সম্পর্কেই ঈসায়া বলেছিলেন, 'তেমা'র বাসিন্দারা তৃষ্ণার্তদের পানি যোগায়'। তায়েমার অঢেল পানি আর এর বড়ো ইঁদারা, সারা আরবে এমনটি কোথাও মিলে না। এই পানি আর ইঁদারার জন্য ইসলাম-পূর্ব যুগে তায়েমা হয়ে উঠেছিলো ক্যারাভাঁ বাণিজ্যের একটা মস্ত বড়ো কেন্দ্র আর সেকেলে আরব তমদ্দুনের এক পীঠস্থান। স্থানটি দেখার ইচ্ছা আমার অনেকদিনের। তাই মরু-কাফেলা যে-সব ঘুরতি পথে চলে সে-সব পথে না গিয়ে কসর আসাইমিন থেকে আমরা সোজা ঢুকে পড়লাম বিশাল নুফুদের ভেতরে। মধ্য আরবের উঁচু এলাকাগুলি আর সিরীয় মরুভূমির মাঝখানে ছড়িয়ে আছে লালচে বালি মরু নুফুদ, বিশাল তার আয়তন। এই ভয়ংকর নির্জন এলাকার এই অংশে

নেই কোনো পায়ের রেখা, নেই কোনো পথ। বাতাস যেন দায়িত্ব নিয়েছে—যাতে মানুষ বা কোনো পশুর পদক্ষেপ এই নরম দেবে-যাওয়া ঝুরঝুরে বালিতে স্থায়ী চিহ্ন রেখে যেতে না পারে এবং জমির কোনো নিশানা মুসাফিরকে পথ দেখানোর জন্য বেশিদিন টিকে না থাকে! বাতাসের ধাক্কায় বালিয়াড়িগুলির রূপরেখা হরদম বদলাচ্ছে, আস্তে আস্তে, টের পাওয়া যায় না এমনি মৃদু গতিতে প্রবাহিত হয়ে আকারের পর আকার নিচ্ছে। পাহাড় রূপান্তরিত হচ্ছে উপত্যকায়, উপত্যকা রূপ নিচ্ছে নতুন পাহাড়ে। তা ছাড়া এখানে-ওখানে শুকনো প্রাণহীন ঘাসের চিহ্ন; আর সে ঘাস বাতাসে মৃদু মর্মর ধ্বনি তোলে। উটের মুখেও তেতো ছাইয়ের মত সে ঘাস!

বহুবার বহু দিক দিয়ে এ মরুভূমি আমি পার হয়েছি। তবুও কারো মদদ না নিয়ে নিজে নিজে এর মধ্য দিয়ে রাস্তা খুঁজে নেবার হিম্মত আমার নাই। কাজেই জায়েদকে আমার সংগে পেয়ে আমি ভীষণ খুশী। দেশের এই এলাকারই লোক জায়েদ। তার বংশের নাম শাম্মার, আল-নুফুদের দক্ষিণ এবং পূর্ব সীমানায় শাম্মার খান্দানের বসতি। শীতকালের ধারা বর্ষণে বালিয়াড়িগুলি যখন হঠাৎ ঘন সবুজ মাঠে রূপান্তরিত হয়, তখন বছরের কয়েক মাস ধরে ওরা নুফুদের মাঝখানে উট চরায়। মরুভূমির পরিবর্তনশীল মেজাজের সংগে জায়েদের সম্বন্ধ রক্তের, এর সাথে সাথে স্পন্দিত হয় জায়েদের হৃদয়।

আজ পর্যন্ত যত মানুষের সংগে আমার পরিচয় হয়েছে মনে হয় জায়েদই তাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। চওড়া তার কপাল, পাতলা শরীর, মাঝারি আকার, সুন্দর গঠন, প্রচন্ড তার শক্তি, সুগঠিত মজবুত চোয়াল, আর একাধারে কঠোর এবং লালসাপূর্ণ মুখ নিয়ে তার গোধুম-রঙা সংকীর্ণ মুখমণ্ডল—তাতে রয়েছে সেই প্রত্যাশিত গাম্ভীর্য যা মরু-আরবের বাসিন্দাদের একটি খাস বৈশিষ্ট্য— মর্যাদাবোধের সংগে একটা আন্তরিক মাধুর্যপূর্ণ আত্মসমাহিত ভাব। খাঁটি বেদুঈন রক্ত এবং নজদী শহুরে জীবনের এক সুন্দর সংমিশ্রণ সে; বেদুঈনী ভাবাতিশয্যের গলদ থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেও বেদুঈনের সহজ প্রবৃত্তির নিশ্চয়তা সে নিজের মধ্যে অক্ষুণ্ন রেখেছে এবং শহুরে লোকের বৈষয়িক কৃত্রিমতার শিকার না হয়েও তাদের সংসার জ্ঞান সে হাসিল করেছে। আমার মতো সেও এ্যাডভেঞ্চারের নেশায় মাতাল না হয়েও এ্যাডভেঞ্চারে আনন্দ পায়। যৌবনের একেবারে শুরু থেকেই তার জীবন নানা ঘটনা এবং উত্তেজনায় ভরা। মহাযুদ্ধের সময় সিনাই উপদ্বীপে অভিযান চালানোর জন্য তুর্কী সরকার এক অনিয়মিত উট সওয়ার বাহিনী গঠন করেছিলো, বালক বয়সে জায়েদ ছিলো তারই একজন সিপাই। তা ছাড়া, ইবনে সউদের হামলা থেকে তার শাম্মার খান্দানের বসত-ভূমি রক্ষা করার জন্য সে লড়েছে। কিছুদিন আবার অস্ত্রের চোরাচালান দিয়েছে পারস্য উপসাগরে। আরব জাহানের বহু এলাকায় বহু আওরতের সংগে সে প্রেম করেছে প্রচণ্ডভাবে। অবশ্য প্রত্যেকের সাথেই কোনো-না-কোনো সময় আইনত তার শাদী হয়েছে এবং তারপর আইন মোতাবেক তাদেরকে সে তালাকও দিয়েছে।. মিসরে সে কিছুকাল ঘোড়ার ব্যবসা করেছে। আর ইরাকে সে ছিলো ভাগ্যান্বেষী সৈনিক, সবশেষে প্রায় পাঁচ বছর ধরে সে রয়েছে আমার সহচর হিসাবে, আরব মুলুকে। এবং এখন উনিশ শ' বত্রিশের গ্রীষ্মের এই শেষ দিকে আমরা দু'জন আরো অনেকবারের

মতো চলেছি উটের উপরে বসে, বালিয়াড়ির মধ্যে নির্জন পথে ঘুরতে ঘুরতে; চওড়া চত্বরবিশিষ্ট কোন কোন কুয়ার পাশে আমরা থামছি এবং তারা–ঝিলমিল আকাশের নিচে আরাম করছি রাতের বেলা। তপ্ত বালুর উপর উটের পায়ের একটা সুইশ্ সুইশ্ আওয়াজ, কখনো কখনো চলার মাঝে উটের পায়ের আওয়াজের সাথে সাথে তাল মিলিয়ে জায়েদ নীরস কণ্ঠে গান ধরে; রাত্রে আমরা তাঁবু খাটাই, কফি বানাই, ভাত রাঁধি এবং কখনো কখনো পাকাই শিকার–করা বুনো প্রাণীর গোশত। রাতের বেলা যখন আমরা বালির উপর শুয়ে থাকি বাতাস আমাদের উপর একটা ঠান্ডা পরশ বুলিয়ে যায়। বালিয়াড়ির উপর সূর্য ওঠে, লালচে সূর্য প্রচণ্ড বিস্ফোরণে চূর্ণ–বিচূর্ণ হয় আতশবাজির মতো এবং আজকের মতো কখনো কখনো আমরা দেখতে পাই, হঠাৎ পানি পেয়ে জীবনের বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটছে তৃণলতার মধ্যে।

যোহরের সালাতের জন্য আমরা থেমেছি, একটা মশক থেকে পানি নিয়ে আমি হাত–মুখ এবং পা ধুচ্ছি। কয়েক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়লো আমার পায়ের কাছে ঘাসের একটা শুকনো গুচ্ছের উপর—একটা অসহায় ক্ষুদ্র তৃণের গুচ্ছ, সূর্যের নিষ্ঠুর তাপে রং হয়েছে হলদে, নেতিয়ে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে বালির উপর। কিন্তু কয়েক ফোঁটা পানি ওর উপর পড়ার সংগে সংগেই ওর কোঁকড়ানো পাতাগুলির মধ্য দিয়ে এক আশ্চর্য শিহরণ বয়ে গেলো, স্পষ্ট দেখতে পেলাম, কিভাবে সেগুলি মেলে গেলো আমার চোখের সামনে। আরো কয়েকটি ফোঁটা...ছোট্ট পাতাগুলি নড়ে উঠলো, কুঁকড়ে গেলো এবং তারপর ধীরে ধীরে যেন সংকোচের সংগে শিউরে সেগুলি সোজা হয়ে গেলো। আমি নিরুদ্ধ শ্বাসে আরো কিছুটা পানি ঢালি তৃণ গুচ্ছটির উপর। আরো দ্রুত, আরো প্রচণ্ডভাবে নড়ে উঠলো তৃণটি, যেন কোন অদৃশ্য শক্তি ওকে ওর মৃত্যু–স্বপ্ন থেকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলছে। আর ওর পাতাগুলি, কী আনন্দের সে দৃশ্য! তারা মাছের বাহুগুলির মতো সংকুচিত ও প্রসারিত হতে লাগলো, যেন লাজুক অথচ অদম্য উত্তেজনায় ইন্দ্রিয়জ আনন্দের একটি সত্যিকার ক্ষণিক বিস্ফোরণে সে অভিভূত। কিছুক্ষণ আগেও যা ছিল মৃতের শামিল, এমনি করে তারই মধ্যে আবার ফিরে এলো তার প্রাণ, প্রকাশ্যে, প্রবলভাবে, যে প্রাণের কাছে হার মানে মৃত্যু এবং যার ঐশ্বর্য মানুষের বুদ্ধিরও অগম্য।

মরুভূমিতে আপনি প্রাণকে তার রাজকীয় রূপে অনুভব করবেন সবসময়ে। প্রাণকে টিকিয়ে রাখা এতো কষ্টকর, এতো কঠিন বলেই মরুভূমিতে প্রাণ যেন সবসময়েই একটা রহমত, একটা সম্পদ, একটা বিস্ময়। আর মরুভূমি সবসময়ই চমকপ্রদ মানুষের জন্য। মরুভূমির সাথে বহু বছরের জানাজানি থাকলেও বিস্ময়ের অবকাশ হামেশাই রয়েছে। কখনো কখনো যখন মনে হয়, মরুভূমি তার সমস্ত কঠোরতা আর শূন্যতা নিয়ে রয়েছে আমাদের চোখের সামনে তখন মরুভূমি যেন তার স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে নিশ্বাস ফেলতে শুরু করে এবং গতকাল যেখানে বালু আর টুকরো পাথর ছাড়া আর কিছুই ছিলো না, আমরা দেখতে পাই, হঠাৎ সেখানে জেগে উঠেছে কচি ফিকে সবুজ ঘাস। আবার মরুভূমির শ্বাস বইতে শুরু করে, আর এক ঝাঁক ছোটো পাখি ডানার আওয়াজ তুলে বাতাসের মধ্য দিয়ে উড়তে আরম্ভ করে। কোথেকে এলো, কোথায় যাবে এই ক্ষীণ–দেহ

লম্বা ডানাওয়ালা পান্না-সবুজ পাখিগুলি? কিংবা হয়তো এক ঝাঁক পংগপাল হঠাৎ তীব্র বেগে এবং ঝুমঝুম শব্দে জমি ছেড়ে উঠলো আসমানে, ধূসর এবং ক্ষুধার্ত, যোদ্ধা-বাহিনীর মতো হিংস্র আর অশেষ.....

প্রাণের প্রকাশ তার রাজকীয় রূপে ঃ মরুভূমিতে প্রাণ বিরল বলেই তার এ রাজকীয় রূপ হামেশাই বিস্ময়কর, সর্বদাই চমকপ্রদ, আর এখানেই নিহিত আছে আরবের এমনিতরো বালুমরু এবং আরো বহু পরিবর্তনশীল ল্যাণ্ডস্কেপের নামহীন সমগ্র সুবাসটুকু!

কখনো কখনো পথে পড়ে লাভা-মৃত্তিকা-কালো এবং অসমতল, কখনো বা বালিয়াড়ি, যার শেষ নেই। কাঁটা ঝোপ-ঢাকা 'ওয়াদি' বা উপত্যকা দুই পাথুরে পাহাড়ের মাঝখানে, আর সেই ঝোপ থেকে চকিত ভীত খরগোশ লাফ মেরে আমাদের পথের এক পাশ থেকে আরেক পাশে গিয়ে পড়ছে কখনো কখনো। কখনো-বা পাচ্ছি হরিণের পায়ের দাগ-পড়া শিথিল বালু আর আগুনে কালো হয়ে যাওয়া দু'চারটি পাথর, যার উপর অনেক অনেক আগে, বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে যাওয়া মুসাফিরেরা, বহু পূর্বে, বিস্মৃত কোনো দিনে তাদের খাবার রেঁধেছিলো। কখনো কখনো চোখে পড়ছে খেজুর-বীথির ছায়া-পড়া কোনো পল্লী, আর কুয়ার উপরে কাঠের চাক্কাগুলি ঘুরছে এবং তাতে করে এক ধরনের সংগীত সৃষ্টি হচ্ছে.....আর মুসাফিরেরা শুনছে সেই একটানা সংগীত। কখনো কখনো পাচ্ছি মরু-উপত্যকার মাঝখানে একটি কুয়া আর তার চারপাশে বেদুঈন পশু-পালকেরা জটলা পাকাচ্ছে তাদের তৃষ্ণার্ত মেষ এবং উটগুলিকে পানি খাওয়ানোর জন্য। তারা কোরাসে গান গাইতে গাইতে চামড়ার বড় থলেতে করে পানি তুলছে আর ঝরাৎ করে সেই পানি চামড়ার পাত্রে ঢালার সঙ্গে সঙ্গে পশুগুলির উত্তেজনা চরমে পৌঁছুচ্ছে। তার উপর রয়েছে নিষ্করুণ রোদে অভিভূত স্তেপভূমির নির্জনতা, এখানে-ওখানে হলদে ঘাস আর সাপের মতো শাখা ছড়িয়ে মাটির উপর হামাগুড়ি দিয়ে চলা পত্রঘন ঝোপগুলি কোনো কোনো স্থানকে করে তোলে উটের জন্য সাদর চারণ ক্ষেত্র। একটা নিঃসঙ্গ বাবলাজাতীয় বৃক্ষ হয়তো ইস্পাত-নীল আকাশে ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাটির স্তূপ আর পাথরের মাঝখান থেকে ডানে-বাঁয়ে নজর ছুঁড়ে মারতে মারতে বেরিয়ে আসছে সোনালী গিরগিটি, তারপর আবার মিলিয়ে যাচ্ছে একটা ছায়ার মতো, ভৌতিক ব্যাপারের মতো। লোকের বিশ্বাস, এই স্বর্ণ-গিরগিটি কখনো পানি খায় না। দেবে-যাওয়া নিচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ছাগ-পশমের কালো কালো তাঁবুগুলি! বিকালের দিকে এক পাল উটকে হয়তো তাড়িয়ে নেয়া হচ্ছে ঘরের দিকে আর তরুণ উটের খালি পিঠে চড়েছে পশু-পালকেরা। তারা যখন তাদের পশুগুলিকে ডাকে তখন মরুভূমির নীরবতা যেনো তাদের কণ্ঠস্বরকে চুমুক দিয়ে চুষে নেয়, কোন প্রতিধ্বনি না জাগিয়েই সে কণ্ঠস্বর হারিয়ে যায় ঐ নীরবতায়।

কখনো কখনো দূর দিগন্তে দেখা যায় ঈষৎ উজ্জ্বল ছায়া—ওগুলি কি মেঘ? ওরা নিচু দিয়ে ভেসে যায়। ঘন ঘন বদলায় তাদের রং আর অবস্থান। এই মুহূর্তে হয়তো দেখাচ্ছে ধূসর তামাটে পাহাড়ের মতো—অবশ্যি শূন্যে দিগন্তের কিছুটা উপরে—এবং পরমুহূর্তেই সারা দুনিয়ার কাছে ওরা পাথুরে দেওদারের ছায়াদার বীথিকার রূপ নিচ্ছে—কিন্তু শূন্যে,

তারপর ওরা যখন আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসে আর হ্রদে এবং বয়ে-চলা নদীতে রূপান্তরিত হয় এবং তাদের হাতছানি দেয়া পানিতে পাহাড় ও গাছপালার প্রতিবিম্ব কাঁপতে থাকে তখন হঠাৎ আপনি চিনতে পারেন, ওরা কী! ওরা হচ্ছে জ্বিনের হাতছানি—সেই মরীচিকা যা বারবার মুসাফিরদের মনে মিছে আশা জাগিয়েছে এবং 'তাতে করে' ডেকে এনেছে তাদের সর্বনাশ আর অনিচ্ছাকৃতভাবেই মুসাফিরের হাত তখন আগিয়ে যায় জিনের উপর মশকের দিকে....

কোনো কোনো রাত আবার ভিন্নতরো বিপদে পূর্ণ। বিভিন্ন কবিলার মধ্যে তখন যুদ্ধের উত্তেজনা, যুদ্ধের চাঞ্চল্য; মুসাফির তাঁবু খাটায়, কিন্তু আগুন জ্বালে না, যেন দূর থেকে তাদের কেউ দেখতে না পায়। দু'হাঁটুর মধ্যে রাইফেল রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা জেগে থাকে। আর সেই শান্তির দিনগুলি, যখন নিঃসঙ্গ দীর্ঘপথ ঘুরতে ঘুরতে মুসাফির কোনো কাফেলার দেখা পায় আর সন্ধ্যাকালে তাঁবুর আগুনের চারপাশে বসা রোদে-পোড়া গম্ভীর লোকগুলির কথা কান পেতে শোনে—ওরা জিন্দেগী এবং মওতের, ক্ষুধা এবং তৃপ্তির, গর্ব, মহব্বত এবং ঘেন্নার, দেহের লালসা ও সে লালসা নিবৃত্তির, যুদ্ধ এবং সুদূর পল্লীগৃহের খেজুর-বীথিকার সহজ আর বৃহৎ বিষয় সম্বন্ধে আলাপ করে এবং কখনো আপনি শুনবেন না ওরা বাজে বকছে, কারণ মরুভূমিতে কেউ বাজে বকতে পারে না।...

আর প্রাণের দাবি আপনার মালুম হবে তৃষ্ণার সে দিনগুলিতে যখন শুকনা এক টুকরা কাঠের মতো জিব লেগে থাকে তালুর সংগে এবং দিগন্ত থেকে মুক্তির কোনো পয়গাম আসে না, বরং তার জায়গায় আসে জ্বলন্ত 'মরু-সাইমুম' এবং ঘূর্ণমান বালু-ঝড় ঃ আরো ভিন্নতরো দিনে আপনি হয়তো কোনো বেদুঈন তাঁবুতে মেহমান, পুরুষেরা আপনার জন্য নিয়ে আসবে পাত্র ভর্তি দুধ, বসন্তের শুরুতে মোটা-তাজা উষ্ট্রীর দুধ, যখন ধারা বর্ষণের পর স্তেপ আর বালিয়াড়িগুলি বাগানের মতো সবুজ হয়ে ওঠে, জানোয়ারের উর হয়ে ওঠে সুগোল আর ভারী। তাঁবুর এক পাশ থেকে আপনি শুনতে পাবেন আপনার সম্মানে মেয়েরা খোলা আগুনে ভেড়ার গোশ্‌ত পাক করছে আর সশব্দে হাসছে।

রক্তিম ধাতুর মতো সূর্য হারিয়ে যায় পাহাড়ের আড়ালে। পৃথিবীর যে কোনো স্থানের চাইতে রাতের বেলার তারা ঝিলমিল আকাশ এখানে উচ্চতরো আর এই তারার নিচে আপনার ঘুম গভীর এবং নিঃস্বপ্ন; সকালগুলি ফিকে ধূসর এবং মৃদু ঠাণ্ডা, আর শীতল শীতকালের রাতগুলি, হাড় কাঁপানো বাতাস তাঁবুর আগুনের উপর ঝাপটা মারছে, যে আগুনের চারপাশে আপনি আর আপনার সংগীরা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছেন একটুখানি গরমের জন্য। আর গ্রীষ্মের দিনগুলি হচ্ছে অগ্নিঝরা, যখন আপনি চলেছেন আপনার হেলতে-দুলতে চলা উটের পিঠের উপর বসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেন অনন্তকাল ধরে আপনি চলেছেন; ঝলসানো বাতাস থেকে বাঁচানোর জন্য আপনার মুখ আপনার পাগড়ীর কাপড় দিয়ে জড়ানো আর আপনার ইন্দ্রিয়গুলি শান্ত হয়ে নিদ্রালু হয়ে উঠেছে, যখন দুপুরের তপ্ত রোদে আপনার অনেক-অনেক উপরে একটি শিকারী পাখি চক্রাকারে ঘুরছে, চক্কর খাচ্ছে....

দুই

ধীরে ধীরে বিকাল গড়িয়ে যায় তার বালিয়াড়ি, তার নীরবতা আর তার নিঃসংগতা নিয়ে। কিছুক্ষণ পরে নির্জনতা ভাঙে একদল বেদুঈন। ওরা চার কি পাঁচজন পুরুষ আর দু'জন মেয়ে। সবাই উটের উপর সওয়ার। আর একটি ভারবাহী জানোয়ারের পিঠে ওদের ভাঁজ করা কালো তাঁবু, বাসন-কোসন এবং বেদুঈন জীবনের অন্য সব তৈজসপত্র। আসবাবপত্রের স্তূপের উপর বসে আছে দু'টি শিশু। দলটি আমাদের পথ অতিক্রম করছিলো। আমাদের একদম কাছাকাছি এসে পড়ার পর ওরা ওদের জানোয়ারগুলির লাগাম টেনে ধরে বলে ঃ

—'আস্‌সালামু আলাইকুম—তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' আমরা জবাব দিই—'এবং তোমাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক আর বর্ষিত হোক তাঁর আশিস।'

—'তোমরা কোথায় যাচ্ছো মুসাফির?'

—'ইনশাআল্লাহ্, তায়েমা।'

—'তোমরা আসছো কোত্থেকে?'

—'কসর-আসাইমিন থেকে', জবাব দিই আমি। তারপর সব চুপচাপ। এদের মধ্যে একজন লোক বয়স্ক, সে রোগাটে, তার মুখমণ্ডল ধারালো আর তীক্ষ্ণ এবং দাড়ি কালো আর সূঁচালো। সে যে এদের নেতা তাতে সন্দেহ নেই। তার নজর আরো ধারালো ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো যখন তা জায়েদের উপর থেকে এসে সন্দেহজনকভাবে স্থির হলো আমার উপর—রং যার ফরসা এমন একজন বিদেশী আমি। এই পথহীন ঊষর প্রান্তরে হঠাৎ আমি আবির্ভূত হয়েছি শূন্য থেকে, অপ্রত্যাশিত—আমি ব্রিটিশ দখলভুক্ত ইরাকের দিক থেকে আসছি। হতে পারে আমি একজন (সে তীক্ষ্ণ মুখওয়ালা লোকটির মনের কথা যেনো আমি পড়তে পারছি) কাফির, গোপনে আরব ভূমিতে ঢুকেছি। প্রবীণ লোকটির হাত যেনো হতবুদ্ধি হয়েই তার জিনের সম্মুখভাগটি নিয়ে খেলা করছে। আর এতক্ষণে আমাদের চারপাশে তার সংগীরা ফাঁক ফাঁক হয়ে অপেক্ষা করছে। কথা তো দলের সরদার হিসাবে ও-ই বলবে। কয়েকটি মুহূর্ত পর, মনে হলো, সে যেন আর এ নীরবতা বরদাশত করতে পারছে না, আমাকে সে জিজ্ঞাস করে ঃ

—'কোন্ আরবদের লোক তুমি?'—অর্থাৎ আমি কোন্ কওম বা এলাকার ও জানতে চায়। কিন্তু আমি জবাব দিয়ে ওঠার আগেই আমাকে চিনতে পেরে আচমকা হাসিতে তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

—'ওহ্, এখন তোমাকে চিনতে পারছি। আবদুল আজীজের সংগে তোমাকে দেখেছি। কিন্তু সে তো অনেকদিন—পুরা চার বছর আগের কথা, তাই না?'

সে তার বন্ধুত্বভরা হাত বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে। তারপর বলে সেই সময়ের কথা, যখন আমি বাস করছিলাম রিয়াদের শাহী কিল্লায়—আর সে এসেছিলো শাম্মার খান্দানের এক সরদারদলের সংগে, ইব্‌নে সউদের কবিলাকে শ্রদ্ধা জানাতে। ইব্‌নে সউদকে বেদুঈনেরা সবসময়ই তাঁর পয়লা নাম 'আবদুল আজীজ' বলে ডাকে। আনুষ্ঠানিক সম্মানসূচক কোনো খেতাব তারা যোগ করে না তাঁর নামের সংগে, কারণ বেদুঈনেরা মুক্ত মানুষ। বাদশাহ্‌কে তারা শুধু একজন মানুষ বলেই জানে—বেশক তিনি সম্মানের পাত্র,

কিন্তু মানুষ যতোটুকুর যোগ্য তার বেশি নয়। এমনিভাবে আমরা কিছুক্ষণ সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিকে স্মৃতির সাহায্যে জীবন্ত করে তুলি, হয় এর কথা না হয় ওর কথা বলি। আর রিয়াদ্ সম্পর্কে ও এক কাহিনী বলে তো আমি বলি আর এক কাহিনী— সেই রিয়াদ, যার ভেতরে ও বাইরে রোজ হাজার মেহ্মান বাদশাহ্র খরচে বাস করে আর যাবার সময় ওরা পায় ইনাম—প্রত্যেক ব্যক্তির ইজ্জত অনুসারে—এক মুঠা রূপার মুদ্রা বা একটা 'আবায়া' থেকে শুরু করে সোনার মোহর ভর্তি থলে, ঘোড়া অথবা উট যা বাদশাহ্ প্রায়ই দিয়ে থাকেন সরদারদেরকে।

কিন্তু বাদশাহ্র এই মহানুভবতা অর্থের যতোটা না তার চাইতে ঢের বেশি তাঁর হৃদয়ের। হয়তো সবার উপরে তাঁর হৃদয়ানুভূতির এই উষ্ণতার জন্যই চারপাশে সবাই তাঁকে ভালবাসে এবং আমিও ভালবাসি।

আরবে যে-বছরগুলি আমি কাটিয়েছি ইব্‌নে সউদের বন্ধুত্ব যেন একটা উষ্ণ আলোর দীপ্তির মতো সবসময়েই ছড়িয়েছিলো আমার জীবনের উপর। তিনি আমাকে বন্ধু বলে ডাকেন যদিও তিনি একজন বাদশাহ্ আর আমি একজন সাংবাদিক মাত্র। তাঁর রাজ্যে আমি যে-বছরগুলি কাটিয়েছি সেই বছরগুলিতে সবসময়ে আমি তাঁর বন্ধুত্ব দেদার পেয়েছি বলেই যে আমি তাঁকে ভালোবাসি, তা নয়। কারণ বন্ধুত্ব তিনি বহু মানুষকেই বিতরণ করেন। আমি তাঁকে আমার বন্ধু বলে ডাকি, কারণ বহু মানুষের মধ্যে যেমন তাঁর টাকার থলে মেলে ধরেন, তেমনি তিনি কখনো কখনো তাঁর হৃদয়কে মেলে ধরেন আমার কাছে। আমি তাঁকে আমার বন্ধু বলতে ভালোবাসি, কারণ তাঁর সকল দোষত্রুটি সত্ত্বেও আর দোষত্রুটি কারই বা না আছে—তিনি একজন অতিশয় মহৎ ব্যক্তি; ঠিক 'দয়ালু' নন, কারণ দয়ালুতাই কোন কোন সময় একা সস্তা চিজ হয়ে উঠতে পারে। একটা পুরোনো দামেস্ক—তরবারী দেখে যেমন আপনি মুগ্ধ বিস্ময়ে বলেন, হ্যাঁ, এ একটা 'উৎকৃষ্ট' হাতিয়ার বটে, কারণ, এ ধরনের একটি অস্ত্রে আপনি যা-কিছু চান সবই আছে, ঠিক তেমনিভাবে আমি ইব্‌নে সউদকে একজন মহৎ ব্যক্তি বলে মনে করি। তিনি নিজের মধ্যে সমাহিত এবং সবসময় নিজের পথে চলেন এবং তিনি যদি তাঁর কাজ-কর্মে প্রায়ই ভুলও করেন, তারও কারণ তিনি নিজে যা তা'ছাড়া আর কিছুই কখনো তিনি হতে চান না।

বাদশাহ্ আবদুল আজীজের সাথে আমার প্রথম মুলাকাত হয় মক্কায়, ১৯২৭ ইংরেজির প্রথমদিকে, আমার ইসলাম গ্রহণের কয়েক মাস পরেই।

আমার স্ত্রী— যিনি মক্কায় আমার এই প্রথম হজ্ব-যাত্রায় আমার সংগিনী ছিলেন—সম্প্রতি তাঁর আকস্মিক ইন্তেকাল আমাকে করে তুলেছিলো বিষণ্ন; আমি অসামাজিক হয়ে উঠেছিলাম। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম অন্ধকার থেকে, চরম নৈরাশ্য থেকে মুক্তি পাবার জন্য। বেশির ভাগ সময় আমি আমার ঘরেই কাটাচ্ছিলাম। এ সময়ে আমার সম্পর্ক ছিলো মাত্র গুটিকয়েক লোকের সাথে এবং বাদশাহ্র সাথে প্রথামতো সৌজন্যমূলক মুলাকাতও এড়িয়ে যাচ্ছিলাম কয়েক হপ্তা ধ'রে। তারপর, একদিন বাদশাহ্ ইব্‌নে সউদের একজন বিদেশী মেহমান—ইন্দোনেশিয়ার হাজী আজোস সলিমের সাথে মুলাকাত করতে গিয়েই জানতে পারলাম, বাদশাহ্র হুকুমে আমার নামও তাঁর মেহমানদের তালিকায় তোলা হয়ে গেছে। মনে হয়, তিনি আমার নীরবতার কারণ জানতে পেরেছিলেন এবং নীরব সহৃদয়তার সংগে তা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এভাবে একজন মেহমান

হিসাবে—যে-মেহমানের আজ পর্যন্ত একবারের জন্যও তাঁর মেহমানদারের মুখ দেখার নসিব হয়নি, আমি মক্কার দক্ষিণ প্রান্তে, শিলাময় গিরি—সংকটের নিকটে একটি সুন্দর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। এই গিরি-সংকটের মধ্য দিয়েই রাস্তা চলে গেছে ইয়েমেনের দিকে। চত্বর থেকে আমি নগরীর একটি বড় অংশ দেখতে পাচ্ছিলাম—মসজিদুল কুব্‌রার মীনার, রঙিন ইঁটের ছাদবিশিষ্ট হাজার হাজার গৃহের সারি এবং নিষ্প্রাণ মরু-পাহাড়, যার উপর গম্বুজের মতো রয়েছে আকাশ, তরল ধাতুর মতো ঝলসানো আকাশ।

তবু, বাদশাহ্‌র সাথে আমার মুলাকাত হয়তো আমি মুলতবিই রেখে দিতাম যদি না মসজিদুল কুব্‌রার বারান্দায়, একটা বই-ঘরে, ঘটনাক্রমে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র আমীর ফয়সলের সাথে আমার দেখা হতো। পুরোনো আরবী, ফারসী এবং তুর্কী পুঁথি-পাণ্ডুলিপিতে পরিবেষ্টিত হয়ে সেই দীর্ঘ সংকীর্ণ কামরাটিতে বসা ছিলো একটা আনন্দের ব্যাপার; কামরাটির নিশ্চলতা ও অন্ধকার আমাকে ভরে দিতো এক অপূর্ব শান্তিতে। অবশ্যি, একদিন এই স্বাভাবিক নীরবতা একদল মানুষের সশব্দ উপস্থিতিতে ভেংগে গেলো। দলটির আগে আগে ছিলো সশস্ত্র দেহরক্ষীরা। আমীর ফয়সল তাঁর সাংগ-পাংগ নিয়ে বই-ঘরের মধ্য দিয়ে কাঁবায় যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন লম্বা আর হ্যাংলা এবং তাঁর বয়স ও দাড়িশূন্য মুখখানার তুলনায় অনেক—অনেক বেশি মর্যাদাবান। তাঁর বয়স অল্প হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পিতা দু'বছর আগে তাঁর হিজায জয়ের পর পরই তাঁকে হিজাযে বাদশাহ্‌র প্রতিনিধির গুরুদায়িত্ব দিয়েছিলেন (নজদে বাদশাহ্‌র প্রতিনিধি ছিলেন ফয়সলের বড়ো ভাই শাহ্‌যাদা সউদ—যদিও বাদশাহ্ নিজে বছরের অর্ধেকটা কাটাতেন হিজাযের রাজধানী মক্কায় আর বাকী সময়টা কাটাতেন নজদের রাজধানী রিয়াদে)।

বই-ঘরের পরিচালকটি ছিলেন মক্কার একজন তরুণ পন্ডিত। তাঁর সংগে কিছুকাল ধরে আমার দোস্তী। শাহ্‌যাদার সংগে তিনিই আমার পরিচয় করিয়ে দেন।

ফয়সল আমার সাথে হাত মেলালেন এবং আমি যখন তাঁর দিকে মাথা নিচু করলাম, তিনি আঙুলের ডগায় আলতো করে আমার মাথাটা একটু পেছনদিকে ঠেলে দিলেন; তাঁর মুখ হৃদ্যতাময় স্মিত হাস্যে দীপ্ত হলো।

তিনি বললেন—'আমরা, নজদের মানুষেরা, বিশ্বাস করি না যে, এক মানুষ আরেক মানুষের নিকট মাথা নোয়াবে! সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে শুধু আল্লাহরই নিকট সে নোয়াবে মাথা।'

শাহ্‌যাদাকে দয়ালু, স্বাপ্নিক এবং কিছুটা গম্ভীর ও লাজুক বলে মনে হলো। তাঁর সম্পর্কে আমার এ ধারণা আমাদের পরিচয়ের শেষ বছরগুলোতে আরো দৃঢ়মূল হয়। তাঁর ভাবভংগির আভিজাত্য কৃত্রিম নয়, এ যেন তাঁর ভেতর থেকে ঠিকরে পড়ছে, বিকিরিত হচ্ছে। সেদিন আমরা দু'জনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার একটা তীব্র ইচ্ছা হলো, এই পুত্রের পিতার সাথে মুলাকাতের।

—'বাদশাহ্ আপনাকে দেখলে খুশিই হবেন,' আমীর ফয়সল বললেন, 'আপনি তাঁকে এড়িয়ে চলছেন কেন?'

পরদিন 'আমীরের সেক্রেটারী আমাকে একটা মোটরে করে নিয়ে গেলেন বাদশাহ্‌র প্রাসাদে। আমরা যাচ্ছি আল-মা'আলার বাজারের রাস্তা দিয়ে, যাচ্ছি ধীরে ধীরে—উট, বেদুঈন ও নিলামদারদের হট্টগোলে ভিড়ের মধ্য দিয়ে। নিলামদাররা বিক্রি করছে

বেদুঈনদের দরকারী সমস্ত জিনিস—উটের জিন, আবায়া, গালিচা, মশক, রূপার কাজ করা তরবারি, তাঁবু এবং পিতলের তৈরি কফি-পাত্র। এদেরকে ছাড়িয়ে আমরা বের হলাম এক প্রশস্ততরো, নীরবতরো ও অধিক খোলা রাস্তায়, এবং আখেরে গিয়ে পৌঁছুলাম বাদশাহ্ যেখানে থাকেন সেই বিশাল প্রাসাদে। প্রাসাদের সামনেকার খোলা জায়গাটি জিন-আঁটা উটে গিজ্‌গিজ্ করছে এবং কয়েকজন সশস্ত্র দাস ও অনুচর পায়চারি করছে প্রবেশের সিঁড়ির কাছে। আমাকে বসতে দেয়া হলো একটি প্রশস্ত খিলানওয়ালা কামরায়, যার মেঝেতে ছিলো কম-দামী গালিচা বিছানো, দেয়াল ঘেঁষে ছিলো খাকী কাপড়ে ঢাকা সুদীর্ঘ দীওয়ান এবং জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো সবুজ পাতা ঃ এ হচ্ছে একটি বাগিচার শুরু, যা মক্কার শুষ্ক মাটিতে অতি কষ্টের সাথে ফলানো হচ্ছিলো।

একজন কৃষ্ণাংগ বান্দা এসে হাযির হলো—'বাদশাহ্ আপনাকে দাওয়াত করেছেন।'

যে কামরা থেকে আমি এই মাত্র বের হয়ে এলাম তেমনি একটি কামরায় ঢুকলাম। তফাৎ এই যে, কামরাটি ছোটো এবং হালকা, তবে এর একটা দিক বাগিচার দিকে সম্পূর্ণ খোলা। দামী ইরানী গালিচায় মেঝে ঢাকা; বাগিচার দিকে খোলা একটা ঘুলঘুলি-জানালায় দীওয়ানের উপর বাদশাহ্ বসেছিলেন পায়ের উপর পা রেখে। তাঁর পায়ের কাছেই মেঝের উপর বসে সেক্রেটারী তাঁর ডিক্‌টেশন নিচ্ছিলেন। আমি যখন ঢুকলাম, বাদশাহ্ দাঁড়িয়ে গেলেন, তারপর দু'হাত বাড়িয়ে বললেন ঃ 'আহ্‌লান ওয়া সাহ্‌লান'—'এ আপনারই ঘর, সহজ হোন।'

এ অভ্যর্থনার অর্থ 'আপনি এখন আপনার নিজ পরিবারে প্রবেশ করেছেন; আপনি যেন আপনার আসন এখন সহজ জায়গার উপর রাখতে পারেন' ঃ খোশ-আমদেদ জানানোর এই প্রকাশ-ভংগীটি হচ্ছে সবচেয়ে পুরোনো এবং সবচেয়ে সুন্দর আরবীয় প্রথা।

মুহূর্তের জন্য সবিস্ময়ে আমি তাকাই বাদশাহ্ ইব্‌নে সউদের বিশাল উচ্চতার দিকে। যখন (ততোদিনে আমি নজদী রীতির সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছি) আমি আলতো করে তাঁর নাকের ডগা ও কপালে চুমু খেলাম, আমার উচ্চতা ছয় ফুট হওয়া সত্ত্বেও আমাকে পায়ের আঙ্গুলে ভর করে দাঁড়াতে হলো, আর বাদশাহকে মাথা নিচু করে ঝুঁকে পড়তে হলো আমার দিকে। তারপর তাঁর সেক্রেটারীর প্রতি একটি কৈফিয়তের দৃষ্টি হেনে তিনি বসে পড়লেন দীওয়ানে, আর আমাকে তাঁর পাশেই বসিয়ে দিলেন ঃ

—'একটি মিনিট, চিঠিখানা শেষ হলো বলে।'

যখন তিনি শান্তভাবে ডিক্‌টেশন দিয়ে যাচ্ছিলেন তখনি তিনি আমার সাথে আলাপও শুরু করেছিলেন—অথচ দু'বিষয়ের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে গেলো না একটিবারও। কয়েকটি আনুষ্ঠানিক বাক্যের পর আমি তাঁর হতে একটি পরিচয়পত্র দিলাম। তিনি তা পড়লেন, অর্থাৎ একইসংগে তিনটি কাজ তিনি করে চললেন, এবং তারপর, ডিক্‌টেনশন বন্ধ না ক'রে অথবা আমার ভালোমন্দের খবর নেয়া না থামিয়ে তিনি হুকুম দিলেন কফির জন্য।

ইতিমধ্যে আমি তাঁকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ পেলাম। তাঁর দেহ এতো সুগঠিত এবং অংগ-প্রত্যংগের বিন্যাস এতো পরিমিত যে তাঁর বিশাল দেহ—তিনি কমপক্ষে সাড়ে ছয় ফুট নিশ্চয়ই হবেন—শুধু তখনি ধরা পড়ে যখন তিনি দাঁড়ান। চিরাচরিত নীল-শাদা চেক 'কুফিয়া'য় ঘেরা এবং জরীর কাজ-করা 'ইগাল' মাথায় তাঁর মুখমণ্ডল তীব্র পৌরুষব্যঞ্জক। নজদী ফ্যাশন অনুযায়ী তিনি তাঁর দাড়ি ও গোঁফ ছেঁটে

ছোটো করে রাখেন। তাঁর কপাল প্রশস্ত, নাক মজবুত আর উন্নত, ঈগল পাখীর ঠোঁটের মতো; তাঁর পূর্ণ মুখ, মোলায়েম না হয়েও ইন্দ্রিয়জ লাজুকতায় কখনো কখনো একেবারেই নারীসুলভ মনে হতো। যখন তিনি কথা বলেন তাঁর চেহারা মুখের পেশীর অস্বাভাবিক গতিময়তায় জীবন্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু যখন তিনি চুপ করেন তখন তাঁর মুখখানাকে কেমন যেন করুণ মনে হয়—যেন তিনি তাঁর অন্তরের একাকীত্বে আবার ফিরে গেছেন। বাদশাহ্‌র চোখ দুটির গভীর অবস্থান এর জন্য কিছুটা দায়ী হতে পারে। তাঁর বাঁ-চোখের ঝাপসা দৃষ্টি তাঁর মুখমণ্ডলের পরম সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন করেছে খানিকটা! একটা পর্দা দেখা যাচ্ছিলো বাদশাহ্‌র চোখটিতে। পরে তাঁর এই কষ্টের কাহিনী আমি জানতে পেরেছিলাম, যদিও বেশির ভাগ লোকই না জেনে বলতো বাদশাহ্‌র বাঁ-চোখটি আপনিতেই এমনটি হয়েছে; আসলে কিন্তু ব্যাপারটি ঘটেছিলো একটি দুঃখজনক অবস্থায়।

ক'বছর আগে, তাঁর বেগমদেরই একজন, বাদশাহ্‌কে মেরে ফেলার প্রকাশ্য মতলবে, বাদশাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্‌নে রশিদের খানদানের প্ররোচনায় আতরদানিতে বিষ ঢেলে দিয়েছিলো। এ ধরনের পিতলের তৈরি আতরদানি নজদে আনুষ্ঠানিক মজলিসে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথামতো, আতরদানিটি বাদশাহ্‌র মেহমানদের সামনে রাখার পূর্বে প্রথমে তা দেয়া হয় বাদশাহ্‌কে। প্রথমবার গন্ধ নিয়েই ইব্‌নে সউদ টের পান গন্ধটা যেনো কেমন বিদঘুটে লাগছে—সংগে সংগেই তিনি আতরদানিটি নিক্ষেপ করেন মেঝের উপর। তাঁর সতর্কতায় তাঁর জান বেঁচে গেলো, কিন্তু তার আগেই তাঁর বাঁ-চোখ আহত ও কিছুটা অন্ধ হয়ে পড়লো। তাঁর অবস্থায় বহু রাজা-বাদশাহ্‌ নিশ্চিতভাবেই এর বদলা নিতেন; কিন্তু ইব্‌নে সউদ বিশ্বাসঘাতিনী নারীর উপর বদলা না নিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন—কারণ, তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে, নারীটি তার আপন পরিবারের অনিবার্য প্রভাবেই এ কাজ করেছে, যেহেতু ইব্‌নে রশিদের পরিবারের সাথে সম্পর্কিত ছিলো এ নারীর পরিবার। তিনি শুধু তাকে তালাক দিলেন, তারপর প্রচুর সোনারূপা ও ইনামসহ তাকে পাঠিয়ে দেন 'হাইলে,' তার আপন বাড়িতে।

সেই পয়লা মুলাকাতের পর বাদশাহ্‌ প্রায় রোজই আমাকে ডেকে পাঠাতে লাগলেন। এক সকালে আমি তাঁর কাছে গেলাম একটি ইচ্ছা নিয়ে। বেশি আশা করিনি যে তা মঞ্জুর হবে; কারণ, আমি অনুমতি চেয়েছিলাম দেশের ভেতরে সফর করার, অথচ বাদশাহ্‌ সাধারণত বিদেশীদেরকে নজদ সফরের এজাজত দেন না। সে যা-ই হোক, আমি যখন প্রস্তাবটি তুলি-তুলি করছি বাদশাহ্‌ হঠাৎ আমার প্রতি একটা সংক্ষিপ্ত অথচ তীব্র দৃষ্টি হানলেন; এ এমন এক দৃষ্টি যে, মনে হলো তা আমার অনুক্ত ভাবনা-চিন্তার একেবারে মর্মে গিয়ে প্রবেশ করেছে; বাদশাহ স্মিত হাসলেন, তারপর বললেন—'ও মুহাম্মদ, তুমি কি আমার সংগে নজদ আসবে না, এবং মাস কতক রিয়াদে থাকবে না?'

আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলাম এবং আর যাঁরা ওখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের অবস্থাও হুবহু আমারই মতো মনে হলো। কোনো বিদেশীর প্রতি এমন স্বতঃস্ফূর্ত দাওয়াত প্রায় অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার।

তিনি বলে চললেন, 'আমি চাই যে, আসছে মাসে তুমি আমার সাথে মোটরে সফর করবে।'

আমি বুক ভরে দম নিলাম এবং তারপর বললাম, 'হে ইমাম, আল্লাহ্‌ আপনাকে

দীর্ঘজীবী করুন। তবে মোটরে সফর করে আমার কি ফায়দা হবে? পাঁচ–ছ'দিনে মক্কা থেকে রিয়াদ ছুটে গিয়ে কি লাভ হবে আমার যদি না আমি আপনার দেশের কিছুই দেখতে পেলাম....মরুভূমি, কিছু বালিয়াড়ি এবং হয়তো দিগন্তের ধারে কোথাও কিছু মানুষ, ছায়ার মতো কিছু মানুষ ছাড়া? আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, আপনার সকল মোটরের চাইতে একটি উটই হবে আমার জন্য বেশি উপযোগী!'

ইব্‌নে সউদ হাসলেন ঃ 'তোমার কি তাহলে আমার বদুদের চোখে চোখে তাকাবার লোভ হয়েছে? আমি তোমাকে আগে থেকেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি ঃ ওরা বড় অনুন্নত। আর আমার নজদ হচ্ছে মরুভূমি, এর কোনো আকর্ষণই নেই; এ সফরে উটের জিন শক্ত মালুম হবে আর খাবার হবে দুষ্প্রাপ্য ; ভাত, খেজুর এবং কচিৎ কখনো গোশ্‌ত ছাড়া আর কিছুই মিলবে না। কিন্তু তা যা–ই হোক, তুমি যদি উটে চড়েই সফর করতে চাও, তা–ই হবে এবং শেষতক এ–ও হতে পারে যে, আমার কওমকে চেনার পর তুমি আফসোস্ করবে নাঃ তারা গরীব, তারা কিছুই জানে না, তারা কিছুই নয়, কিন্তু তাদের হৃদয় সরল বিশ্বাসে পূর্ণ।'

এবং এর কয়েক হপ্তা পরেই একটি ঘুরতি পথে আমি বার হয়ে পড়ি রিয়াদের দিকে; সফরের সম্বলস্বরূপ বাদশাহ্ দিলেন উট, খাদ্যসম্ভার, একটি তাঁবু ও একজন হাদী বা পথ–প্রদর্শক। রিয়াদে পৌঁছুতে আমার লাগলো দু'মাসেরও বেশি। এ–ই ছিলো আরবের অভ্যন্তরে আমার পহেলা সফর,—আমার বহু সফরের মধ্যে প্রথম। কারণ, বাদশাহ্ যে অল্প ক'মাসের কথা বলেছিলেন, সেই ক'মাসই গড়িয়ে গিয়ে ক'য়েক বছরে দাঁড়িয়ে গেলো, কত সহজেই না কয়েক বছর হয়ে উঠলো— যে–বছরগুলি আমি শুধু রিয়াদে নয়, আরবের প্রায় প্রত্যেক এলাকাতেই ঘুরে বেড়িয়েছি এবং উটের জিন এখন আর কঠিন মালুম হয় না!

'আল্লাহ্ আবদুল আজীজকে দীর্ঘজীবী করুন,' বললো তীক্ষ্মমুখো লোকটি,— 'তিনি 'বদু'কে ভালোবাসেন এবং 'বদুরা' তাঁকে ভালোবাসে!' আর কেনই বা তারা ভালোবাসবে না?—আমি নিজেকে শুধাই। নজদের বেদুঈনদের প্রতি বাদশাহ্ মুক্তহস্ত এবং তাঁর এই সাহায্য তাঁর হুকুমতের একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। হয়তো খুব প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য নয়, কারণ বাদশাহ বিভিন্ন কবিলার সর্দারদের ও তাদের অনুগতদের মধ্যে নিয়মিত যে–সব অর্থ–উপহার বিতরণ করেন তার ফলে তারা বাদশাহ্‌র ইনামের উপর এতোটা নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে যে, তারা নিজের চেষ্টায় নিজেদের জীবনের অবস্থা উন্নত করার উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছে এবং ক্রমে ক্রমে তারা হয়ে উঠেছে খয়রাত–ভোজী–জাহিল এবং অলস থাকতেই খুশি।

তীক্ষ্মমুখোর সংগে আমার আলাপের আগাগোড়া আমি লক্ষ্য করলাম—জায়েদ যেন কিছুটা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সে যখন ওদের একজনের সংগে কথা বলছে তখনি ঘন ঘন তার চোখ রাখছে আমার উপর, যেনো সে দৃষ্টি আমাকে ইয়াদ করিয়ে দিতে চাইছে—এখনো দূর–দরাজ পথ রয়েছে আমাদের সামনে এবং পুরোনো স্মৃতির রোমন্থন, ফেলে আসা অতীতের চিন্তা–ভাবনা উটের গতিকে ত্বরান্বিত করে না। আমরা বিদায় নিই। শাম্মার বেদুঈনেরা উট হাঁকিয়ে পূব্ মুখে আগাতে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বালিয়াড়ির আড়ালে হারিয়ে যায়। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকেই আমরা শুনতে পাই—ওদের একজন একটা যাযাবরী গানের সুর ধরেছে—এমন গান, যা উট তাঁর

সওয়ারীর গতি বাড়ানোর জন্য এবং উটে চড়ে চলার একঘেঁয়েমি দূর করার জন্য গেয়ে থাকে এবং যখন জায়েদ আর আমি আবার আমাদের পশ্চিমমুখো পথ ধরি সুদূর তায়েমার দিকে, তখন সে সুরটি ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায় আমাদের পেছনে এবং নীরবতা আবার ফিরে আসে।

তিন

—'দেখুন, দেখুন,' জায়েদের গলার স্বর নীরবতা ভাঙে,—'একটি খরগোশ!'

একটি ঝোপ থেকে এইমাত্র ধূসর পশমের যে বাণ্ডিলটি লাফ দিয়ে বের হলো আমি তার দিকে তাকাই আর জায়েদ পিছলে নেমে পড়ে তার জিন থেকে, জিনের আগা থেকে যে কাঠের ডাণ্ডাটি ঝুলে থাকে তাই খুলে নিয়ে। সে খরগোশটির পেছনে লাফিয়ে পড়ে এবং ছুঁড়ে মারার জন্য সে কাঠের ডাণ্ডাটি মাথার উপর ঘুরাতে থাকে—কিন্তু যেইমাত্র সে ওটি ছুঁড়তে যাবে অমনি তার পা আটকে যায় একটি 'হাম্‌দে'র শিকড়ে, সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় মুখের উপর—আর খরগোশটি চোখের আড়ালে গায়েব হয়ে যায়।

—'একটা চমৎকার খাবার হারালাম বটে', আমি জায়েদের দিকে তাকিয়ে হাসি। জায়েদ নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তার নিজের হাতের ডাণ্ডাটির দিকে অনুশোচনা-মেশানো দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে।

—'কিন্তু এজন্য দুঃখ করো না, জায়েদ, খরগোশটি আলবৎ আমাদের কিসমতে ছিলো না।...'

—'না, আমাদের কিসমতে ওটি ছিলো না—কিছুটা আনমনা হয়ে সে জবাব দেয়। তারপর দেখি কি—ও কিছুটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

—'তুমি কি আঘাত পেয়েছো, জায়েদ?'

—'ওহ্, কিচ্ছুনা। শুধু আমার গোড়ালিটা মচ্‌কে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেরে যাবে।'

কিন্তু সত্যি সে সেরে উঠলো না। জিনের উপর বসে আরো ঘণ্টাখানেক চলার পর আমি জায়েদের মুখে কিছু ঘাম দেখতে পাই এবং তার পায়ের দিকে যখন একবার তাকালাম—দেখতে পেলাম—তার গোড়ালিটি একদম মচ্‌কে গেছে এবং ভয়ানক ফুলেও উঠেছে।

—'এভাবে চলার কোনো মানে নেই জায়েদ, চলো, আজ আমরা এখানেই তাঁবু খাটাই। এক রাতের বিশ্রামে তুমি সেরে যাবে।'

জায়েদ সারারাত ছটফট করে যন্ত্রণায়। সুবেহ্ সাদেকের অনেক আগেই সে উঠে পড়ে আর তার হঠাৎ চঞ্চল্য আমাকেও জাগিয়ে দেয় আমার অস্বস্তিকর ঘুম থেকে।

—'শুধু একটি উটই দেখতে পাচ্ছি,' সে বলে, তারপর, আমরা চারদিকে তাকিয়ে আবিষ্কার করি, জানোয়ার দু'টির একটি—জায়েদের উটটিই গায়েব হয়ে গেছে। আমার উটে চড়ে জায়েদ তার উটের খোঁজে বার হতে চায়—কিন্তু তার পায়ের জখমের জন্য দাঁড়ানোই তার পক্ষে কঠিন; হাঁটা আর উটে চড়া এবং উট থেকে নামার তো কথাই ওঠে না।

—'তুমি বরং আরাম করো জায়েদ,—তোমার বদলে আমিই যাচ্ছি, আমি যে পথে

যাবো সেই পথ ধরে আবার ফিরে আসা আমার পক্ষে কঠিন হবে না'।

এবং সূর্যোদয়ের সাথে সাথে আমি হারানো উটটির পায়ের নিশানা ধরে বের হয়ে পড়ি আমার উটে চড়ে; পায়ের দাগ আগিয়ে যায় বালু-উপত্যকার মধ্য দিয়ে একেবেঁকে, তারপর তা হারিয়ে গেলো বালিয়াড়ির আড়ালে।

আমি এক ঘণ্টা চলি—তারপর আরেক ঘণ্টা, তারপরও এক ঘণ্টা; কিন্তু হারিয়ে যাওয়া জানোয়ারটির পদচিহ্ন আগাচ্ছে তো আগাচ্ছেই—যেন জানোয়ারটি ইচ্ছা করেই একটি বিশেষ পথ ধরে আগিয়েছে। পদচিহ্ন অনেক দূর গড়িয়ে যায় যখন আমি কিছুক্ষণের জন্য উট থেকে নামি—কয়েকটা খেজুর আর উটের সংগে বাঁধা মশক থেকে কিছু পানি খাই। সূর্য অনেক উপরে। কিন্তু কেন জানি, ওর চোখ ঝলসানো দীপ্তি এখন আর নেই। বছরের এই সময়ে সচরাচর যা ঘটে না, পিঙলবর্ণ মেঘ নিশ্চল ভাসছে আসমানের নিচে; এক বিস্ময়কর পুরু এবং ভারী বাতাস মরুভূমির বুক চেপে আছে আর বালিয়াড়ির রূপরেখা, সাধারণত যেমন মোলায়েম হয়ে থাকে তার চাইতে সেগুলোকে অনেক অনেক বেশি স্নিগ্ধ করে তুলেছে।

আমার সমুখে উঁচু বালু পাহাড়ের চূড়ায় একটা অদ্ভুত আন্দোলন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—ওটি একটি জানোয়ার? হয়তো হারানো উটটি! কিন্তু আরো মনোযোগ দিয়ে তাকালে পরে দেখতে পাই—আন্দোলনটি চূড়ার উপরে নয়—চূড়ারই মধ্যে। চূড়াটি চলতে শুরু করেছে খুব ধীরে, বিরাম না নিয়ে হালকাভাবে চলছে, অস্পষ্ট ঢেউ-খেলানো লহরী তুলে চলছে সামনের দিকে—তারপর মনে হলো ঢালু বেয়ে আমার দিকে গড়িয়ে পড়ছে—আস্তে আস্তে গড়িয়ে পড়া একটা ঢেউ-এর মাথার চূড়ার মতো। বালিয়াড়ির ওপাশ থেকে একটা গাঢ় রক্তিমতা লতিয়ে লতিয়ে ওঠে আসমানের দিকে। এই রক্তিমতার নিচে, বালিয়াড়ির রেখাগুলি তাদের তীক্ষ্মতা হারিয়ে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে—যেনো হঠাৎ একটা যবনিকা টেনে দেয়া হয়েছে মাঝখানে; লালাভ এক ফিকে উদয়-রশ্মি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মরুভূমির উপর। বালু-মেঘ আমার মুখের উপর ও চারপাশে ঘুরপাক খেতে শুরু করে এবং সহসা বাতাস প্রচন্ড আঘাতে উপত্যকাটিকে ছেদ করে, ভেদ ক'রে ছিন্নভিন্ন করে চারদিক থেকে শুরু করলো গর্জন। প্রথম পাহাড়-চূড়াটির মতোই আমার দৃষ্টির ভেতরকার সকল বালু-পাহাড়ের চূড়াই বিন্দু বিন্দু হয়ে ঝুরে ঝুরে গড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসমান একটি গভীর মরচে কটা রং ধারণ করে এবং বাতাস ভরে ওঠে ঘূর্ণমান বালুকণায়, যা লালাভ ঘন কুয়াশার মতো সূর্য এবং দিবস, দুটিকেই ঢেকে দেয়। এ যে ধূলিঝড় এতে কোনোই সন্দেহ নেই!

হামাগুড়ি দিয়ে বসা উটটি আতংকে উঠে দাঁড়াতে চায়। বাতাস ততোক্ষণে ঝড়ের রূপ নিয়েছে। বাতাসের মধ্যে নিজেকে সোজা করে রাখার চেষ্টা করি এবং উটটির গলায় দড়ি বেঁধে বসিয়ে দিই; উটটির সামনের পা দু'টি আমি রশি দিয়ে বাঁধি এবং আরও নিশ্চয়তার জন্য ওর পেছনের একটি পা-ও। এরপর আমি নিজে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি মাটির উপর এবং আমার মাথার উপর 'আবায়া'টি টেনে দিই। উড়ন্ত বালুতে যাতে শ্বাস রোধ না হয় সেজন্য আমি উটটির বগলে আমার মুখ চেপে ধরি। আমি টের পাই, জানোয়ারটিও তার মুখ চেপে ধরেছে আমার কাঁধের উপর, সন্দেহ নেই; এ কারণে আমি অনুভব করি—আমার যে দিকটায় উটের শরীরের আড়াল নেই। সে দিক থেকে বালু স্তূপীকৃত

হচ্ছে আমার উপর; বালুর নিচে যাতে আমি একদম চাপা না পড়ে যাই সেজন্য আমি কিছুক্ষণ পর পর বাধ্য হয়ে স্থান বদলাতে থাকি।

আমার উদ্বেগ অহেতুক নয়, কারণ মরুভূমিতে হঠাৎ বালু-ঝড়ে পড়া আমার জন্য এ পয়লা নয়। আমার নিজের 'আবায়ায়' নিজেকে খুব এটেসেঁটে ঢেকে লম্বা হয়ে মাটির উপর পড়ে থাকি।

ঝড় কতোক্ষণে থামবে তার জন্য অপেক্ষা করি। বাতাসের গর্জন আর আমার পোশাকের পত্‌পত্‌ শব্দ শোনা ছাড়া যেনো আমার আর কিছু করার নেই, রশি ছেড়ে দেওয়া পালের পত্‌পত্‌ শব্দ—অথবা বাতাসে পতাকার শব্দ—মার্চ করে চলা বেদুঈন ফৌজের হাতে দীর্ঘ-দণ্ডের মাথায় কওমী পতাকার পত্‌পত্‌ শব্দের মতো, যেমনটি পতাকা নেচেছিলো এবং পত্‌পত্‌ করেছিলো প্রায় পাঁচ বছর আগে নজদী বেদুঈন সওয়ারদের উপর; ওরা ছিলো কয়েক হাজার এবং আমিও ছিলাম ওদের মধ্যে। হজ্ব করার পর আমরা আরাফাত থেকে ফিরছিলাম মক্কায়! এ ছিলো আমার দ্বিতীয় হজ্ব যাত্রা। আরব উপদ্বীপের অভ্যন্তরভাগে বছরখানেক কাটিয়ে পবিত্র নগরীর পূর্বে আরাফাত প্রান্তরে হাজীদের জমাতে ঠিক হজ্বের সময়ে শামিল হবার জন্য আমি কোনো রকমে ফিরে এসেছিলাম মক্কায়। এবং আরাফাত থেকে ফেরার পথে আমি দেখতে পেলাম—আমি ছিলাম সাদা পোশাক-পরা নজদী বেদুঈনদের এক বিপুল জনতার সংগে—ধূলি প্রান্তরের উপর দিয়ে ঘন পদক্ষেপ এবং দ্রুত গতিতে উট হাঁকিয়ে চলেছে, সাদা পোশাক-পরা মানুষের এক সমুদ্র যেনো—কেউ মধুরঙা হলদে উটের পিঠে, কেউ চড়েছে স্বর্ণাভ বাদামী রঙের উটে এবং কেউবা লালচে বাদামী রঙের উটে; উচ্চকিত পৃথিবী—কাঁপানো গতিতে নর্তন-কুর্দন করতে করতে আগিয়ে চলেছে হাজার হাজার উট যেন একটা অপ্রতিরোধ্য তরংগ ধেয়ে চলেছে সামনের দিকে—কওমী ঝাণ্ডাসমূহ গর্জন করছে বাতাসে এবং কওমী হাঁক-ডাক যার মাধ্যমে ওরা ওদের বিভিন্ন কওমের এবং ওদের পূর্বপুরুষদের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের কথা ঘোষণা করে থাকে—ঢেউয়ের আকারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে। আসলে নজদের বাসিন্দাদের জন্য তথা মধ্য আরবের উচ্চ ভূমিসমূহের অধিবাসীদের জন্য যুদ্ধ আর হজ্বের উৎস একই....এবং অন্যান্য দেশের অসংখ্য হজ্বযাত্রী—যারা এসেছে মিসর থেকে, ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে, উত্তর আফ্রিকা এবং জাভা থেকে—যারা এ ধরনের মত্ততায় অভ্যস্ত নয়, আতংকে ওরা আমাদের সন্মুখ থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো, কারণ সে গর্জনশীল বাহিনীর পথের কাছে দাঁড়িয়ে জানে বেঁচে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়, ঠিক যেমন ছুটে চলা হাজার হাজার উটের মধ্যে কোন আরোহী তার উটের পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়লে মৃত্যুই তার জন্য অবধারিত।

উটের পিঠে সেদিনকার সে চলা যতো উন্মাদনাপূর্ণই হোক, আমি সে উন্মাদনায় শরিক হয়েছিলাম এবং আমার অন্তরে একটা বুনো আনন্দ, বোঁ-বোঁ শোঁ-শোঁ ধ্বনি, আমি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম সেই বিশেষ মুহূর্তটির নিকট, গতি ও গর্জনের নিকট—আর আমার মুখের উপর দিয়ে ছুটে-যাওয়া বাতাস যেন গেয়ে উঠলো, 'তুমি আর কখনো পরদেশী থাকবে না—আমার জাতির মধ্যে আর কখনো তুমি পর বলে গণ্য হবে না।'

আমরা পত্‌পত্‌ করা 'আবায়া'র নিচে বালুর উপর শুয়ে থেকে আমি শুনতে পাই ধূলি-ঝড়ের গর্জন থেকেও যেনো প্রতিধ্বনি উঠছে—'কখনো তুমি আর পরদেশী থাকবে না।'

আমি আর পরদেশী নই। আরব আমার স্বদেশ হয়ে উঠেছে। আমার পশ্চিমা অতীত যেনো বহু আগে দেখা একটা স্বপ্ন—এতোটা অবাস্তব নয় যে ভুলে যেতে পারি এবং এতোটা বাস্তব নয় যে আমার বর্তমানের অংশ হয়ে উঠবে। কথা এ নয় যে, আমি অলস স্বপ্ন-বিলাসী হয়ে উঠেছি—বরং যখনই আমি কোনো শহরে কয়েক মাস ধরে থাকি—যেমন মদীনায়, যেখানে আমার এক আরবী বিবি এবং এক শিশু ছেলে রয়েছে, আর আছে ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের উপর লেখা বইয়ে ভর্তি একটি বইঘর—আমি চঞ্চল হয়ে উঠি এবং কর্ম ও গতির জন্য, মরুভূমির শুষ্ক প্রাণবন্ত হওয়ার জন্য, উটের ঘ্রাণ এবং উটের জিনের পরশের জন্য প্রলুব্ধ হয়ে উঠি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, জীবনের বেশির ভাগ সময়ে (আমার বয়স এখন বত্রিশ-এর কিছু উপরে) ঘুরে বেড়ানোর যে তাগিদ আমাকে এতোটা অস্থির করেছে এবং বার বার আমাকে সকল রকমের ঝুঁকি ও বিপদ-আপদ মুকাবেলার প্রতি প্রলুব্ধ করেছে তার উৎস এ্যাডভেঞ্চারের নেশায় ততোটা নয়, যতোটা পৃথিবীতে আমার নিজের জন্য একটা স্বস্তির স্থান খুঁজে বার করার বাসনার মধ্যে, এমন একটা বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য, যেখানে আমি, আমার জীবনে—কিছুই ঘটুক, তার সামঞ্জস্য বিধান করতে পারি আমি যা কিছু ভাবি, অনুভব করি, কামনা করি, তার সংগে। এবং আমি যদি ঠিকমতো বুঝে থাকি, এই বছরগুলিতে অন্তরের এই আবিষ্কারের বাসনাই, আমার ইউরোপীয় জন্ম এবং ইউরোপীয় পরিবেশে লালন-পালন যা কিছু আমার ভাগ্যে নির্ধারিত করেছে বলে মনে হয়েছিলো সেসব থেকে আমাকে *ঠেলে* দিয়েছে চিন্তা এবং বাইরের রূপ, উভয়দিক দিয়েই সম্পূর্ণ আলাদা এক নতুন জগতে।

ঝড় যখন সম্পূর্ণ থামলো আমি আমার চারদিকে জমে-ওঠা বালুর স্তূপ থেকে গা ঝেড়ে বের হয়ে এলাম। আমার উটটিও বালুতে অর্ধেকটা ডুবে আছে, কিন্তু তাই বলে অভিজ্ঞতা হিসাবে তা খুব খারাপ ছিলো না, কারণ এ রকমের অভিজ্ঞতা উটটির জীবনে অবশ্যি আরো বহুবার ঘটেছে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হলো, বালুতে আমার মুখ-কান এবং নাক ভর্তি করে দেওয়া আর আমার জিনের উপর থেকে ভেড়ার চামড়াটা উড়িয়ে নেওয়া ছাড়া ঝড় আমাদের তেমন কোন ক্ষতি করেনি। কিন্তু শিগগীরই আমার ভুল বুঝতে পারলাম।

আমার চারপাশে সব কটি বালিয়াড়ির রূপরেখা একেবারে বদলে গেছে। হারানো উটের ও আমার পায়ের দাগ মুছে গেছে ঝড়ে। আমি দাঁড়িয়ে আছি সম্পূর্ণ নতুন ভূমির উপর। এখন আর তাঁবুতে ফিরে যাওয়া অথবা নিদেনপক্ষে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছু করবার নেই; সহায় কেবল সূর্য এবং দিক সম্পর্কে সাধারণ একটা ধারণা যা মরুভূমির সফরে অভ্যস্ত যে-কেনো ব্যক্তিরই প্রায় একটা সহজাত অনুভূতিবিশেষ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এ দুটি সহায়ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়; কারণ বালিয়াড়ির জন্য আপনি একটা সোজা সরল পথে আগাতে পারবেন না—পারবেন না আপনি যে দিক অনুসরণ করতে চান সেই দিকে আগাতে।

ঝড়ের ফলে আমার পিয়াস লেগেছে ভীষণ, কিন্তু অল্প কয়েক ঘণ্টার বেশি আমাকে তাঁবু থেকে দূরে থাকতে হবে না, এই ভরসায় আমি আমার ছোট্ট মশক থেকে শেষ চুমুক পানিটুকু অনেক আগেই খেয়ে ফেলেছি। যাইহোক, আমি তাঁবু থেকে দূরে এসে পড়িনি তা নিশ্চিত এবং আমার উটটি, যদিও দুদিন আগে একটি কুয়ার পাশে শেষবার যখন আমরা

থেমেছিলাম তারপর আর পানি খায়নি, তবু আমার এই উটটি হচ্ছে একটি অভিজ্ঞ অভিযাত্রী এবং সে আমাকে বহন করে তাঁবুতে নিয়ে যেতে পারবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে দিকে তাঁবুটি রয়েছে বলে আমার মনে হলো সেই দিকেই আমি ফিরিয়ে দিলাম আমার উটটির মুখ, তারপর রওনা দিলাম ত্বরিত পদে।

এক ঘণ্টা কেটে গেলো, তারপর আরেক ঘণ্টা, তারপর আরেক ঘণ্টা, কিন্তু জায়েদ কিংবা আমাদের তাঁবুর জায়গাটির কোন চিহ্নই নেই। নারাঙ্গি-রঙ পাহাড়গুলির কোনো একটিরই আর পরিচিত চেহারা নেই। ঝড় যদি না-ও হতো তবু এই পাহাড়গুলির মাঝে পরিচিত কিছু খুঁজে বের করা সত্যি খুব মুশকিল হতো।

শেষ বিকালের দিকে আমি এসে পৌঁছি বালুর মধ্য থেকে বেরিয়ে থাকা কতকগুলি গ্রানাইট শিলার নিকট; এসব বালু-বিস্তারের মধ্যে এ রকম শিলার সাক্ষাৎ মিলে কৃচিৎ। দেখা মাত্রই আমি এগুলিকে চিনতে পারলাম। আমি আর জায়েদ গতকালই বিকালে, রাতের জন্য তাঁবু গাড়ার খুব আগে নয়, এর পাশ দিয়ে গিয়েছিলাম। আমি অনেকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, কারণ জায়েদকে আমি যে জায়গায় পাবো বলে আশা করেছিলাম সেখান থেকে যে আমি দূরে এসে পড়েছি তাতে কোন সন্দেহ নেই; হয়তো আমি তাকে হারিয়েছি দু'তিন মাইলের ব্যবধানে। তবু আমার মনে হচ্ছে, কালকের মতো কেবলমাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে সোজা এগিয়ে গেলেই চলবে, ওকে পেতে আর খুব বেগ পেতে হবে না।

আমার মনে আছে, এই শিলাগুলি আর আমাদের রাতের তাঁবুর মধ্যে ছিলো তিন ঘণ্টার পথ; কিন্তু এখন যখন আমি আরো তিন ঘণ্টার জন্য উট হাঁকিয়েছি, কিন্তু তাঁবু বা জায়েদের কোনো নিশানাই খুঁজে পেলাম না, আমি কি তবে তাকে আবার হারিয়েছি? আমি আগাতে থাকি, আগাতে থাকি বারবার দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে, আসমানে সূর্যের গতিবিধির দিকে সযত্ন লক্ষ্য রেখে। যখন রাত্রি নামলো, আমি স্থির করলাম আর আগানো একেবারেই অর্থহীন। তার চেয়ে বরং একটু জিরিয়ে নিই এবং ভোরের আলোর জন্য অপেক্ষা করি! আমি উটটি থেকে নেমে তাকে বাঁধি এবং চেষ্টা করি কয়েকটি খেজুর চিবাতে কিন্তু বলতে কি, আমার ভীষণ পিয়াস পেয়েছে, তাই আমি খেজুরগুলি উটের সামনে রেখে ওর গায়ের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ি।

থেকে থেকে আমার তন্দ্রা আসছে—ঠিক ঘুমও নয়, ঠিক জাগরণও নয়, পর পর কয়েকটি স্বপ্নাবস্থা, যার মূলে রয়েছে শ্রান্তি। সেই তন্দ্রা বারবার টুটে যাচ্ছে তৃষ্ণার দরুন যা ক্রমেই ভয়ানক পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে। তা ছাড়া অন্তরের গহীনতম প্রদেশের কোথাও, যা মানুষ নিজের কাছেও খুলে ধরতে চায় না, রয়েছে ভয়ের সেই শুভ্র সতত গা-মোচড়ানো মলাস্ক[১]—আমার কী হবে যদি আমি জায়েদ ও আমাদের মশকগুলির নিকট ফিরে যাবার পথ আর না পাই? কারণ, এখানে থেকে যে-কোনো দিকেই রওনা করি না কেন, বহুদিন সফর করলেও কোনো বসতি বা পানি আর মিলবে না।

আবার রওনা করি ফজরে। রাতের বেলা ভেবে-চিন্তে এই সিদ্ধান্তে আসি যে, আমি নিশ্চয়ই দক্ষিণদিকে অনেক দূর চলে এসেছি। কাজেই আমি যেখানে রাত কাটিয়েছি জায়েদের তাঁবু সেখান থেকে উত্তর কিংবা উত্তর-পূর্বে কোথাও হওয়া উচিত। তাই, আমরা

১. শামুকজাতীয় কোমলাংগ প্রাণীবিশেষ।

উত্তর, উত্তর-পূর্ব মুখে চলেছি বালু তরঙ্গ ভেদ করে এক উপত্যকা থেকে আরেক উপত্যকায়, কখনো ডানদিকের কখনো বামদিকের বালুর পাহাড়ের চারপাশে ঘুরে ঘুরে। দুপুরে আমরা জিরাই। আমার জিব লেগে আছে তালুর সাথে এবং মনে হচ্ছে এ যেন পুরোনো চিড়-খাওয়া পুরু চামড়া। গলায় ঘা হয়ে গেছে আর চোখ জ্বালা করছে। আমার 'আবায়াটা' মাথার উপর টেনে দিয়ে আমি উটের পেটের সংগে গা ঘেঁষে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমানোর চেষ্টা করি, কিন্তু ঘুম হলো না। বিকালে আবার আমরা রওনা করি, তবে এবার আরো পূর্বমুখে, কারণ এতোক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি আমরা পশ্চিমমুখো হয়ে অনেক দূর চলে এসেছি; কিন্তু আশ্চর্য, এখনো জায়েদ বা তাঁবুর কোন হদিসই নেই।

এমনি করে আসে আরেকটি রাত। তৃষ্ণা হয়ে ওঠে যন্ত্রণা এবং পানির আকাঙ্ক্ষা হয়ে ওঠে মনের একমাত্র অদম্য ভাবনা, যে-মন আর গুছিয়ে চিন্তা করতেও সক্ষম নয়। কিন্তু ভোরের সূর্য আসমান আলো করার সাথে সাথে আমি আবার উঠে বসি আমার উটের পিঠে; সকাল গড়িয়ে, দুপুর গড়িয়ে আরো একটি দিনের বিকাল আসে; আমি উট হাঁকিয়ে চলেছি তো চলেছি। কেবল বালিয়াড়ি আর মরুভূমির রোদের তাপ, বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি এবং তার শেষ নেই। কিংবা এই কি শেষ—আমার সকল পথের, চাওয়ার, সকল পাওয়ার ইতি?—যাদের মধ্যে আমি আর কখনো পরদেশী বলে গণ্য হবো না তাদের মধ্যে আমার সমাপ্তি..? 'আল্লাহ্ গো', আমি প্রার্থনায় ভেঙে পড়ি—'তুমি আমাকে এভাবে ধ্বংস হতে দিও না....।'

বিকালে আমি একটা উঁচু বালিয়াড়ির মাথায় চড়ি, চারদিকের ভূ-প্রকৃতি একটু ভালোভাবে দেখতে পাবো এই আশায়। যখন দেখলাম পূবে, বহুদূরে একটা কালো বিন্দুর মতো কী দেখা যাচ্ছে, আমার ইচ্ছা হলো, উল্লাসে চিৎকার করে উঠি; কিন্তু আমি এতো কাহিল হয়ে পড়েছি যে, চিৎকারের সামর্থ্যও আমার নেই। আমার সন্দেহ নেই যে, এই কালো দাগটি আর কিছু নয়, জায়েদের তাঁবু এবং মশক দুটি—পানি ভর্তি দুটি মস্ত মশক! ফের উটে চড়তে গিয়ে আমার হাঁটু দুটি ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। ধীরে ধীরে হুঁশিয়ারির সাথে আমরা সেই কালো দাগটির দিকে আগাতে থাকি—ওটি যে জায়েদের তাঁবু তাতে একটুও সন্দেহ নেই। আবার যাতে দিক না হারাই এজন্য এবার সবরকমের সতর্কতা অবলম্বন করি। আমি সোজা এক সরলরেখায় আগাতে থাকি—চলতে চলতে কখনো উঠি বালুর পাহাড়ে, কখনো নামি বালু উপত্যকায়, এইভাবে আমাদের কষ্ট দু'গুণ তিন গুণ বাড়িয়ে। শুধুমাত্র এ আশাই আমাকে উদ্দীপিত করেছে যে, কিছুক্ষণ, বড় জোর এক দু'ঘণ্টার মধ্যেই, আমি পৌঁছুবো আমার মঞ্জিলে। শেষ নাগাদ, শেষ বালিয়াড়ির চূড়াটি অতিক্রম করার পর আমার সেই মঞ্জিল স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার চোখের সামনে; আমি উটের মুখের লাগাম টেনে ধরি এবং প্রায় আধ মাইল দূরের সেই কালো দাগটির দিকে তাকাই। মনে হলো, আমার হৃদস্পন্দন যেন থেমে গেছে, কারণ আমার সামনে যা দেখতে পেলাম তা আর কিছু নয়, বালুর ভেতর থেকে বের হয়ে থাকা সেই কালো গ্রানাইট শিলাগুলি যা আমি জায়েদের সংগে তিন দিন আগে অতিক্রম করেছিলাম এবং দুদিন আগে একা আমি আবার অতিক্রম করেছি....

আমি বৃত্তাকারে ঘুরছি দুদিন ধরে।

চার

যখন জিন থেকে নামলাম তখন আমি একেবারেই ক্লান্ত, গায়ে জোর নেই একটু। এমনকি, উটের পা বাঁধার দিকেও আমার খেয়াল নেই। বলতে কি, জানোয়ারটিও এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে, পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও তার নেই। আমার কান্না পেলো কিন্তু আমার শুকনো ফোলা ফোলা চোখ থেকে আঁসু এলো না এক ফোঁটাও।

আমি যখন কেঁদেছি তারপর কতো সময় অতিক্রান্ত হলো!....কিন্তু যা-ই হোক, সব কিছুই কি দূর অতীতের ব্যাপার নয়? সব কিছুই অতীতের বস্তু এবং বর্তমান বলে কিছুই নেই! আছে কেবল তৃষ্ণা...আর গরম...আর যন্ত্রণা।

প্রায় তিন দিন হলো আমি পানি খাইনি। আর আমার উটটি শেষবার পানি খেয়েছে পাঁচ দিন আগে। এভাবেও হয়তো আরো একদিন, বড় জোর দু'দিন চলতে পারে। কিন্তু আমি জানি, আমি ততোক্ষণ আর চলতে পারবো না। হয়তো আমার মৃত্যুর আগে আমি পাগলই হয়ে যাবো, কারণ আমার গায়ের ব্যথার সাথে জড়িয়ে আছে আমার মনের ভয়; একটি থেকে জন্ম নেয় আরেকটি—জ্বালাময়, যন্ত্রণাপ্রদ-বিদারক!...

আমি চাই বিশ্রাম নিতে, আরাম করতে, কিন্তু সংগে সংগে আমি এ কথাও জানি যে, আমি যদি এখন আরাম করি আমি আর কখনো উঠে বসতে পারবো না। আমি নিজেকে কোন রকমে টেনে নিয়ে আবার জিনের উপর চড়ি, তারপর আঘাত করে লাথি মেরে উটটিকে দাঁড়াতে বাধ্য করি। আমি প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম জিনের উপর থেকে যখন উটটি পেছনের পা দুটির উপর দাঁড়াতে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে—এবং আবার যখন সে সামনের পা দুটি সোজা করতে গিয়ে হেলে পড়ে পেছনদিকে। আমরা চলতে শুরু করি ধীরে ধীরে যন্ত্রণার মধ্যে, পশ্চিমদিকে। পশ্চিমদিকেঃ কী তামাশা! কিন্তু আমি বাঁচতে চাই, আর এ জন্যই আমরা চলি, আগাতে থাকি।

আমাদের যেটুকু কুওৎ বাকি আছে তারি সাহায্যে সারা রাত থপ্থপ্ করে পা ফেলে চলি। আমি যখন জিন থেকে পড়ে যাই তখন নিশ্চয়ই ভোর হয়ে গেছে। আমি শক্ত কিছুর উপর পড়িনি; বালু খুবই মোলায়েম এবং আরামদায়ক; মনে হলো যেনো আদরে আলিংগন করছে আমাদের। কিছুক্ষণের জন্য উটটি নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, পয়লা হাঁটুর উপরে তারপর পেছনে পা' দুটির উপরে সে নিজের শরীরটাকে ছেড়ে দেয় এবং বালুর উপর গলা ছড়িয়ে দিয়ে আমার পাশে গুটিগুটি মেরে শুয়ে পড়ে।

আমিও শুয়ে পড়ি আমার উটের সংকীর্ণ ছায়ায়, বালুর উপর। আমার 'আবায়া' দিয়ে আমি নিজেকে মুড়ে দিই, আমার বাইরে মরুভূমির যে জ্বালা রয়েছে—এবং ভেতরে যে ব্যথা তৃষ্ণা এবং ভয় রয়েছে তা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য। আমার আর চিন্তা করার কোনো তাকৎ নেই। আমি আমার চোখ দুটি বন্ধ করতে পারছি না। চোখের পাতা একটু নড়লেই মনে হয় চোখের পুতুলের উপর যেনো উত্তপ্ত ধাতু নড়ছে। তৃষ্ণা এবং উত্তাপ...তৃষ্ণা এবং সর্বনেশে নীরবতা—উষ্ণ-শুষ্ক নীরবতা, যা আমাকে ঢেকে দেয় তার নির্জনতা ও নৈরাজ্যের কাফনে, আমার কানে রক্তের ধ্বনি এবং উটের ক্ষণিক দীর্ঘশ্বাসকে করে তোলে ভয়ংকর—যেন, পৃথিবীতে এগুলিই হচ্ছে শেষ ধ্বনি, আর আমরা দু'জন একটি মানুষ, একটি জানোয়ার—আমরা হচ্ছি পৃথিবীর বুকে হতভাগ্য শেষ জীবন্ত

প্রাণী—ধ্বংস যাদের অবধারিত!

আমাদের অনেক উপরে, তরল গরমের মধ্যে চক্কর খাচ্ছে একটি শকুন, একবারো না থেমে, আসমানের বিবর্ণ পটভূমিকায় একটি সূঁচের মাথা যেনো, উড়ছে মুক্তভাবে, সকল দিগন্তের উপর....

আমার গলা ফুলে গেছে—শুকিয়ে প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেছে কণ্ঠনালী, আর প্রত্যেকটি নিশ্বাস যেন হাজার সূঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে আমার জিবের গোড়ায়—সেই বড় সেই মহৎ আলজিব, যার নড়ার কথা নয়, অথচ যা যন্ত্রণায় আমার শুষ্ক মুখ-গহবরের মধ্যে শিরিষ কাগজের মতো সামনে-পেছনে নড়াচড়া না ক'রে একটুও থামতে পারছে না। আমার ভেতরের সবকিছুই জ্বলছে, সবকিছু পাকিয়ে রূপ নিয়েছে এক বিরামহীন যন্ত্রণায়। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ইস্পাত-সদৃশ আসমান উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আমার বিস্ফারিত চোখের সামনে।

আমার হাত যেন নিজে নিজেই প্রসারিত হয় এবং জিনের খিলের সংগে ঝুলানো ছোট বন্দুকটির কঠিন কোঁদার উপর গিয়ে লাগে। সংগে সংগে হাত থেমে যায় এবং আকস্মিক স্বচ্ছতায় আমার মন দেখতে পায়—কার্তুজের খোপে পাঁচটি তাজা কার্তুজ এবং ট্রিগারে একটু চাপ দিলেই ত্বরিত যা ঘটতে পারে তার স্বরূপ—কী যেন আমার ভেতরে, ফিসফিস করে বলে উঠলো ঃ শিগ্‌গীর করো, আবার তুমি চলতে অক্ষম হয়ে পড়ার আগেই বন্দুকটি হাতে নাও।

এবং সেই মুহূর্তে আমি অনুভব করলাম, আমার ঠোঁট নড়ছে এবং আমার মনের গহীন গুহা থেকে যেসব ধ্বনিহীন শব্দ আসছে সেগুলিকে আকার দিচ্ছেঃ 'আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো...নিশ্চয়ই পরীক্ষা করবো,' এবং ঝাপসা অস্পষ্ট শব্দগুলি ধীরে ধীরে আকার নেয়, হয়ে ওঠে কুরআনের একটি আয়াতের মতোঃ 'আমি অবশ্যি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো ভয় দিয়ে, ক্ষুধা দিয়ে, সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের স্বল্পতা দিয়ে; তুমি খোশ-খবর দাও তাদেরকে যারা ধৈর্যশীল এবং যখনি কোন মুসিবৎ আসে বলে ঃ আমরা আল্লাহ্‌রই এবং আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্‌রই দিকে।'

সবকিছুই তপ্ত এবং বিষণ্ন। এই জ্বালাময় বিষণ্নতার মধ্যে আমি বাতাসে একটি প্রাণ জুড়ানো নিশ্বাস অনুভব করি এবং তার মৃদু ঝিরঝির ধ্বনি শুনি, যেনো গাছপালার মধ্যে মর্মর ধ্বনি তুলে বাতাস বইছে—বইছে পানির উপর দিয়ে—এবং সেই পানি হচ্ছে সবুজ ঘাসে ঢাকা দু' পারের মধ্যে ধীরে ধীরে বয়ে চলা একটি ক্ষীণ স্রোত, আমার শিশুকালের বাড়ির কাছে। আমি শুয়ে আছি নদীর পারে—নয় কি দশ বছরের ছোট্ট বালক, একটা ঘাসের ডগা চিবাচ্ছি এবং তাকিয়ে আছি সাদা গরুগুলির দিকে—গরুগুলি ঘাস খাচ্ছে, নিকটেই, বৃহৎ মলিন চোখ মেলে তৃপ্তির সরলতা নিয়ে। দূরে কিষাণ রমণীরা মাঠে কাজ করছে। একজন পরেছে একটা লাল রুমাল এবং চওড়া লাল ডোরাকাটা নীল স্কার্ট। নদীর পারে দাঁড়িয়ে সারি সারি উইলো গাছ আর নদীর পানিতে ভেসে ভেসে চলেছে একটা সাদা হাঁস, পায়ের ধাক্কায় পানিকে ঝলসিয়ে দিয়ে। এবং মোলায়েম বাতাস ধ্বনি তুলে চলেছে আমার মুখের উপর, জানোয়ারের নিশ্বাসের ধ্বনির মতো। হ্যাঁ, তাই বটে—জানোয়ারেরই নিশ্বাস ফেলার আওয়াজ। বৃহৎ সাদা গাভীটি, যার পায়ে সাদার মধ্যে ছিটানো রয়েছে তামাটে রংয়ের ফোঁটা, আমার একেবারেই কাছে এসে পড়েছে এবং এখন নাক দিয়ে

জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে আমাকে ধাক্কা মারছে, আমার পাশেই আমি টের পাই গাভীটির পায়ের নড়াচড়া।

আমি আমার চোখ দুটি মেলি; শুনতে পাই আমার উটের হ্রেষাধ্বনি আর আমার পাশেই ওর পায়ের নড়াচড়া টের পাই; উটটি, তার পেছনের পা দুটির উপর অর্ধেক দাঁড়িয়েছে ঘাড় এবং মাথা উপর দিকে তুলে, ওর নাকের ছেদাগুলি স্ফুরিত— যেন সে দুপুরের বাতাসে হঠাৎ এবং শুভ সুগন্ধের আভাস পেয়েছে। ফের ও জোরে জোরে শব্দ করে নাক দিয়ে এক আমি টের পাই—ওর উত্তেজনা যেন তরংগের আকারে গলা বেয়ে নেমে কাঁধ হয়ে ওর অর্ধোত্থিত বিশাল দেহের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন মরু সফরের পর পানির গন্ধ পেলে উট এভাবেই নাক দিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নেয় এবং শব্দ করে—এ আমি আগেও দেখেছি। কিন্তু এখানে...এখানে তো পানি নেই।...আছে কি? আমি আমার মাথা সোজা করে, যে দিকে উটটি মুখ ফিরিয়েছে সেদিকে তাকাই দু'চোখ মেলে। উটটি মুখ ফিরিয়েছে আমাদের সবচেয়ে নিকটের বালিয়াড়িটির দিকে—আকাশের ইস্পাতসদৃশ শূন্যতার পটভূমিকায় একটা নিচু শীর্ষ— সেখানে কিছুই নড়ছে না বা কোনো শব্দও হচ্ছে না— কেবল শোনা গেলো একটা অস্ফুট ধ্বনি, পুরোনো এক বীণার তারের স্পন্দনের মতো, খুবই কোমল এবং ভংগুর, তীক্ষ্ম ঃ সে তীক্ষ্ম, উচ্চ ও ভংগুর ধ্বনি এক বেদুঈনের কণ্ঠের—যে উট হাঁকিয়ে গেয়ে চলেছে উটের পায়ের তালের সাথে ছন্দের মিল রেখে, বালু পাহাড়ের মাথার ঠিক ওপাশেই দূরত্বের বিচারে একবারেই নিকটে, কিন্তু মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে আমি জানতে পারি, আমার নাগালের অনেক দূরে সেই স্থান, আমার কণ্ঠস্বর ওখানে কিছুতেই পৌছুবে না। নিশ্চয়ই ওখানে মানুষ আছে, কিন্তু ওদের নিকট পৌছুবার তাকৎ মোটেই নেই আমার। এমনকি, আমি এতো দুর্বল যে, দাঁড়াবার ক্ষমতাও আমার নেই। আমি চেষ্টা করি চিৎকার করতে— কিন্তু আমার গলা থেকে কেবল একটি কর্কশ গোঙানি ছাড়া কিছু বার হলো না। তখন, নিজে নিজেই আমার হাত গিয়ে পড়ে জিনের সংগে ঝুলানো আমার ছোট্ট বন্দুকটির শক্ত কোঁদার উপর.....এবং আমি আমার মনের চোখ দিয়ে দেখতে পাই কার্তুজের খোপে পাঁচটি তাজা কার্তুজ!

একটা চূড়ান্ত চেষ্টার ফলে আমি জিনের খিল থেকে বন্দুকটি খুলতে পারলাম। বেল্ট থেকে বন্দুকে কার্তুজ পোরা— একটা পর্বতকে মাথার উপর তোলার মতো ভারি মনে হলো, তবু, শেষ পর্যন্ত তাতে সক্ষম হলাম। এরপর আমি বন্দুকটি কোঁদার উপর দাঁড় করিয়ে বন্দুকের নল সোজা আকাশের দিকে রেখে ট্রিগার টেনে দিই। বুলেটটি শন্ করে শূন্যতায় হারিয়ে গেলো অতি করুণভাবে, অতি ক্ষীণ একটি শব্দ করে। আবার বন্দুকের নল ভেঙে তাতে কার্তুজ পুরে ছুঁড়ি আর কান পেতে থাকি। বীণার সুরের মতো সেই গান থেমে গেছে। মুহূর্তের জন্য রইলো কেবল নীরবতা, আর কিছুই না। হঠাৎ বালিয়াড়ির মাথার উপরে দেখা দিলো একটি মানুষের মাথা, তারপর তার কাঁধ এবং সেই লোকটির পাশে আরেকটি মানুষ। তারা কিছুক্ষণের জন্য তাকালো নিচের দিকে, তারপর ঘুরে তাদের অদৃশ্য সাথীদের কী যেনো বলে চিৎকার করে উঠলো; এরপর ওরা হামাগুড়ি দিয়ে বালিয়াড়ির মাথায় চড়ে এবং অর্ধেক দৌড়ে, অর্ধেক ঢালু বেয়ে পিছলে নেমে ছুটে এলো আমার দিকে।

আমাকে ঘিরে প্রচন্ড উত্তেজনা, দু'তিনজন মানুষ—এই নিঃসংগ নির্জনতার পর কী বিশাল জনতা! ওরা আমাকে তোলার চেষ্টা করছে; ওদের ক্রিয়া-কলাপ, হাত আর পায়ের এলোপাতাড়ি নড়াচড়ার এক অতি বিভ্রান্তিকর দৃশ্য! আমি যেন জ্বলন্ত ঠান্ডা বরফ এবং আগুন অনুভব করি আমার ঠোঁটের উপর এবং দেখতে পাই এক দাঁড়িওয়ালা বেদুঈনের মুখ ঝুঁকে আছে আমার উপর, আর তার হাত এক ময়লা ভেজা তেনা ঠেলে দিচ্ছে আমার মুখের ভেতর। লোকটির আরেকটি হাত ধরে আছে একটি খোলা মশক। আমি আপনা আপনি হাত বাড়াই মশকটির দিকে, কিন্তু বেদুঈনটি আমার হাত ঠেলে দিলো পেছন-দিকে; তেনাটি পানিতে ডুবিয়ে আবার সে কয়েক ফোঁটা পানি সেই তেনা চিপে আমার ঠোঁটের মধ্যে দেয়; আর এই পানি যাতে আমার মুখে ঢুকে আমার গলা পুড়িয়ে না দেয় সেজন্য আমি দাঁতের সংগে দাঁত চেপে রাখি। কিন্তু বেদুঈন আমার দাঁত আলাদা না করে আমার মুখে আবার কয়েক ফোঁটা পানি দেয়। এ তো পানি নয়, যেন গলানো সীসা। ওরা আমার সাথে এরূপ ব্যবহার করছে কেন? আমি পালিয়ে বাঁচতে চাই এদের জুলুম থেকে। কিন্তু ওরা আমাকে ধরে রাখে। শয়তান সব! আমার চামড়া জ্বলছে; আমার সারা গায়ে আগুন লেগেছে। ওরা কি মেরে ফেলতে চায় আমাকে? হায় যদি কেবল বন্দুকটি ধরবার মতো শক্তি থাকতো আমার আত্মরক্ষার জন্য! কিন্তু ওরা আমাকে উঠতেও দিচ্ছে না; ওরা জোর করে আমাকে শুইয়ে রাখে জমিনের উপর এবং আবার আমাকে হা করিয়ে আমার মুখে কয়েক ফোঁটা পানি দেয়; এ পানি গেলা ছাড়া আমার আর উপায় রইলো না। আশ্চর্য! কিছুক্ষণ আগের মতো অতো তীব্রভাবে আর দহন করছে না এ পানি; মাথার উপরে ভেজা নেকড়াটা ভালোই লাগছে এবং ওরা যখন পানি ঢাললো গায়ের উপর, ভেজা কাপড়ের স্পর্শ নিয়ে এলো উল্লাসের এক শিহরণ...

এরপর সব কিছু কালো হয়ে আসে; আমি নামছি নামছি, এক গহীন কুয়ায়—এতো দ্রুত গতিতে নামছি যে, বাতাস আমার কানের পাশ দিয়ে ছুটে যায় হুহু করে, শোঁ-শোঁ করে, আর সেই শোঁ-শোঁ ধ্বনি রূপ নেয় গর্জনে—গর্জনমুখর কৃষ্ণতায়....কালো-কালো....

পাঁচ

কালো...কালো....নরম মোলায়েম কালো, যার কোনো শব্দ নেই—একটা মহৎ, সহৃদয় আঁধার, যা আমাকে আলিংগন করে গরম এক কম্বলের মতো এবং মনে জাগায় এই কামনা যে, আমি যেনো সবসময় এভাবেই থাকতে পারি, এমনি আশ্চর্য রকমে ক্লান্ত, নিদ্রালু আর আলসে। কোনো প্রয়োজন নেই আমার চোখ দুটি মেলার কিংবা আমার বাহু নাড়ানোরঃ তবু আমি আমার বাহু নাড়ি, আমার চোখ মেলি, কেবল আমার মাথার উপরে অন্ধকার দেখার জন্য—কালো ছাগ-পশম দিয়ে তৈরি বেদুঈনের তাঁবুর পশমী-আঁধার, যার সমুখ দিকে রয়েছে একটুখানি সংকীর্ণ খোলা জায়গা, যার ফাঁক দিয়ে আমি দেখতে পাই তারা ঝিলমিল রাতের আসমানের একটি টুকরা এবং তারার আলোর নিচে একটি ঝলমলো বালিয়াড়ির এক মোলায়েম বাঁক।...তারপর—তারপর তাঁবুর সেই ফাঁকটুকু আঁধার হয়ে

ওঠে এবং একটি মানুষের মূর্তি এসে দাঁড়ায় সেই ফাঁকটুকুর মধ্যে—তার ঝুলন্ত জোব্বার নক্‌শা যেন আকাশের গায়ে খোদাই করা এবং আমি শুনতে পাই জায়েদের চিৎকার—'জেগে আছেন, 'উনি জেগে আছেন'! এরপর তার কঠোর সংযত মুখখানা ঝুঁকে পড়ে প্রায় আমার মুখের উপর; জায়েদ তার হাত দিয়ে ধরে আমার কাঁধে। আরেকজন মানুষ ঢোকে তাঁবুর ভেতর। আমি তাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু সে যখন আস্তে তারিক্কি গলায় কথা বলতে শুরু করলো আমি সংগে সংগে বুঝতে পারি, সে শাম্মার কবিলার বেদুঈন।

আবার আমি অনুভব করি এক তপ্ত সর্বনেশে পিয়াস এবং জায়েদ আমার দিকে দুধের যে বাটি আগিয়ে ধরেছে তা চেপে ধরি সজোরে। কিন্তু আমি যখন তা গিললাম তখন আর কোনো যন্ত্রণা রইলো না। আমি সেই দুধ খাচ্ছি যখন জায়েদ বর্ণনা করে চলে—কীভাবে এই ছোট্ট বেদুঈন দলটি বালু-ঝড় শুরু হলে তার কাছেই তাঁবু খাটাতে এলো, তারপর যখন হারানো উটটি রাতের বেলা নিজে নিজে ফিরে এলো তখন তারা কেমন চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো এবং কী করে সকলে জোট বেঁধে বের হয়েছিলো আমাকে খুঁজতে, কীভাবে প্রায় তিন দিন পরে যখন তারা সব আশাই একরকম ছেড়ে দিয়েছিলো, তখন ওরা বালিয়াড়ির আড়াল থেকে শুনেছিলো আমার বন্দুকের আওয়াজ...

এরপর, ওরা আমার উপর খাটিয়ে দিলো একটি তাঁবু আর আমাকে হুকুম করা হলো, আমি যেনো আজ রাত এবং আগামীকাল এই তাঁবুর ভেতরে পড়ে থাকি। আমাদের বেদুঈন বন্ধুদের কোনো তাড়াহুড়া নেই; তাদের মশকগুলি পানিতে ভর্তি, এমনকি তারা পুরা তিন বালতি পানি দিলো আমার উটটিকে, কারণ, ওরা জানে, দক্ষিণদিকে একদিনের পথ গেলেই, ওরা আর আমরা গিয়ে পৌঁছুবো একটি ওয়েসিসে—যেখানে রয়েছে একটি কুয়া। তার আগে এখানে উটগুলির জন্য আমাদের চারপাশে রয়েছে প্রচুর খাদ্য—'হাম্‌দ'-ঝোপ।

কিছুক্ষণ পর জায়েদ আমাকে তাঁবু থেকে বের করে, তারপর বালুর উপর একখানা কম্বল বিছিয়ে দেয়। আমি শুয়ে থাকি তারা-ভরা আসমানের নিচে।

কয়েক ঘণ্টা পর আমি জায়েদের কফি-পাত্রের টুংটাং শব্দে জেগে উঠি—টাটকা কফির গন্ধ যেনো রমণীর উষ্ণ আলিংগন!

—'জায়েদ!' আমি চিৎকার করে উঠি; বিস্ময়ের সাথে আমি লক্ষ্য করি, আমার গলার আওয়াজ যদিও এখনো ক্লান্ত তবু এখন আর তা কর্কশ নয়—'তুমি আমাকে কিছু কফি দেবে?'

—'আল্লাহর কসম চাচা, অবশ্যি দেবো', জায়েদ পুরোনো আরবী রসুম মুতাবিক জবাব দেয়, আরববাসী এভাবেই তাকে সম্বোধন করে যাকে সে দেখাতে চায় সম্মান, তা সে বক্তার চেয়ে বয়সে বড়োই হোক অথবা ছোটোই হোক, (যেমন আমাদের বেলায়—আমি জায়েদের চেয়ে কয়েক বছরের ছোটো)—আপনার দীল যতো চায় ততো কফি আপনি পাবেন।'

আমি কফি খাই আর জায়েদের প্রসন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসি—'আচ্ছা ভায়া, বুদ্ধিমান লোকের মতো ঘরে না থেকে আমরা এরূপ বিপদের মুখে নিজেদের ঠেলে দিচ্ছি কেন বলো তো?'

—'কারণ, জায়েদ এবার আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসে, 'আপনার আর আমার মতো লোকের পক্ষে যতো দিন না হাত পা কঠিন হয়ে উঠেছে আর আমরা যয়ীফ

হয়ে পড়েছি ততোদিন ঘরে বসে থাকা সম্ভব নয়! তাছাড়া মানুষ কি নিজেদের ঘরে থেকে মরে না? মানুষ কি তার অদৃষ্টকে ঘাড়ে করে নিয়ে চলে না—থাকুক না সে যেখানেই?'

জায়েদ 'অদৃষ্ট' অর্থে ব্যবহার করে 'কিসমা' শব্দটি—'কিসম' মানে 'যা ভাগ্যে নির্ধারিত হয়েছে।' এই শব্দটির তুর্কী রূপ 'কিসমত্' প্রতীচ্যে সুপরিচিত। আরেক পেয়ালা কফি পান করতে করতে আমার মনে হলো, এই আরবী শব্দটির একটি গভীরতরো অর্থও আছে—'যাতে মানুষের অংশ আছে তাই-তো কিস্‌মত্।'

'যাতে অংশ আছে মানুষের, তা-ই...'

শব্দগুলি আমার স্মৃতিতে একটা ক্ষীণ বিলীয়মান ধ্বনি জাগায়, সংগে সংগে আমার সামনে ভেসে ওঠে একটি ক্লিষ্ট হাসির দৃশ্য...কার হাসি? এক ঝাঁক ধোঁয়া, উৎকট ধোঁয়া, যেন হাশিশের ধোঁয়া, আর তারি আড়ালে একটা ক্লিষ্ট হাসি, হ্যাঁ, এ ছিলো হাশিশেরই ধোঁয়া, আর হাসিটি ছিলো, আজতক আমি যতো মানুষের সাথে মিশেছি, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিচিত্র ব্যক্তিটির হাসি। আমার জীবনের বিচিত্র এক অভিজ্ঞতার পর ওর সাথে আমার মুলাকাত হয়েছিলো! এক বিপদ...যা মনে হয়েছিলো...হ্যাঁ, কেবলি মনে হয়েছিলো আসন্ন, সে বিপদ থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য আমি না জেনেই ধেয়ে চলেছিলাম আরেক বিপদের দিকে, আর সে বিপদ—আমি যা এড়াবার চেষ্টা করেছিলাম, তার চেয়ে ছিলো অনেক বেশি বাস্তব, অনেক বেশি আসন্ন...এই অবাস্তব ও বাস্তব বিপদ-এ দু'য়ে মিলে আমাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলো এক নতুনতরো মুক্তির দিকে।

ব্যাপারটি ঘটেছিলো আট বছর আগে। আমি যাচ্ছিলাম ঘোড়ায় চড়ে আমার তাতার নওকর ইবরাহীমকে সাথে নিয়ে, শিরাজ থেকে দক্ষিণ ইরানে নাইরিস হ্রদের কাছে, একটি পড়ো, পাতলা বসতি, পথ-ঘাটহীন এলাকা কিরমানের দিকে। তখন শীতকাল—আর এই শীতকালে এলাকাটি হয়ে পড়েছিলো প্যাঁচ-প্যাঁচে কর্দমাক্ত একটি স্তেপ বিশেষ; আশেপাশে কোনো গাঁও-গেরাম নেই, দক্ষিণদিকে, কুহ-ই-গুশ্‌নেগান অর্থাৎ 'ভুখাদের পাহাড়' কর্তৃক ঘেরা সেই স্থানটি; উত্তরদিকে এলাকাটি গিয়ে মিশে গেছে একটা জলাভূমির সাথে, আর সেই জলাভূমি গিয়ে স্পর্শ করেছে হ্রদটির কিনার। বিকালে আমরা যখন একটি আলগোছে পাহাড়ের চারদিকে ঘুরছিলাম, হঠাৎ আমাদের নজরে পড়লো হ্রদটি—একটি নিস্তব্ধ সবুজ সমতল, যেখানে নেই কোনো আলোড়ন, শব্দ অথবা জীবন, কারণ এর পানি এতো নোনা যে, এতে কোনো মাছই বাঁচতে পারে না। গুটি কয়েক পংগু গাছপালা আর কিছু মরু-তৃণ ছাড়া হ্রদটির তীরের নোনা মৃত্তিকায় কোন উদ্ভিদই জন্মায় না। ভূমিটি কাদা মেশানো তুষারের পাতলা আস্তরণে ঢাকা এবং তার উজান দিকে তীর থেকে প্রায় দু'শো গজ দূরে চলে গেছে একটি সরু ক্ষীণ পথ।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে; আমাদের আজকের রাতের মঞ্জিল খানই-ই-খেত্ সরাইখানার কোন নিশানাই মিললো না এখনো। কিন্তু যে-কোনো মূল্যেই হোক আমাদের পৌঁছুতেই হবে ওখানে। দূরে—বহুদূর তক আর কোনো বসতি নেই এবং জলাভূমিটি কাছে হওয়ায়, অন্ধকারে আমাদের আগানো খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আসলে সকালেই আমাদেরকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছিলো ওখানে একাকী না আগাতে, কারণ একটিমাত্র ভুল পদক্ষেপের ফলেই ঘটতে পারে সহজ এবং আকস্মিক মৃত্যু। তাছাড়া, ভেজা প্যাঁচ-প্যাঁচে

জমির উপর দিয়ে দীর্ঘ একটা দিন চলার পর আমাদের ঘোড়াগুলি হয়ে পড়েছিলো খুবই ক্লান্ত—ওদের জন্যও এখন দরকার বিশ্রাম এবং খাবার।

রাত আসার সাথে সাথে শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। আমরা চলছি ভিজতে ভিজতে, বিষণ্নচিত্তে এবং নীরবে—আমাদের নিজেদের বেফায়দা চোখের চাইতে ঘোড়ার সহজাত অনুভূতির উপরই আমরা নির্ভর করছি বেশি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়....কিন্তু কোথায় সেই সরাইখানা? কোন নিশানাই নেই! হয়তো আমরা অন্ধকারে ঠাহর করতে না পেরে সরাইখানাটিকে পেছনে ফেলে এসেছি; ফলে আজ হয়তো আমাদেরকে রাত কাটাতে হবে খোলা জায়গায়—বর্ষণের নীচে, যে বর্ষণ ক্রমেই তীব্র ও জোরদার হয়ে উঠছে! আমাদের ঘোড়ার খুর পানিতে আঘাত হেনে ছিটাতে থাকে পানি, আমাদের ভেজা কাপড়গুলি ভারি বোঝার মত লেপ্টে থাকে আমাদের গায়ের সাথে। উচ্ছ্বসিত পানির পর্দার আবরণে কালো এবং নিশ্ছিদ্র রাত ঝুলে আছে আমাদের চারপাশে। আমাদের হাড্ডি পর্যন্ত শীতে ঠক্ ঠক্ করছে—কিন্তু জলাভূমিটি যে আমাদের নিকটেই রয়েছে এ জ্ঞান আমাদেরকে আরো বেশি শংকিত করে তুললো। ঘোড়াগুলি যদি একটিবারের মতো কঠিন মৃত্তিকার উপর পা ফেলতে ভুল করে তাহলে আল্লাহ্ যেন আমাদের উপর রহম করেন!—সকালবেলা হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছিলো আমাদেরকে।

আমি চলছি আগে, আর ইবরাহীম আমার পেছনে, সম্ভবত দশ পা তফাতে। বারবার মনে হানা দিতে থাকে সেই ভয়ংকর জিজ্ঞাসা—আমরা কি অন্ধকারে খান-ই-খেত পেছনে ফেলে এসেছি? ঠাণ্ডা বিষ্টির নিচে রাত কাটানো—কী যে অশুভ সম্ভাবনা! কিন্তু আমরা যদি অনেক দূর গিয়েই থাকি তাহলে জলাভূমিটি গেলো কোথায়?

হঠাৎ আমি শুনতে পাই একটি নরম মোলায়েম চপ্‌চপ্ শব্দ, আমার ঘোড়ার খুরের নিচে। আমি টের পেলাম জানোয়ারটি কাদার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে—কিছুটা ডুবে গেছে, তারপর মরিয়া হয়ে একটা পা তুলছে এবং আবার ডুবে যাচ্ছে। সহসা এই চিন্তা আমার মনকে বিদীর্ণ করে দেয়—আমরা কি তাহলে জলাভূমিতে পা দিয়েছি? আমি সজোরে লাগাম টেনে ধরি এবং ঘোড়ার দু'পাশে দু'পা দিয়ে সজোরে লাথি মারতে থাকি। ঘোড়াটি তার মাথা উপর দিকে তুলে ভীষণভাবে দাপাদাপি শুরু করে। আমার চামড়া ফেটে নির্গত হতে লাগলো ঠাণ্ডা ঘাম। রাতটা এতো কালো যে, আমি আমার নিজের হাত দুটি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না; কিন্তু নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে ঘোড়াটির শরীর যেভাবে স্ফীত হচ্ছে, তাতে টের পেলাম, কাদার আলিংগন থেকে বাঁচার জন্য কী মরিয়া হয়েই না ও চেষ্টা করছে। প্রায় কোনো রকম ভাবনা-চিন্তা না করেই আমি হাতে নিই ঘোড়ার চাবুকটি যা ব্যবহার না করে সাধারণত ঝুলানো থাকে আমার হাতের কব্জিতে এবং আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই চাবুক দ্বারা আঘাত করি ঘোড়াটির পাছার উপর; উদ্দেশ্য—এভাবে যদি ঘোড়াটিকে তার শেষ শক্তিটুকু খাটানোর জন্য উত্তেজিত করা যায়, কারণ ঘোড়াটি যদি এই মুহূর্তে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে সে দেবে যাবে এবং তার সাথে আমিও ডুবে যাবো এ কাদার মধ্যে, গভীর হতে গভীরে। এ ধরনের মার খেতে অনভ্যস্ত হতভাগা জানোয়ারটি—অসাধারণ গতি ও শক্তির অধিকারী কাশগাই টাট্টু—পেছনের দু'পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেলো—তারপর চারটি পায়ে আবার আঘাত করতে লাগলো জমিনের উপর; কাদা

থেকে বাঁচার জন্য ঘন ঘন দম ফেলতে ফেলতে মরিয়া হয়ে সে চেষ্টা করে, লাফ দেয়, পিছলে পড়ে যায়, আবার নিজেকে নিক্ষেপ করে সম্মুখদিকে, আবার পিছলে পড়ে যায়— এবং বিরতি না দিয়ে নরম কাদামাটির উপর বারবার পড়তে থাকে ঘোড়াটির খুরের আঘাত।

আমার মাথার উপর দিয়ে একটি রহস্যময় বস্তু বয়ে যায় শোঁ শোঁ আওয়াজ ক'রে, আমি আমার মাথা তুলি সংগে সংগে, আর আমার উপর এসে পড়ে একটা কঠিন ধারণা— বহির্ভূত আঘাত, কিন্তু কোথেকে? সময় এবং চিন্তা একে অপরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর তালগোল পাকিয়ে যায়।

মুহূর্তের জন্য মনে হলো, ঘণ্টার পর ঘণ্টার মতোই দীর্ঘ, বৃষ্টির ছাট আর ঘোড়ার হাফানির ফাঁকে ফাঁকে আমি শুনতে পাচ্ছি সেই জলাটি চুষে চুষে পান করছে সেই ধ্বনি। আমাদের অন্তিম মুহূর্ত নিশ্চয়ই আসন্ন। রেকাব থেকে আমি আমার পা দুটি শিথিল করে দিলাম, তারপর তৈরি হলাম জিনের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে একা আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে...হয়তো কাদার উপর চিৎ হয়ে পড়ে থাকলে আমি নিজেকে বাঁচাতেও পারি— আমার মনের অবস্থা যখন এই, হঠাৎ অবিশ্বাস্য রকমে আমার ঘোড়াটি খুব শক্ত কঠিন মাটির উপর আঘাত হানলো সজোরে একবার...দুবার...এবং আমি, মুক্তির উল্লাসে ফুপিয়ে উঠে লাগাম টেনে ধরলাম আর কাঁপতে থাকা জানোয়ারটিকে থামিয়ে দিলাম। আমরা বেঁচে গেলাম।

এই মুহূর্তে হঠাৎ আমার মনে পড়লো সংগীর কথা, আর আমি ভয়ে বিহ্বল হয়ে চিৎকার করে উঠলাম...'ইবরাহীম!' কিন্তু কোনো জবাব নেই। আমার হৃদ্পিণ্ড জমে গেলো।

'ইবরাহীম!' কিন্তু আমাকে ঘিরে রয়েছে কেবল এক আঁধার রাত আর বর্ষণ। ও কি তাহলে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি? কর্কশ স্বরে আমি আবার চিৎকার করে ডাকি 'ইবরাহীম।'

এবং তখন প্রায় অবিশ্বাস্য রকমে, অনেক দূর থেকে অস্পষ্ট ভেসে এলো একটা চিৎকারের আওয়াজ 'এই যে...আমি এখানে।'

এখন আমার বুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পালা! আমরা এতো বিপুল ব্যবধানে একজন আরেকজন থেকে আলাদা হয়ে পড়লাম কী করে?

—'ইবরাহীম!'

—'এই যে....এই যে',—

এবং আমি ঐ শব্দ অনুসরণ করে ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে টানতে টানতে, প্রতিটি ইঞ্চি মাটি পা দ্বারা পরখ করে খুব ধীরে ধীরে অত্যন্ত সতর্কতার সংগে দূরবর্তী সেই কণ্ঠস্বরের দিকে হাঁটতে থাকি ঃ ইবরাহীম...ইবরাহীম শান্তভাবে বসে আছে ঘোড়ার জিনের উপর।

—'তোমার কি হয়েছিলো ইবরাহীম? তুমিও কি ভুল করে জলাভূমিতে গিয়ে পড়েছিলে?'

—'জলাভূমি? না তো। কেন জানি না আপনি হঠাৎ যখন ঘোড়া হাঁকিয়ে গায়েব হয়ে গেলেন আমি তখন নড়ন-চড়ন নাস্তি, একটুও নড়লাম না, যেখানে ছিলাম সেখানেই থেমে

গেলাম।'

— ঘোড়া হাঁকিয়ে গায়েব হয়ে গেলেন!' এতোক্ষণে সমাধান হলো রহস্যের! জলাভূমির হাত থেকে বাঁচার এই চেষ্টা তাহলে আমার কল্পনারই পরিণতি। নিশ্চয়ই আমার ঘোড়াটি এসে পড়েছিলো একটি কর্দমাক্ত রাস্তায় এবং আমার মনে হয়েছিলো, আমি আর আমার ঘোড়া তলিয়ে যাচ্ছি জলাভূমিতে আর তাই ঘোড়াটিকে চাবুক মেরে হাঁকিয়েছিলাম পাগলের মতো! আঁধারের দ্বারা প্রতারিত হয়ে আমি ঘোড়াটির অগ্রগতিকে, তার সম্মুখে ছুটে চলাকে জলাভূমির কবল থেকে বাঁচার প্রাণান্ত চেষ্টা বলে ভুল করেছিলাম এবং রাতভর ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছিলাম, জানতাম না যে, মাঠের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে বহু গ্রন্থিল গাছপালা। জলাভূমি নয়, এই গাছগুলিই ছিলো আসন্ন এবং প্রকৃত বিপদ : যে শাখাটি আঘাত করেছিলো আমার হাতে, তা ছোট না হয়ে হতে পারতো আরো বড় একটি শাখা, যা গুঁড়িয়ে দিতে পারতো আমার খুলি এবং এভাবেই দক্ষিণ—ইরানের একটি চিহ্নিত কবরে চূড়ান্ত অবসান ঘটতো আমার সফরের।

আমি ক্ষেপে গেলাম নিজের বিরুদ্ধে— ক্ষেপে গেলাম এ কারণেও যে, আমরা সব দিশা হারিয়ে ফেলেছি এবং রাস্তার কোনো নিশানাই আর খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। আমরা আর সরাইখানা ফিরে পাবো না।

কিন্তু আমি আবার ভুল করে বসি।

ইবরাহীম ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়লো হাত দিয়ে জমিনের অবস্থা অনুভব করবার জন্য এবং হয়তো এভাবেই নতুন করে পথ খুঁজে বের করার জন্য। এভাবে যখন সে হামাগুড়ি দিচ্ছে হঠাৎ তার মাথা গিয়ে ঠেকলো এক দেয়ালে—খান-ই-খেত সরাইখানার কালো প্রাচীরে!

জলাভূমিতে ঢুকে পড়ার কাল্পনিক ভুলটি যদি আমি না করতাম আমরা হয়তো আগাতেই থাকতাম, হয়তো সরাইখানাটিকে পেছনে ফেলে চলে যেতাম অনেক দূরে, তারপর হয়তো সত্যি সত্যি আমরা হারিয়ে যেতাম সেই জলাভূমিতে, কারণ, পরে আমরা জানতে পেরেছিলাম, দু'শ গজেরও কম সামনে থেকেই সেই জলাটি শুরু হয়েছে।

মহান শাহ আব্বাসের আমলের বহু ধ্বংসাবশেষের একটি হচ্ছে এই সরাইখানাটি। সারি সারি মজবুত ইমারতের খিলানের নিচ দিয়ে রয়েছে আসা-যাওয়ার পথ, হা-করা দরজা এবং ভেঙে-পড়া উনান। এখানে-ওখানে লিন্টেলের এবং ফাটল-ধরা মেজলিকা টালির উপর আমি দেখতে পেলাম পুরানো খোদাই-এর কিছু চিহ্ন। বাসের অযোগ্য কোঠা ক'টিতে ছড়ানো রয়েছে পুরানো খড়কুটা আর ঘোড়ার লাদ। আমি আর ইবরাহীম প্রধান 'হল' কামরায় ঢুকে দেখতে পেলাম সরাইখানার ওভারশিয়র খালি মেঝেয় খোলা আগুনের পাশে বসে আছে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটি মানুষ, খালি পা, আকারে বামন এবং পরনে ছেঁড়া কাপড়। আমরা ঢোকার সাথে সাথে দুজনেই দাঁড়িয়ে গেলো। বামনাকৃতি লোকটি গম্ভীরভাবে, নিখুঁত, প্রায় নাটকীয় ভংগিতে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানালো ডান হাতটি বুকের উপর রেখে। তার গায়ের জামাটিতে অসংখ্য তালি, নানা রঙের; লোকটি নোংরা, একেবারেই অগোছালো, এলোমেলো, কিন্তু তার চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে এবং মুখটি শান্ত স্নিগ্ধ।

আমাদের ঘোড়া ক'টির তদারক করার জন্য ওভারশিয়র কোঠা থেকে বের হয়ে গেলো একবার। আমি আমার ভেজা জামা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম আর ইবরাহীম দেরী না করে সেই খোলা আগুনের উপর চায়ের পানি বসিয়ে দিলো। যে মহৎ সামন্ত প্রভু.তার চাইতে যারা হীন তাদের প্রতি ভদ্র হয়েও নিজের ইজ্জত হারায় না, তারি ভংগিতে সুন্দরভাবে সেই বামনটি ইবরাহীম কর্তৃক তার দিকে তুলে ধরা চয়ের পেয়ালাটি গ্রহণ করে।

বিন্দু মাত্র অস্বাভাবিক ঔৎসুক্য না দেখিয়ে, যেন একটি বৈঠকী আলাপ শুরু করার জন্যই সে তাকালো আমার দিকে—'জনাব-ই আলী, আপনি কি ইংরেজ?'

—'না, আমি নামসাভী (অস্ট্রীয়)'

— 'আমি যদি জিগ্‌গাস করি, আপনি কি তেজারতির উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন তা কি অশোভন হবে?'

— 'আমি খবরের কাগজের লেখক, 'আমি জবাব দিই, 'আমি তোমাদের দেশে সফর করছি—আমার কওমের নিকটে তোমার দেশের পরিচয় জানাবার জন্য। আমার কওম অন্যেরা কীভাবে জীবন-যাপন করে তা জানতে ভালোবাসে।'

সম্মতিসূচক স্মিত হাসির সাথে সে মাথা নাড়ে, তারপর চুপ করে যায়। কিছুক্ষণ পর সে তার জামার ভাঁজ থেকে বের করলো একটি মাটির হুঁকা, আর একটি বাঁশের দণ্ড; বাঁশের দণ্ডটি সে মাটির পাত্রটির সাথে লাগিয়ে দেয়; তারপর সে তার দুই হাতের চেটোয়, দেখতে তামাকের মতোই কী একটা জিনিস ডলতে থাকে; পরে যত্নের সাথে, যেনো সোনার চাইতেও দামী সেই জিনিসটি ছিলিমের মধ্যে রেখে ঢেকে দেয় জ্বলন্ত অংগার দিয়ে। বাঁশের নলটি মুখে পুরে অনেকটা জোরে জোরেই সে ধোঁয়া টানতে লাগলো এবং ধোঁয়া টানতে টানতেই প্রচণ্ডভাবে কেশে উঠলো এবং এভাবে তার গলা পরিষ্কার করে নিলো। মাটির হুঁকার ভেতর পানি বগ্‌বগ্ করতে থাকে এবং একটা উৎকট গন্ধে ধীরে ধীরে কোঠাটি ছেয়ে যায়। এখন আমি বুঝতে পারলাম—এ হচ্ছে ভারতীয় গাঁজা 'হাশিশ'। এতোক্ষণে তার অদ্ভুত আদব-কায়দা ও ভাবভংগির অর্থ পরিষ্কার হলো ঃ ও একজন 'হাশ্‌শাশী', গাঁজাখোর! আফিমখোরদের মতো তার চোখ দুটি ঢাকা নয়, এক ধরনের অনাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক গভীরতায় তার চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে—বহু দূরে তার নজর, তার আশেপাশে বাস্তব দুনিয়া থেকে এতো দূরে যে, তা অপরিমেয়।

আমি চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। ও ধূমপান শেষ করে আমাকে জিগ্‌গাস করে— 'আপনি কি একটু চেষ্টা করে দেখবেন?'

আমি ধন্যবাদের সাথে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিই। জীবনে দু'একবার আফিম চেষ্টা করে দেখেছি, (অবশ্যি তাতে কোনো আনন্দ পাইনি; কিন্তু এই হাশিশ পানের চেষ্টাও আমার কাছে খুবই কষ্টসাধ্য, এমনকি অরুচিকর মনে হয়। 'হাশ্‌শাশী' নিঃশব্দে হাসে—এক বন্ধুত্বপূর্ণ শ্লেষের সাথে তার তীর্যক চোখের নজর আমার উপর বুলিয়ে নেয়ঃ

— 'আমি জানি, মাননীয় দোস্ত, আপনি কী ভাবছেন। আপনি ভাবছেন—হাশিশ খাওয়া হচ্ছে শয়তানের কাজ এবং আপনি একে ভয় করছেন। এক্কেবারে বাজে কথা। হাশিশ হচ্ছে আল্লাহ্‌র একটি দান—রহমত। অতি উত্তম...বিশেষ করে মনের জন্য। হযরত, লক্ষ্য করুন, আমি বুঝিয়ে বলছি আপনাকে। আফিম খারাপ—এতে কোনো

সন্দেহই নেই, কারণ আফিম মানুষের মনে জাগায় এমন জিনিসের কামনা যা পাওয়া যাবে না। আফিম মানুষের স্বপ্নগুলিকে করে তোলে লোভী, জন্তু-জানোয়ারের কামনার মতোই। কিন্তু হাশিশ সব লোককে শান্ত করে দেয় এবং দুনিয়ার সব কিছুর প্রতি মানুষকে করে তোলে উদাসীন। হ্যাঁ তাই। হাশিশ মানুষকে দেয় তুষ্টি। একজন 'হাশশাশী'র সামনে আপনি রেখে দিতে পারেন এক মণ সোনা সে যখন হাশিশ্ পান করছে কেবল সেই সময় নয়, যে কোনো সময়ে—হাশ্শাশী তার একটি আঙুলও সে সোনার দিকে বাড়াবে না। আফিম মানুষকে দুর্বল ও কাপুরুষ করে তোলে, কিন্তু হাশিশ...হাশিশ সব ভয় দূর করে দেয় এবং মানুষকে করে তোলে সিংহের মতোই সাহসী। আপনি যদি শীতকালের মাঝামাঝি বরফের স্রোতে ডুব দিতে বলেন 'হাশশাশী'কে, সে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়বে সেই স্রোতে আর হাসবে...কারণ সে জেনেছে, যার লোভ নেই তার ভয় নেই—এবং মানুষ যদি ভয়কে জয় করতে পারে, সে বিপদকেও জয় করে, কারণ—সে জানে, তার জীবনে যা কিছুই ঘটেছে তা তারই অংশ, সৃষ্টিতে যা কিছু ঘটে চলেছে সে সবের মধ্যে...'

আবার ও হাসে, সেই সংক্ষিপ্ত ঢেউ তোলা নিঃশব্দ হাসি, যাঁকে বিদ্রূপ বলা যায় না; সদাসয়তাও বলা যায় না—দুয়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থা। এরপর তার হাসি থেমে যায়, কুণ্ডলী পাকানো ধূঁয়ার আড়ালে কেবল তার দাঁতগুলি বিকশিত হয় এবং তার উজ্জ্বল দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এক স্থির অনড় দূরত্বের প্রতি।

'যা কিছু ঘটে চলেছে তাতে আমার অংশ...' বন্ধুত্বপূর্ণ, আরবীয় আকাশের তারকাপুঞ্জের নিচে শুয়ে শুয়ে আমি মনে মনে ভাবি—আমি...হাড়্ডি ও গোশতের, সংবেদন ও উপলব্ধির এই বাণ্ডিল—আমাকে রাখা হয়েছে বিশ্বনিয়ন্তার কক্ষে এবং যা কিছু ঘটে চলেছে আমি আছি তারি মধ্যে। 'বিপদ', এ তো একটা অলীক কল্পনা মাত্র—এ আমাকে কখনো 'পরাভূত' করতে পারে না—কারণ, আমার জীবনে যা কিছু ঘটছে তা তো সর্বত্রগামী সেই স্রোতেরই একটা অংশ—আমি নিজেই যে স্রোতের অংশ। এ-ও হতে পারে যে, এই বিপদ ও নিরাপত্তা, মৃত্যু ও আনন্দ, নিয়তি ও পূর্ণতা, সবকিছুই এই যে ক্ষুদ্র অথচ মর্যাদাবান একটি বাণ্ডিল, 'আমি', তারই বিভিন্ন দিক মাত্র। কী অনন্ত মুক্তি, হে আল্লাহ, তুমি দান করেছো মানুষকে!'

এই চিন্তার আনন্দের বেদনা এতো তীব্র এবং তীক্ষ্ণ যে, আমি আমার চোখ বুঁজতে বাধ্য হই এবং আমার মুখের উপর দিয়ে যে ঝিরঝির হাওয়া বয়ে যাচ্ছে তা-ই যেনো দূর থেকে মুক্তির পাখনারূপে নীরবে আমার উপর পরশ বুলিয়ে দেয়।

ছয়

এতোক্ষণে উঠে বসার মতো যথেষ্ট শক্তি আমি অনুভব করছি। আমি যাতে হেলান দিয়ে বসতে পারি সেজন্য জায়েদ আমাদের উটের জিনের একটি নিয়ে আমার কাছে এলো।

—চাচা, আপনি আরাম করুন; আপনাকে মৃত মনে করে আপনার জন্য মাতম করেছি, আজ আপনাকে বহাল তবিয়তে পেয়ে আমি কতো যে আনন্দিত হয়েছি!'

—'তোমাকে সবসময় এক পরম বন্ধুরূপে পেয়েছি জায়েদ! তুমি যদি আমার ডাক শুনে আমার কাছে ছুটে না আসতে, তোমাকে ছাড়া বছরগুলি আমি কীভাবে চলতাম, বলো তো?'

—"চাচা, আমি যে আপনার সাথে এই বছরগুলি কাটিয়েছি—তার জন্য কখনো অনুশোচনা হয়নি। আমার এখনো সেই দিনটির কথা মনে আছে যেদিন আমি আপনার চিঠি পেয়েছিলাম পাঁচ বছরেরো আগে। সেই চিঠিতে আপনি আমাকে মক্কায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আপনার সাথে আবার দেখা হবে এই চিন্তাটাই ছিলো আমার নিকট প্রিয়। তার বিশেষ কারণও ছিল—আপনি এরই মধ্যে ইসলামের আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়েছিলেন। ঠিক সেই সময়ই আমি শাদি করেছিলাম এক কুমারী মুন্তাফিক বালিকাকে; তার ভালোবাসায় আমার আনন্দের অবধি ছিলো না। ঐসব ইরাকী বালিকার কোমর খুবই চিকন, আর স্তন মজবুত, কঠিন, ঠিক এরি মতো—অতীতের দৃশ্য স্মরণ করে মৃদু হেসে সে তার তর্জনী চেপে ধরে আমি যে জিনের উপর হেলান দিয়ে আছি তারি শক্ত অগ্রভাগের উপর—'এবং এদের আলিংগন থেকে মুক্ত হওয়া খুবই কঠিন।' তাই আমি মনে মনে বললাম, 'আমি যাবো তবে ঠিক এক্ষুণি নয়। কয়েক হপ্তা অপেক্ষা করতে হবে আমাকে।' কিন্তু হপ্তার পর হপ্তা গড়িয়ে যায়...গড়িয়ে যায় মাসের পর মাস এবং যদিও আমি কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই স্ত্রীলোকটিকে—সেই কুত্তীর বাচ্চাকে তালাক দিয়েছিলাম—ও কি না ওর চাচাতো ভাইয়ের দিকে তাকাচ্ছিলো আশনাই-এর দৃষ্টিতে, তবু আমি ইরাকী 'আগায়েলে' আমার নোকরি ছাড়তে পারছিলাম না, ছাড়তে পারলাম না আমার দোস্ত-ইয়ারদেরকে, বাগদাদ ও বসরার আনন্দ-উল্লাসকে এবং সবসময়ই নিজেকে বলে চলেছিলাম একটি কথা—ঠিক এখুনি নয়, আরো কিছু পরে।' কিন্তু একদিন যখন আমি আমাদের তাঁবু থেকে আমার মাইনের টাকা নিয়ে চলেছিলাম উটে চড়ে এবং ভাবছিলাম, রাতটা আমার কোন দোস্তের বাড়িতে কাটাবো, হঠাৎ তখন মনে পড়লো আপনার কথা, মনে পড়লো, আপনার চিঠিতে আপনার প্রিয় সহধর্মিণী—আপনার রফিকার ইন্তিকাল সম্বন্ধে আপনি লিখেছিলেন—আল্লাহ্ তাঁর উপর সদয় হোন এবং আমি ভাবলাম, তাঁকে হারিয়ে কতো নিঃসংগ বোধ করছেন আপনি এবং সংগে সংগে আমি বুঝতে পারলাম, আমার আর অপেক্ষা করা চলে না—আমাকে ছুটে যেতে হবে আপনার কাছে সেখানেই এবং তক্ষুণি, আমি আমার ইরাকী 'ইগাল' থেকে তারকাটি ছিড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম; তারপর আমি আমার কাপড়-চোপড়গুলি নেবার জন্য ঘরে পর্যন্ত গেলাম না। আমার উটের রোখ আমি ফিরিয়ে দিলাম নুফুদের দিকে...নজদের দিকে, তারপর রওনা করে দিলাম—শুধু পরের গেরামটিতেই একবার থেমেছিলাম একটা মশক এবং কিছু খাবার কেনার জন্য...তারপর চললাম উট হাঁকিয়ে দিনের পর দিন—যতক্ষণ না আপনার সাথে মুলাকাত হলো মক্কায়, চার হপ্তা পরে...'

—'এবং তোমার মনে আছে জায়েদ, আরবের অভ্যন্তরে আমাদের দু'জনের সেই পয়লা সফরের কথা, দক্ষিণ মুখে, খেজুর বাগিচার এবং ওয়াদি বিশার গম ক্ষেতের দিকে এবং সেখান থেকে রানিয়ার বালু বিস্তারের দিকে, যা আগে কখনো অতিক্রম করেনি কোন অন্-আরব!'

—'কতো স্পষ্টই না তা আমার মনে পড়ছে, চাচা। আপনি কতো উৎসুকই না ছিলেন সেই শূন্য এলাকা[১] দেখতে যেখানে জীনের প্রভাবে বালুরাশি গান গায় সূর্যের নিচে। আর সেই এলাকার কিনারে যে-সব 'বদূ' বাস করে তাদের কথা? যারা তাদের জীবনে তখনো চশমা দেখেনি এবং মনে করেছিলো আপনার চশমা জমাট পানি দিয়ে তৈরি? ওরা নিজেরাই জিনের মতো; অন্য মানুষ যেমন বই-কিতাব পড়ে তেমনি পড়ে ওরা বালুর উপর পথের রেখাসমূহ এবং পড়ে আকাশ আর হাওয়া থেকে ধূলি-ঝড়ের আগমনের কথা—ঝড় আসার বহু ঘণ্টা আগেই। আর চাচা, আপনার কি মনে আছে রানিয়াতে আমরা যে গাইড ভাড়া করেছিলাম তার কথা—সেই শয়তান 'বাদাভী'র কথা—যাকে আপনি গুলি করে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, সে আমাদেরকে মরুভূমির মাঝখানে ফেলে চলে যেতে চেয়েছিলো বলে। আপনি যে যন্ত্রটি দিয়ে ছবি তোলেন তার বিরুদ্ধে সে কী ক্ষেপেই না গিয়েছিলো!'

আমরা দুজনেই আমাদের বহু দূরে ফেলে আসা সেই এ্যাডভেঞ্চারে হাসি। কিন্তু তখন আমাদের মোটেই হাসির মতো অবস্থা ছিলো না। আমরা ছিলাম রিয়াদের দক্ষিণে ছ-সাত দিনের পথ দূরে, যখন সেই গাইড, আর রাইনের 'ইখওয়ান' বস্তির এক গোঁড়া বেদুঈন, গোস্বায় ফেটে পড়েছিলো আমি তাকে ক্যামেরার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলাতে। সে তখুনি এবং সেখানেই আমাদেরকে ফেলে চলে যাবার জন্য তৈরি হলো, কারণ এ ধরনের জাহেলী ছবি তোলায় তার রূহ্ বিপন্ন হয়ে পড়েছিলো। ওর হাত থেকে ছাড়া পেতে আমার মোটেই আপত্তি ছিলো না, যদি এ আংশকা না থাকতো যে আমরা তখন অমন একটি এলাকায় এসে পড়েছিলাম যার সাথে আমার বা জায়েদের কোন পরিচয়ই ছিলো না—যেখানে আমাদের দুজনকে একলা ছেড়ে গেলে নিশ্চয়ই আমরা দিশাহারা হয়ে পড়তাম। পয়লা আমি আমাদের সেই 'বেদুঈন শয়তান'কে বুঝাতে চাইলাম যুক্তি দিয়ে। কিন্তু কোনো ফায়দাই হলো না। ও কিছুতেই বুঝতে চাইবে না। বরং উটের রোখ ও ফিরিয়ে দিলো রানিয়ার দিকে। আমি তখন ওকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলাম, আমাদের এভাবে তৃষ্ণায় প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে যদি ও রেখে যায় তাহলে সে জান নিয়ে কিছুতেই পালাতে পারবে না। এই হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও যখন ওর উট চালাতে শুরু করলো আমি তখন ওর দিকে আমার রাইফেল তাক করে তৈরি হলাম ওকে গুলি করতে—গুলি করার পুরা ইচ্ছাই ছিলো; এবং মনে হলো তাতেই শেষ পর্যন্ত আমাদের বন্ধুটির রূহ্ নিয়ে যতো ভাবনা-চিন্তা চাপা পড়ে গেলো। কিছুক্ষণ বিড়বিড় করার পর সে রাজি হলো, ওখান থেকে তিন দিনের রাস্তা পরবর্তী বস্তি পর্যন্ত আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে—যেখানে আমরা পারবো আমাদের বিতর্কিত বিষয়টিকে বিচারের জন্য কাজীর সামনে পেশ করতে। আমি আর জায়েদ মিলে ওর অস্ত্র কেড়ে নিলাম, তারপর পালাক্রমে পাহারা দিতে লাগলাম যাতে সে সরে পড়তে না পারে। কয়েক দিন পর আমরা যখন কুবাইয়ার 'কাজী'র নিকট বিচার প্রার্থনা করলাম তিনি প্রথমে রায় দিলেন আমাদের গাইডেরই পক্ষে। 'কারণ' (রসূলের একটি হাদীসের 'ভুল' ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে তিনি বললেন, 'জীবিত প্রাণীর ছবি তোলা নিন্দনীয় কাজ' কিন্তু জীবিত প্রাণীর ছবি তোলা নিষিদ্ধ—বর্তমান কাল পর্যন্ত বহু মুসলমানের মধ্যে প্রবল এই বিশ্বাস সত্ত্বেও, এ ব্যাপারে ইসলামী আইনে কোনো বিধান নেই)। তখন আমি 'দেশের

১. রাব' আলখালি-নামক সুবিশাল জনবসতিশূন্য বালুময় মরুভূমি যা আরব-উপদ্বীপের এক-চতুর্থাংশ জুড়ে রয়েছে।

সকল আমীর এবং যে কেউ এটা পড়বে' তার জন্য লিখিত বাদশাহ্‌র খোলা চিঠি 'কাজী'র সামনে মেলে ধরলাম—এবং পড়তে গিয়ে 'কাজী'র মুখ ক্রমেই লম্বাটে হয়ে উঠতে লাগলো—'মুহম্মদ আসাদ আমার মেহমান, দোস্ত এবং আমার প্রিয়জন, যে কেউ তার প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করবে সে আমার প্রতিই তা করবে এবং যে কেউ তার প্রতি শত্রুতা করবে সে আমারই শত্রু বলে গণ্য হবে,...ইব্‌নে সউদের কথা এবং মোহর যাদুর মতো কাজ করলো কঠোর কাজীর উপর। শেষপর্যন্ত তিনি এ রায় দিলেন যে, 'কোনো কোনো অবস্থায়' ছবি তোলা অনুমোদন করা যেতে পারে।....এই রায়ের পরেই আমরা আমাদের গাইডকে ছেড়ে দিলাম এবং আমাদেরকে রিয়াদের দিকে নিয়ে যাবার জন্য নিযুক্ত করলাম নতুন একজন গাইড।

—'চাচা, রিয়াদের সেই দিনগুলির কথা আপনার মনে আছে কি, যখন আমরা ছিলাম বাদশাহ্‌র মেহমান এবং পুরানো শাহী আস্তাবল ঝক্‌ঝকে মোটর গাড়িতে ভর্তি দেখে আপনি কতো মর্মাহত হয়েছিলেন!...এবং আপনার প্রতি বাদশাহ্‌র মেহেরবানির কথা?'

—'আর তোমার কি মনে পড়ছে জায়েদ, বাদশাহ্ কীভাবে আমাদের পাঠিয়েছিলেন বেদুঈন বিদ্রোহের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে এবং কীভাবে আমরা রাতের পর রাত সফর করে লুকিয়ে ঢুকেছিলাম কুয়েত-এ; শেষপর্যন্ত জানতে পেরেছিলাম ঝক্‌ঝকে নতুন 'রিয়াল' এবং সমুদ্দুর পাড়ি দিয়ে যেসব অস্ত্রশস্ত্র বিদ্রোহীদের নিকট আসছিলো তার আসল রহস্য....?'

—'আর চাচা, আমাদের সেই মিশনের কথা, যখন সৈয়দ আহমদ—আল্লাহ্ তাঁর হায়াত দরাজ করুন—আমাদেরকে পাঠিয়েছিলেন সাইরেনিকায় এবং কেমন করে আমরা গোপনে একটি 'ধাও'-এ করে সমুদ্দুর পার হয়ে ঢুকেছিলাম মিসরে এবং কীভাবে আমরা সেই ইতালীয়দের দৃষ্টি এড়িয়ে আল্লাহ্‌র লানত হোক ওদের উপরে প্রবেশ করেছিলাম জবল আখদারে এবং উমর আল-মুখতারের নেতৃত্বে যোগদান করেছিলাম, 'মুজাহিদিনের' সংগে? কী উত্তেজনাপূর্ণই না ছিলো সেই দিনগুলি!'

এভাবে আমরা একে অপরকে স্মরণ করিয়ে চলি বহুদিনের কথা, অসংখ্য দিনের কথা, যখন আমরা দুজন ছিলাম এক সংগে এবং আমাদের 'আপনার কি মনে পড়ে' 'তোমার কি মনে আছে' এই সব জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে রাত হয়ে ওঠে গভীর হতে গভীরতরো, ক্রমেই তাঁবুর আগুন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতরো হতে থাকে এবং শেষতক, মাত্র কয়েকটি কাঠের টুকরা নিভে নিভে জ্বলতে থাকে আর জায়েদের মুখমণ্ডল ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে ছায়ায়, আর তা-ই আমার ভারাক্রান্ত চোখে একটি স্মৃতির মতো হয়ে ওঠে।

তারার আলোকে আলোকিত মরুভূমির রাতের নীরবতায় যখন এক নাজুক ঈষদুষ্ণ হাওয়ায় ছোটো ছোটো ঢেউ জাগে বালুতে—অতীত আর বর্তমানের ছবি একে আরেকের সাথে বারবার জড়িয়ে যায়, আবার আলাদা হয়ে পড়ে এবং স্মৃতিকে জিইয়ে তোলা এক বিস্ময়কর ধ্বনির সংগে একে অপরকে পেছন দিকে ডাকে, বহু বছর পেরিয়ে, আমার আরবীয় বছরগুলির শুরুতে মক্কায় আমার পয়লা হজ্ব এবং যে আঁধার সেই শুরুর দিনগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো, তার প্রতি ঃ সেই নারীর মৃত্যুর প্রতি, যাকে আমি এমন ভালোবেসেছিলাম, যেমন আর কোন নারীকেই ভালোবাসিনি পরে, যে এখন শুয়ে

আছে মক্কার মাটির নিচে, একটা সাদাসিধা পাথর রয়েছে তার শিয়রে, যাতে কোন লেখা নেই, যা চিহ্নিত করছে তার পথের শেষ এবং আমার এক নতুন পথের শুরু, একটি শেষ এবং একটি শুরু, একটি ডাক এবং একটি প্রতিধ্বনি মক্কার শিলাময় উপত্যকায়, আশ্চর্যজনকভাবে একে অপরের স্বপ্নের সাথে জড়িত!

—'জায়েদ, আরো কিছু কফি হবে?'

—'আপনার হুকুমের অপেক্ষায় চাচা!' জায়েদ জবাব দেয়। সে ব্যস্ত সমস্ত না হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, তার বাঁ হাতে লম্বা চিকন কাঁসার কফি পাত্র। তারপর মিনিট দু'এক, হাতলশূন্য পেয়ালা টুঙটাঙ করে ওঠে তার ডান হাতে—একটি আমার জন্য আর একটি ওর নিজের জন্য—পয়লা পেয়ালাটিতে কিছু কফি ঢেলে সে আমার হাতে দিলো। লাল এবং সাদা চেক্—'কুফিয়া'র ছায়ার নিচে থেকে তার চোখ দুটি আমাকে নিরীক্ষণ করে গভীর মনোনিবেশের সাথে, যেন সামান্য কফির পেয়ালার চাইতে এভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শনই অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ! এই লম্বা লম্বা পশম শোভিত, গভীর, সংযত, শান্ত অবস্থায় করুণ অথচ চকিত আনন্দে ঝলসে উঠতে সদা উৎসুক দুটি চোখ বলছে স্তেপ অঞ্চলে মুক্তির মধ্যে শত পুরুষের জীবন কথা ঃ এ চোখ এমন মানুষের চোখ যার পূর্বপুরুষেরা শোষিত হয়নি কখনো এবং অন্যকেও শোষণ করেনি কোনোদিন। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে ওর চলনের ভংগিগুলি, প্রশান্ত, প্রতিটি ভংগির নিজস্ব ছন্দ সম্বন্ধে সচেতন, কখনো তাড়াহুড়া নেই—দ্বিধাগ্রস্ত নয় কখনো ঃ এমন নিখুঁত এবং বাহুল্য বর্জিত যে, আপনাকে তা একটা সুসমন্বিত অর্কেষ্টার ঐকতানের মধ্যে বিভিন্ন যন্ত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা মনে করিয়ে দেবে। বেদুঈনদের মধ্যে আপনি প্রায়ই দেখতে পাবেন এ ধরনের চলনভংগি মরুভূমির বাহুল্যহীনতা ওদের মধ্যে প্রতিফলিত। কারণ অল্প কটি শহর এবং গ্রাম বাদ দিলে, আরব দেশের মানুষের জীবন মানুষের হাতে এতো সামান্যই আকৃতি পেয়েছে যে, প্রকৃতি তার কঠোর নিয়মে মানুষকে বাধ্য করেছে আচার-আচরণে সকল প্রকার বিক্ষিপ্ততাকে বর্জন করতে এবং তার নিজের ইচ্ছা অথবা প্রয়োজনে করা সকল কাজকে রূপান্তরিত করতে স্বল্প কটি অতি নির্দিষ্ট, মৌলিক রূপে—যা অসংখ্য পুরষ ধরে একই রয়ে গেছে এবং কালক্রমে অর্জন করেছে স্ফটিকের মসৃণ স্পষ্টতা। আর উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত এই সরলতাই এখন আমরা দেখতে পাই খাঁটি আরবের অংগভংগিতে যেমন, তেমনি জীবনের প্রতি তার মনোভাবে।

—'জায়েদ, তুমি আমাকে বলো, কাল আমরা কোথায় যাচ্ছি!'

জায়েদ স্মিত হাসির সাথে আমার দিকে তাকায়—'কেন চাচা, আমরা তো তায়েমার দিকেই যাচ্ছি...?'

—'না ভায়া, আমি অবশ্যি চেয়েছিলাম তায়েমা যেতে! কিন্তু এখন আর আমি তা চাইছি না। আমরা যাচ্ছি মক্কা...'

পথের শুরু

এক

তৃষ্ণার কবলে পড়ার কয়েক দিন পর সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে আমি আর জায়েদ পৌছুই একটি ছোট্ট পরিত্যক্ত ওয়েসিসে এবং রাতটা সেখানেই কাটাবার ইরাদা করি। ডুবন্ত সূর্যের কিরণের নীচে পুবদিকের বালু-পাহাড়গুলি রঙধনু-রঙ চাঁই-চাঁই আকীক পাথরের মতো ঝলমল করছে একটানা পরিবর্তনশীল রঙীন খড়ি-রঙ ছায়া আর কোমলীকৃত আলোর প্রতিফলনের ধারায়—আর বর্ণের দিক দিয়ে এ পরিবর্তন এতোই নাজুক যে, মনে হয়, ঘনায়মান গোধূলির ধূসরতার দিকে আগিয়ে চলা কোনো রকমে অনুভবযোগ্য ছায়া-স্রোতের অনুসরণ করতে গিয়ে চোখও যেন তার প্রতি জুলুম করছে। আপনি এখনো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন খেজুর গাছের মাথাগুলি, যেন পালক-খচিত মুকুট, আর ওদের পেছনে, আধা লুকানো নিচু কাদা-ধূসর ঘর-বাড়ি আর বাগিচার দেয়ালগুলি! কুয়ার উপর কাঠের চাকাগুলি তখনও গান গেয়ে চলেছে।

গ্রামটি থেকে কিছু দূরে আমরা আমাদের উটগুলিকে শোয়াই খেজুর বাগানের নিচে। তারপর আমাদের ভারি বস্তাগুলি নামাই এবং উটের গরম পিঠের উপর থেকে জিন খুলে ফেলি। আমাদেরকে বেগানা দেখে আমাদের চারপাশে কয়েকটি দুরন্ত শিশু এসে জড়ো হয় এবং তাদের মধ্যে একটি ছেলে, যার চোখ বড়ো বড়ো এবং পরনে ছেঁড়া কাপড়, সে জায়েদকে বললো—কোথায় লাকড়ি পাওয়া যাবে সে তা দেখিয়ে দেবে। ওরা দুজন যখন লাকড়ির সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো তখন আমি উটগুলিকে নিয়ে তালাবের নিকট যাই। আমি আমার চামড়ার বালতি নামিয়ে পানি ভর্তি করে যখন তুলছি সেই সময় গাঁ থেকে কটি মেয়ে এলো পানি নেবার জন্য, তামার পাত্র এবং মাটির কলসে করে। ওরা পাত্রগুলি স্বচ্ছন্দে বহন করছে মাথায়, দুহাত দুপাশে ছেড়ে ঝুলিয়ে দিয়ে, বোঝার সংগে তাল রাখার জন্যই সামনের দিকে একটু ঝুঁকে, বোরকার ঝুল ঝাপটানো পাখার মতো দু'হাতে তুলে ধরে।

'আস্‌সালামু আলাইকুম, আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক হে মুসাফির।'

এবং আমি জবাব দিই ঃ 'আর তোমাদের উপরও শান্তি আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।'

ওদের পোশাক কালো রঙের এবং ওদের মুখমণ্ডল খোলা, যা আরবের এ অঞ্চলে গ্রাম্য এবং বদ্দু রমণীদের প্রায় প্রত্যেকের বেলায়ই সত্যি, ফলে আপনি সহজেই দেখতে পান ওদের কালো বিশাল চোখ। বহু পুরুষ ধরে যদিও ওরা বসতি স্থাপন করেছে এক মরূদ্যানে তবু ওরা ওদের পূর্বপুরুষদের যাযাবর জীবনের আন্তরিক ভাবভংগি হারায়নি। ওদের চালচলন পরিষ্কার আর নির্দিষ্ট; ওদের বাক্‌সংযম লজ্জা-শরম থেকে একেবারেই মুক্ত—যখন দেখলাম ওরা নিঃশব্দে বালতির রশি আমার হাত থেকে তুলে নিচ্ছে এবং আমার উটের জন্য পানি তুলছে—ঠিক যেমনটি চার হাজার বছর আগে এক তালাবের নিকটে সেই নারীটি করেছিলো ইবরাহীমের ভৃত্যের প্রতি—যখন সে কেনান থেকে

এসেছিলো 'পাদান আরাম'-এ তদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নিকট, তার মুনিবের পুত্র ইসহাকের জন্য একটি কনে যোগাড় করতে।

> "সে সন্ধ্যাকালে শহরের বাইরে, একটি তালাবের কাছে হাঁটু গাড়িয়ে বসালো তার উটগুলিকে।
>
> এবং সে বললো, 'ওগো আমার মুনিব, ইবরাহীমের প্রভু, আমি প্রার্থনা করছি তোমার নিকট, তুমি আজ আমাকে দ্রুতগতি দাও এবং আমার মুনিব ইবরাহীমের প্রতি দয়া করো। দেখো, এখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি একটি পানির তালাবের কাছে এবং নগরের লোকদের কন্যারা আসছে পানি তুলতে। এ রকম যেনো ঘটে যে, আমি যে তরুণীকে বলবো, আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি—তোমার কলসী নামাও, যাতে আমি পেতে পারি পানি এবং সে বলবে, 'খাও—এবং তোমার উটগুলিকে পানি খাওয়াবো আমি'—'সে যেনো ঐ মেয়ে হয় যাকে তুমি মনোনীত করেছো তোমার দাস ইসহাকের জন্য এবং তাহলেই আমি জানতে পারবো তুমি আমার মুনিবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছো।'
>
> এবং দেখো, তার কথা বলার আগেই এরূপ ঘটলো যে, রেবেকা এসে হাজির হলো.....তার কাঁদের উপর তার কলস। আর তরুণীটি ছিলো দেখতে অতি সুন্দর এবং কুমারী, যাকে স্পর্শ করেনি কোনো পুরুষ। সে ইদারার ভেতর নেমে ভর্তি করলো তার কলস, তারপর উঠে এলো।
>
> নওকরটি তার নিকট ছুটে গিয়ে বললো, 'আমি তোমার নিকট মাঙছি—তোমার কলস থেকে কিছু পানি খেতে দাও আমাকে'। সে বললো, 'পান করুন প্রভু।' এবং তাড়াতাড়ি ক'রে কলসটিকে তার হাতে নামিয়ে তাকে খেতে দিলো পানি। পানি খাওয়ানোর পর তরুণীটি বললো, 'আমি উটগুলির জন্যও পানি তুলবো যতোক্ষণ না ওদের পিয়াস মিটেছে।' সে দেরী না করে তার কলস খালি করে পানি ঢেলে দেয় গামলার মধ্যে যেখান থেকে উটগুলি খাবে এবং আবার ছুটে যায় ইঁদারার ভেতরে আর সব ক'টি উটের জন্যই তুলতে থাকে পানি...."

বিশাল নুফুদের বালুরাশির মধ্যে ছোট একটি ওয়েসিসে একটি ইঁদারার কাছে আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার দুটি উট নিয়ে, আর তাকাচ্ছি মেয়েটির দিকে যে বালতির রশি আমার হাত থেকে নিয়েছে নিজের হাতে আর আমার জন্তুগুলির জন্য পানি তুলছে—আর আমার মনের উপর তখন ভেসে চলেছে বাইবেলের ঐ কাহিনী। 'পাদান আরাম' নামক সেই দেশ এবং ইবরাহীমের জামানা বহু বহু দূরের কিন্তু এই রমণীরা ওদের মর্যাদাপূর্ণ অংগভঙ্গি যে স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে তারি জোরে, স্থানের সব ব্যবধান দিয়েছে মুছে এবং সময়ের বিচারে দীর্ঘ চার হাজার বছর যেন কিছুই নয়!

—'প্রিয় বোনেরা, আল্লাহ্ তোমাদের হাতকে ধন্য করুন এবং তোমাদেরকে সালামতে রাখুন।'

—'আর হে মুসাফির, আপনিও থাকুন আল্লাহ্‌র হিফাজতে,' ওরা জবাব দেয়, তারপর ওরা মনোযোগী হয় ওদের গামলা আর কলসগুলির প্রতি—সেগুলি ভর্তি করে ঘরে পানি নিয়ে যাবার জন্য।

আমাদের তাঁবুর জায়গায় ফিরে এসে আমি আমার উটগুলিকে হাঁটু গাড়িয়ে বসাই এবং সামনের পাগুলিতে বেড়ি পরিয়ে দেই, যাতে ওরা রাতের বেলা কোথাও চলে যেতে না পারে। জায়েদ এরি মধ্যে আগুন ধরিয়েছে এবং কফি তৈরি করতে লেগে গেছে। একটা লম্বা বাঁকানো নল, পানি টগবগ করছে; একই আকারের ছোট্ট আরেকটি কফি পাত্র জায়েদের কনুইয়ের কাছে তৈরি রয়েছে। বাঁ হাতে সে ধরে আছে চ্যাপ্টা প্রকাণ্ড একটি লোহার চামচ, যার হাতলটি দু'ফুট লম্বা; এই চামচে সে মৃদু আগুনের উপর এক মুঠা কফিশুটি ভাজছে, কারণ আরব দেশে প্রতিটি পাত্রের জন্যই নতুন করে ভাজা হয় কফি। কফিশুটিগুলি কিছুটা তামাটে হয়ে ওঠার সংগে সংগেই জায়েদ সেগুলি একটি কাঁসার তৈরি হামানদিস্তায় রাখে এবং গুঁড়া করে। এরপর সে বড় পাত্রটি থেকে কিছু ফুটন্ত পানি ছোটো পাত্রটিতে ঢালে—চূর্ণ কফি এর মধ্যে ঢেলে দেয় উপুড় করে এবং পাত্রটিকে রেখে দেয় আগুনের কাছে, যাতে করে ধীরে ধীরে ফুটতে পারে পানি। পানীয়টি প্রায় তৈরি হয়ে এলে জায়েদ তাতে কিছু এলাচ দানা ছেড়ে দেয় পানীয়টিকে তীব্রতরো করার জন্য, কারণ আরব দেশে কথা আছে, কফি যদি ভালো হতে হয়, অবশ্যি তা হতে হবে 'মৃত্যুর মতো তীব্র এবং প্রেমের মতো ঝাল ও উষ্ণ।'

কিন্তু আমি এখনো আরামের সাথে কফি পানের জন্য তৈরি নই। ক্লান্ত-দীর্ঘ, উত্তপ্ত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জীনের উপর বসে থেকে ঘর্মাক্ত-পরনের পোশাক আমার শরীরের চামড়ার সাথে লেপ্টে আছে নোঙরাভাবে, স্বভাবতই গোসলের জন্য সারা সত্তা লালায়িত হয়ে আছে, তাই আমি ধীরে ধীরে আবার ফিরে যাই খেজুর বাগানের নিচে কুয়াটির কাছে।

আঁধার ঘনিয়ে এসেছে এরি মধ্যে। খেজুর বাগান থেকে সবাই ঘরে ফিরে গেছে। শুধু দূরে, যেখানে ঘর-বাড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে একটি কুকুর ডাকছে। আমি আমার গায়ের কাপড়-চোপড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নেমে পড়ি কুয়ার ভেতরে, কুয়ার দেয়ালের তাক ও খাঁজে হাত আর পা রেখে এবং কয়েকটি রশি অবলম্বন করে—যে রশিতে ঝুলছে পানি তোলার মশকগুলি ঃ আমি নেমে পড়ি অন্ধকার পানি পর্যন্ত, তারপর সেই পানির ভেতরে। পানি বড় ঠান্ডা এবং আমার বুক পর্যন্ত পৌছুলো সেই পানি। অন্ধকারে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে পানি তোলার রশিগুলি—এখন পানিতে ডোবা মস্ত বড়ো মশকগুলির ভারে সটান খাড়া হয়ে। দিনের বেলা এই মশকগুলিই ব্যবহৃত হয় ক্ষেতে পানি দেবার কাজে। পায়ের তলার নিচে আমি অনুভব করি, পাতলা ক্ষীণ পানির ধারা চুঁয়ে চুঁয়ে উপরদিকে উঠছে মাটির নীচের উৎস থেকে, যা এক মন্থর, চির-নতুনের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় কুয়াটিকে রাখছে তাজা।

আমার উপরে কুয়াটির মুখের উপর বাতাস হু হু করছে এবং কুয়াটির ভেতর সৃষ্টি করছে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যেন কানের কাছে চেপে ধরা সামুদ্রিক শঙ্খের ভেতরের আওয়াজ—একটি বৃহৎ শন্ শন্ ধ্বনি করা সামুদ্রিক শঙ্খ, যা আমি কানের কাছে চেপে ধরে শুনতে ভালোবাসতাম আমার আব্বার বাড়িতে, বহু বহু বছর আগে যখন আমি শিশু—কোনো রকমে টেবিলের উপর তাকাতে পারি লম্বায় অতটুকু উঁচু। আমি কানে চেপে ধরতাম শঙ্খটি আর বিস্মিত হয়ে ভাবতাম, এ আওয়াজ কি সবসময়ই শঙ্খের ভেতরে উঠছে, না, আমি যখন এটিকে কানের কাছে ধরি তখনি তা বেজে ওঠে। আমার সংগে কি

এর কোনো সম্পর্ক নেই? এ সংগীত কি এমনি বাজছে? না কি আমি যখন শুনতে চাই তখনি তা বেজে ওঠে? বহুবার আমি চেষ্টা করেছি শঙ্খটিকে চালাকিতে হারিয়ে দিতে আমার নিকট থেকে ওটিকে দূরে রেখে, যাতে শন্ শন্.ধ্বনিটি থেমে যায়—তারপর, হঠাৎ আবার সেটিকে চেপে ধরেছি কানের কাছে। আবার সেই সংগীত, সেই ধ্বনি! আমি কখনো এ সমস্যার সমাধান করতে পারিনি ঃ যখন আমি শুনতে চেষ্টা করতাম তখনো শঙ্খের ভেতরে এ সংগীত বেজে চলতো কিনা!

অবশ্য আমি তখনো বুঝতে পারিনি যে, আমার বুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে এমন একটি প্রশ্নে যাতে হতবুদ্ধি হয়েছেন আমার চেয়ে অনেক বেশি দানিশ্‌মন্দ আদমীরা অসংখ্য জামানা ধরে ঃ প্রশ্নটি হচ্ছে—আমাদের মন-নিরপেক্ষ 'সত্য' বা 'বাস্তব' বলে কিছু আছে কি না, কিংবা আমাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই তা সৃষ্টি করে কি না। কিন্তু ফেলে আসা দিনগুলির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে—এ সমস্যা কেবল ছেলেবেলায়ই আমার পিছু পিছু ধাওয়া করেনি, পরবর্তীকালেও করেছে—যেমন ধাওয়া করে থাকবে কোনো-না কোনো সময়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, প্রত্যেকটি চিন্তাশীল মানুষকেই। কারণ, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সত্য যা-ই হোক, পৃথিবী আমাদের নিকট নিজেকে ব্যক্ত করে সেই আকৃতিতে এবং ততোটুকুই যে আকৃতি এবং যতোটুকু প্রতিফলিত হয় আমাদের মনে। কাজেই, আমরা প্রত্যেকেই 'সত্য' উপলব্ধি করতে পারি কেবল নিজের অভিজ্ঞতারই যোগসূত্রে। এখানেই হয়তো পাওয়া যাবে মানুষের চেতনার প্রথম সূচনা থেকে মৃত্যুর পর মানুষের বেঁচে থাকায় মানুষের চিরন্তন বিশ্বাসের একটি যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা এবং এ বিশ্বাস এতো গভীর, সকল কওম ও সকল কালে এতো ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত যে, একে কেবল একটি খেয়ালি ধারণা বলে সহজেই উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। এ কথা বলা হয়তো অত্যুক্তি হবে না যে, মানুষের মনের বিশেষ গড়নের ফলেই এ বিশ্বাস অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে, অনিবার্যভাবেই। বিমূর্ত তাত্ত্বিক অর্থে নিজের মৃত্যুকে চূড়ান্ত বিলুপ্তি বলে মানুষের পক্ষে চিন্তা করা হয়তো কঠিন নয়, কিন্তু সেই বিলুপ্তিকে দৃষ্টিগোচরে আনা অসম্ভব। কারণ এর অর্থই এই যে, মানুষ 'বাস্তব' বস্তু মাত্রেরই বিলুপ্তি প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে। অন্য কথায় সে পারবে শূন্যতার ধারণা করতে যে ধারণা কোনো মানুষের মনই করতে সক্ষম নয়।

দার্শনিক এবং নবী-রসূলগণ নতুন করে আমাদের শেখাননি মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে—তাঁরা তো কেবল পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের মতোই প্রাচীন, সহজাত একটি ধারণাকে রূপ দিয়েছেন এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্যমণ্ডিত করেছেন।

সারাদিনের সফরের ধূলাবালু আর ঘাম ধুয়ে ফেলার মতো নেহাৎ জাগতিক ক্রিয়ার সাথে এ ধরনের গভীর সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার মধ্যে যে অসঙ্গতি রয়েছে তাতে আমি মনে মনে না হেসে পারি না। দৃষ্টি বা বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনো সীমারেখা জীবনের জাগতিক এবং নিগূঢ় দিকের মধ্যে আছে কি? নজিরস্বরূপ, একটি হারানো উটের খোঁজে বের হওয়ার চাইতে অধিকতরো জাগতিক বিষয় কী হতে পারে? এবং পিয়াসে প্রায় মৃত্যুর চেয়ে নিগূঢ়তরো এবং দুর্বোধ্যতরো বিষয়ই বা কী হতে পারে?

হয়তো সেই অভিজ্ঞতার ধাক্কাই আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে করেছে তীক্ষ্ম, ধারালো এবং আমার নিজের নিকট একটা কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তাকে করে তুলেছে অনিবার্য। সেই

প্রয়োজনটি হচ্ছে—আমি আমার নিজের জীবনের গতিকে আগে যেভাবে উপলব্ধি করেছি তার চাইতে পূর্ণতরোরূপে তাকে উপলব্ধি করার প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু তাই বলে, আমি আমার মনকে স্মরণ করিয়ে দিই, মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন কি সে সত্যি তার নিজের জীবনের মানে উপলব্ধি করতে পারে? আমাদের জীবনে, এই মুহূর্তে বা অমুক সময়ে কী ঘটেছে তা-ও আমরা মাঝেমাঝে জানি, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য, আমাদের অদৃষ্ট অতো সহজে বোঝা বা দেখা যায় না। কারণ, অদৃষ্ট হচ্ছে অতীত ও বর্তমান, যা কিছু আমাদের মধ্যে ঘটেছে আর আমাদেরকে চালিত করেছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু আমাদের মধ্যে ঘটবে ও আমাদেরকে চালিত করবে তারই মোটমাট যোগফল এবং সে কারণে, আমাদের যাত্রার একেবারে শেষেই কেবল তার পূর্ণ রূপটি ধরা দিতে পারে এবং যতোদিন আমরা পথ চলছি ততোদিন সবসময় আমরা তাকে ভুলই বুঝবো কিংবা কেবল অর্ধেকেই বুঝবো।

আমি আমার এই বত্রিশ বছর বয়সে কী করে বলতে পারি, আমার অদৃষ্ট কী ছিলো কিংবা তা কী?

আমার ফেলে আসা জীবনের দিকে আমি যখন তাকাই, কখনো কখনো আমার মনে হয়, আমি যেন দু'টি মানুষের জীবনই দেখছি। কিন্তু এ বিষয়ে যখনই ভাবি, প্রশ্ন জাগে আমার জীবনের এ দু'টি অংশ কি আসলেই একে অপর থেকে এতো আলাদা—না কি রূপ ও পন্থার বিষয়ে এতো সব বাহ্য-পার্থক্যের তলদেশেও জীবনের উভয় অংশে সবসময়েই ছিলো অনুভূতির মিল এবং লক্ষ্য ছিলো একই?

আমি আমার মাথা তুলি এবং কূয়ার বৃত্তাকার কাঁধির উর্ধ্বদেশে দেখতে পাই আসমানের একটি বৃত্তাকার খণ্ড এবং তারাসমূহ। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি নিশ্চল; আর আমার মনে হলো, আমি যেনো দেখতে পাচ্ছি কী করে ওরা ধীরে ধীরে স্থান বদলে চলেছে যাতে করে ওরা পুরা করতে পারে লাখো-কোটি বছরের চক্র যা কখনো শেষ হবার নয়। এবং তারপর, আমি না চাইলেও আমাকে ভাবতে হয়, বছরের যে স্বল্প ক'টি পাড়ি আমি পার হয়ে এসেছি তার কথা, সেই অস্পষ্ট বছরগুলি যা আমি কাটিয়েছি আমার শৈশবের গৃহের উষ্ণ নিরাপত্তায়, অমন একটি শহরে, যার প্রতিটি অলিগলি ছিলো আমার চেনা পরিচিত... তারপর বড় বড় সব নগরীতে, উত্তেজনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরপুর নগরীতে কাটানো দিনসব, যা শুধু কিশোরই পারে অনুভব করতে...এরপর এক নতুন জগতে, যেখানে মানুষগুলির চেহারা-সুরত প্রথমে মনে হয়েছিলো বিদেশী, কিন্তু কালক্রমে নিয়ে এসেছিলো এক নতুন অন্তরংগতা এবং স্বগৃহে ফেরার নতুনতরো অনুভূতি। তারপর....অপরিচিত...আরো অপরিচিত পটভূমিকায়, মানব-মনের মতোই পুরোনো সব শহর-নগরে দিন যাপন, দিগন্তহীন স্তেপ অঞ্চলে, পাহাড়-পর্বতে, যার আদিমতা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় মানব হৃদয়ের বন্য আদিমতার কথা...এবং মরুভূমির নির্জন উত্তপ্ত একাকীত্বে গড়িয়ে চলা দিনগুলি ধীরে ধীরে জন্ম নেয় নতুন সত্য—সত্য, যা আমার কাছে নতুন...এবং সেদিন দীর্ঘ আলাপের পরে, হিন্দুকুশ পর্বতের তুষারের মধ্যে এক আফগান বন্ধু বিস্মিত হয়ে বলে উঠেছিলো....'কিন্তু আপনি তো মুসলিম; আপনি নিজে তা জানেন না, এই যা।'...এবং আরেক দিন, কয়েক মাস পরে যখন আমি নিজেই তা জানতে

পেরেছিলাম। তারপর মক্কায় আমার প্রথম হজ্ব, আমার স্ত্রীর মৃত্যু এবং তার পরবর্তী নৈরাশ্য; আর তখন থেকে আরবদের মধ্যে কাটানো এই সব মুহূর্ত—অন্তহীন মুহূর্তগুলি এবং বছরের পর বছর এক শাহী পুরুষের গভীর বন্ধুত্ব যিনি তলোয়ারের জোরে নিজের জন্য শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন একটি রাষ্ট্র এবং পৌছেছেন প্রকৃত মহত্তের একেবারে কাছাকাছি। বছরের পর বছর মরুভূমি আর স্তেপের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো আরব বেদুঈনদের যুদ্ধের মধ্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সফর করা, লিবিয়ার আজাদী সংগ্রামে শরীক হওয়া এবং মদীনায় দীর্ঘদিন অবস্থান...যেখানে ইসলাম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান পরিপূর্ণ করার জন্য আমি চেষ্টা করি মসজিদে নববীতে; তারপর বারবার হজ্ব; বেদুঈন বালিকাদের সাথে শাদি আর পরে তালাক; মানুষের সাথে আবেগোষ্ণ সম্পর্ক এবং একাকীত্বের উষর দিনগুলি... পৃথিবীর সকল অঞ্চলের বিদগ্ধ মুসলমানদের সাথে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা, অজানা অনাবিষ্কৃত এলাকার মধ্য দিয়ে সফর ঃ প্রতীচ্য জীবনের চিন্তাধারা ও লক্ষ্য থেকে অনেক দূরের এক জগতে নিমজ্জনের এই বছরগুলি।

বছরের পর বছরের কি সুদীর্ঘ মিছিল! এই মুহূর্তে, এই সব নিমজ্জিত বছর এখন ভেসে উঠেছে এবং আবার তাদের মুখের পর্দা তুলে বহু স্বরে আমাকে ডাকতে শুরু করেছে আর অকস্মাৎ আমার হৃদয়ের এক চকিত ঝাঁকুনিতে আমি দেখতে পেলাম কতো দীর্ঘ, কী অন্তহীন আমার এই পথ চলা!—'তুমি তো হামেশাই কেবল চলেছো, আর চলেছো,' আমি নিজেকে বলি, 'তোমার নিজের জীবনকে তুমি এখনো এমন কোনো রূপ দিতে পারোনি যা মানুষ ধরতে পারে তার হাত দিয়ে এবং কখনো পারোনি 'কোথায়'—এই প্রশ্নের জবাব দিতে।...'তুমি তো কেবল চলেছো আর চলেছো.....মুসাফির রূপে, বহুদেশের ভেতর দিয়ে, বহুঘরের মেহমান হয়ে, কিন্তু তোমার সফরের তামান্না তো এখনো শেষ হয়নি এবং তুমি যদিও অপরিচিত নও, তুমি এখনো শিকড় গাড়তে পারোনি।'

আমি এক মানব গোষ্ঠীর মাঝে নিজের জায়গা করে নিয়েছি—ওরা যাতে বিশ্বাস করে আমিও সে সব বিষয়ে বিশ্বাস এনেছি,—তবু আমি এখনো শিকড় গাড়তে পারিনি, এর কারণ কী?

দু'বছর আগে আমি যখন মদীনায় এক আরবী জরু গ্রহণ করি তখন আমি এই কামনাই তো করেছিলাম যে, ও আমাকে একটি বেটা ছেলে সওগাত দেবে। তার পুত্র তালাল, যে মাত্র কয়েক মাস আগে আমাদের ঘরে জন্মেছে তাকে পেয়ে আমি অনুভব করতে শুরু করেছি যে আরবেরা একাধারে আমার স্বজন এবং আদর্শিক ভাই। আমি চাই যে তালাল দেশের গভীরে তার শিকড় গাড়ুক এবং রক্ত ও তমদ্দুনের যে মহৎ উত্তরাধিকার তার রয়েছে তারি উপলব্ধির মধ্যে সে বেড়ে উঠুক। আমার মনে হয়, কোথাও স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের জন্য এবং পরিবারের জন্য একটি স্থায়ী আবাস প্রতিষ্ঠার জন্য যে-কোন ব্যক্তিকে লালায়িত করে তোলার পক্ষে এই যথেষ্ট। তাহলে, কেন এখনো আমার ঘুরে বেড়ানো শেষ হলো না, কেন এখনো আমাকে চলতে হচ্ছে আমার পথে? কেন আমার জন্য আমি নিজে যে-জীবন বেছে নিয়েছি তা এখনো পুরাপুরি আমাকে খুশি করতে পারছে না? কী সেই জিনিস যা আমি পাচ্ছি না এই পরিবেশে?—ইউরোপের বুদ্ধিগত কৌতূহল তা নিশ্চয়ই নয়। আমি সে-সব ফেলে এসেছি পেছনে। এতে যে আমার খুব লোকসান

হয়েছে তা নয়। বলতে কি, আমি এসব থেকে এতো দূরে সরে পড়েছি যে, ইউরোপের যে কাগজগুলি আমার রুটিরুজি যোগাচ্ছে সে–সবের জন্য লেখা তৈরি করাও দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে আমার জন্য। যখনি আমি কোনো লেখা পাঠাই আমার মনে হয়, আমি যেন এক অতল কুয়ার ভেতর ছুঁড়ে মারছি একখণ্ড পাথরঃ পাথরটি গায়েব হয়ে যায় অন্ধকার শূন্যতায় এবং সামান্য একটু প্রতিধ্বনিও আসে না আমাকে একথা জানাতে যে পাথরটি গিয়ে পৌঁছেছে তার লক্ষ্যস্থলে।

এভাবে যখন আমি চিন্তা করছি, অস্থিরতা এবং বিমূঢ়তার মধ্যে আরবের এক ওয়েসিসের কুয়ার অন্ধকার পানিতে, অর্ধ–নিমজ্জিত অবস্থায়, হঠাৎ আমি আমার স্মৃতির পটভূমিকা থেকে শুনতে পাই একটি কণ্ঠস্বর...এক বুড়ো কুর্দিশ যাযাবরের গলার আওয়াজঃ 'পানি যদি বদ্ধ জলার মধ্যে তার গতি হারিয়ে ফেলে, পানি হয়ে ওঠে বাসি, জীর্ণ এবং ময়লা, কিন্তু যখন তা গতিশীল ও প্রবাহিত হয় তখন পানি হয়ে ওঠে স্বচ্ছ, পরিষ্কার। নিরন্তর ভ্রাম্যমান চলমান মানুষের অবস্থাও তাই।' এরপর মনে হলো যেন যাদুমন্ত্র বলে আমার সকল চাঞ্চল্য থেমে গেছে। আমি সুদূর আঁখি মেলে তাকাতে শুরু করি আমার জীবনের দিকে, যেমন আমি তাকাই একটি বই–এর পাতায়, তা থেকে একটি গল্প পড়ার জন্য এবং আমি বুঝতে শুরু করি যে, আমার জীবনের গতি ভিন্ন হতে পারতো না এর থেকে ; কারণ, যখন আমি নিজেকে জিগ্‌গাস করি, 'আমার জীবনের মোটফলটা কী,' আমার ভেতর থেকেই কে যেন জবাব দেয়ঃ 'তুমি বের হয়েছো এক জগতের বদলে আরেক জগৎ পাবার জন্য—এক নতুন জগৎ হাসিলের জন্য পুরনো এক জগতের বদলে, প্রকৃতপক্ষে যার অধিকারী তুমি কোনোদিনই ছিলে না।' এবং চকিত স্বচ্ছতায় আমি বুঝতে পারি—এ ধরনের একটা প্রয়াসে আসলে গোটা জীবনটারই প্রয়োজন হতে পারে।

আমি কুয়ার ভেতর থেকে বের হয়ে আসি, সাথে যে পরিষ্কার লম্বা কুর্তা আমি এনেছিলাম তা গায়ে চড়াই এবং ফিরে যাই আগুনের নিকট জায়েদের কাছে, উটগুলির পাশে। জায়েদ আমাকে যে কড়া কফি দিলো আমি তা–ই খাই, তারপর আগুনের কাছে মাটির উপর সটান শুয়ে পড়ি, সতেজ প্রাণবন্ত হয়ে।

দুই

আমার ঘাড়ের নিচে আড়াআড়িভাবে রাখা আমার হাত দুটি; এবং আমি তাকিয়ে আছি এই আরবীয় রাতের দিকে, অন্ধকার তারাখচিত রাত, যা ধনুকের মতো বেঁকে আছে আমার উপরে। একটা বৈদ্যুতিক চাপের আকারে ছুটে চলেছে একটি উল্কা, এবং এই যে আরেকটি তারপর আরেকটি ঃ আলোর চাপ বিদীর্ণ করছে অন্ধকারের বুক! এগুলি কি কেবল খণ্ড–বিখণ্ড গ্রহের টুকরা, কোনো এক মহাজাগতিক বিপর্যয়েরই ভগ্নাবশেষ, যা এখন উদ্দেশ্যহীনভাবে ধেয়ে চলেছে মহাবিশ্বের অসীম বিস্তারের মধ্য দিয়ে? ওহো! তা নয়। আপনি যদি জায়েদকে জিগ্‌গাস করেন, সে আপনাকে বলে দেবে—এগুলি হচ্ছে আগুনের বর্শা, যার সাহায্যে ফেরেশতারা বিতাড়িত করে শয়তানকে, কোনো কোনো রাতে যে চুপি

চুপি আসমানে উঠে যায় আল্লাহ্‌র রহস্য চুরি করে জানবার জন্যে...একি তা'হলে শয়তানের রাজা ইবলিস নিজে, যার উপর পূর্বাকাশে, এইমাত্র প্রচণ্ড বেগে নিক্ষেপ করা হয়েছে অগ্নিবাণ.....?

এই আসমান এবং এর তারকারাজির সাথে সম্পর্কিত উপকথাগুলি—আমার কাছে বেশি পরিচিত, আমার শৈশবের ঘর থেকে....

এছাড়া অন্য রকম কী করেই বা হতে পারতো? আরব দেশে যখন আমি ঢুকেছি তখন থেকেই জিন্দেগী গুজরান করেছি একজন আরবেরই মতো, কেবল আরবী পোশাকই পরেছি, কথাও বলেছি কেবল আরবী জবানে আর আমার স্বপ্নগুলিও দেখেছি আরবীতে ; আরবের রীতিনীতি আর চিত্রৈশ্বর্য প্রায় অলক্ষিতেই রূপ দিয়েছে আমার চিন্তাকে। একটি দেশের আচার-আচরণ আর ভাষায় একজন বিদেশী যতো দক্ষই হোক না কেন, মনের যে কার্পণ্যের ফলে সাধারণত তার পক্ষে ভিন দেশের মানুষের আবেগ-অনুভূতি উপলব্ধির প্রকৃত পথ খুঁজে বের করা সম্ভব হয় না এবং তাদের জগতকে নিজের জগৎ করে তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে, সে-সবের দ্বারা আমি কখনো বাধাগ্রস্ত হইনি।

হঠাৎ আমি সুখ ও মুক্তির হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি—এতো জোরে হেসে উঠি যে জায়েদ বিস্মিত চোখ মেলে আমার দিকে তাকায় এবং আমার উটটি একটি ধীর অস্পষ্ট উন্নাসিক ভংগিতে তার মাথা আমার দিকে ফেরায়ঃ কারণ, এই মুহূর্তে আমি দেখতে পেলাম আমার পথটি, তার এতো দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও কতো সহজ এবং সরল—যে জগত আমার ছিলো না সেখান থেকে একান্তভাবে আমার নিজের জগতের এই রাস্তাটি।

এদেশে আমার আসা—একি সত্যি নিজেরই ঘরে প্রত্যাবর্তন নয়? একটি হৃদয়ের নিজের ঘরে ফেরা, যে হাজার হাজার বছরের বাঁক ঘুরে তার নিজের ঘর খুঁজেছে এবং এখন চিনতে পেরেছে এই আকাশকে—আমার আকাশকে—বেদনাময় উল্লাসের সংগে? কারণ, এই আরবের আকাশ এতো গাঢ়, এতো উঁচু এবং যে-কোনো দেশের আকাশের চাইতে তারায় তারায় অনেক বেশি উৎসব মুখর, এই আকাশটাই চাঁদোয়ার মতো ছিলো আমার পূর্বপুরুষদের পথের উপর, সেই ভ্রাম্যমাণ পশুচারী যোদ্ধারা, যারা হাজার হাজার বছর আগে তাদের ক্ষমতার একেবারে প্রভাতকালে জমি ও গনিমতের লোভে অন্ধ হয়ে রওনা করেছিলো কাল্‌দিয়ার উর্বর এলাকা এবং এক অজানা ভবিষ্যতের দিকেঃ ইহুদীদের সেই ছোট্ট বেদুঈন কবিলা—সেই লোকদের পিতৃপুরুষ যিনি পরে পয়দা হয়েছিলেন 'কাল্‌দি'দের 'উর' নামক স্থানে।

সেই ব্যক্তি, যাঁর নাম ইবরাহীম, তিনি 'উর' এলাকার বাসিন্দা ছিলেন না। তাঁর কবিলা ছিলো আরবের বহু গোত্রের মধ্যে একটি। এসব আরব গোত্র কোনো-না-কোনো সময়ে উপদ্বীপের ক্ষুধার্ত মরুভূমি হতে এঁকে-বেঁকে যাত্রা করেছে উত্তরের স্বপনপুরীর দিকে, যে এলাকাগুলি দুধ আর মধুতে সয়লাব ছিলো ওরা মনে করতো। উর্বর আল-হিলালের আবাদী এলাকা সিরিয়া এবং মেসোপটেমিয়াই হচ্ছে সেই সব অঞ্চল। কখনো কখনো এই সব কবিলা ওখানকার বাসিন্দাদের পরাজিত করে ওদের জায়গায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে শাসকরূপে, ক্রমে ওরা মিশে গেছে বিজিতদের সাথে আর ওদের সহ নতুন এক জাতিরূপে হয়েছে অভ্যুত্থান, আসিরীয় এবং ব্যাবলনীয়দের মতো জাতির—যারা

তাদের রাজ্য গড়ে তুলেছিলো আগেকার সুমেরীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপর—কিংবা 'কালদি'দের মতো যারা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলো ব্যাবিলনে অথবা এমোরাইতদের মতো যারা পরে কেনানী বলে পরিচিত হয়েছিলো ফিলিস্তিনে এবং ফনীশীয়রূপে, সিরিয়ার উপকূলভাগে। আবার কখনো কখনো বহিরাগত পশুচারী যাযাবরেরা এতোই দুর্বল ছিলো যে যারা ওদের পূর্বে এসেছিলো তাদেরকে হারাবার শক্তি ওদের ছিলো না; পরিণামে এরা পূর্বাগতদের মধ্যে হারিয়ে যায় অথবা আবাদীরা পিছু হটিয়ে দেয় যাযাবরদেরকে মরুভূমির দিকে, আর এমনিভাবে ওদেরকে বাধ্য করে নতুন পশু চারণের ক্ষেত্র তালাশ করতে এবং সম্ভবত ভিন্ন এলাকা জয় করতে। ইবরাহীমের আসল নাম তৌরাত অনুসারে 'আব্-রাম্', প্রাচীন আরবী ভাষায় যার মানে হচ্ছে সেই ব্যক্তি—যিনি উচ্চাভিলাসী স্পষ্টতই এই ইবরাহীমের কবিলা ছিলো কমজোর গোত্রগুলির একটি। মরুভূমির প্রান্তদেশে উষর অঞ্চলে তাদের বসতি সম্পর্কে বাইবেলে যে কাহিনী আছে তা সেই সময়ের কথাই বর্ণনা করে যখন তারা বুঝতে পেরেছিলো—দোজলা অঞ্চলে নিজেদের জন্য নতুন ঘর খুঁজে পেতে তারা ব্যর্থ হয়েছে—এবং তারা তৈরি হচ্ছিলো, ফোরাতের তীর বরাবর উত্তর-পশ্চিমে হারানের দিকে এবং সেখান হতে সিরিয়ার দিকে, রওনা করার জন্য।

'সেই ব্যক্তি—যিনি উচ্চাভিলাসী'—আমার সেই আদি পূর্বপুরুষ, যাঁকে আল্লাহ্ ঠেলে দিয়েছিলেন অজানা অজ্ঞাত সব এলাকার দিকে, এমনি ক'রে আবিষ্কার করতে নিজের সত্তাকে—তিনি নিশ্চয়ই বুঝতেন, ভালো করেই বুঝতেন, কেন আমি এখানে এসেছি—কারণ, তাঁকেও বহু দেশের মধ্য দিয়ে ছুটাছুটি করতে, ঘোরাফেরা করতে হয়েছে,—নিজের জীবনকে অমন একটি রূপ দিতে পারার আগে যাকে আপনি ধরতে, স্পর্শ করতে পারেন আপনার হাত দিয়ে; বিশেষ এক জায়গায় শিকড় গেড়ে বসার পূর্বে তাঁকেও হতে হয়েছে বহু ঘরের মেহমান। তাঁর সেই যুগপৎ শ্রদ্ধা-ভীতি জাগানো অভিজ্ঞতার কাছে আমার এই তুচ্ছ বিমূঢ়তা কোনো সমস্যাই মনে হতো না। তিনি বুঝতেন যেমন আমি বুঝতে পারছি এখন—আমার ঘুরে বেড়ানোর মানে নিহিত রয়েছে এমন এক জগতের সাথে পরিচিত হয়ে আমার নিজের সাথে পরিচয়ের একটি সুপ্ত বাসনার মধ্যে, জীবনের গভীরতম প্রশ্ন—সকল এবং সত্য-স্বরূপের প্রতি যে-জগতের দিকে অভিগমন, আমি শৈশব ও যৌবনে যা-কিছুর সাথে পরিচিত ও অভ্যস্ত ছিলাম তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

তিন

মধ্য ইউরোপে আমার শৈশব ও যৌবনকাল থেকে আরবে আমার হালের জীবন পর্যন্ত কী সুদীর্ঘ পথ! কিন্তু জীবনের ফেলে আসা এই দিনগুলির স্মৃতিচারণ কতো আনন্দের।

সেই প্রথম শৈশবের দিনগুলি—পোলাণ্ডের ল্বাও নগরী তখনও অস্ট্রিয়ার অধীনে—এমন একটা বাড়িতে কাটানো, যা ছিলো সেই রাস্তাটির মতোই নীরব এবং মর্যাদাপূর্ণ, যার পাশে দাঁড়িয়েছিলো বাড়িটি। লম্বা রাস্তা, কিছুটা ধূলিধূসর অথচ পরিচ্ছন্ন, দু'পাশে সারি সারি চেস্টনাট গাছ, পুরু কাঠের তক্তা বিছানো সেই রাস্তা ঘোড়ার ক্ষুরের ধ্বনিকে চাপা দিয়ে দিনের প্রতিটি মুহূর্তকে রূপান্তরিত করতো অলস বিকালে। আমি ভালোবাসতাম সেই

সুন্দর রাস্তাটিকে এক অদ্ভুত সজ্ঞানতার সংগে, আমার শৈশবের শহরগুলির সাথে—কেবল এ কারণেই নয় যে, রাস্তাটি ছিলো আমার বাড়ির রাস্তা; বরং আমি মনে করি, আমি একে আসলেই ভালোবাসতাম, কারণ একটি মহৎ প্রশান্তির ভাব নিয়ে রাস্তাটি হাসি-খুশিতে উচ্ছ্বসিত শহরের প্রাণচঞ্চল কেন্দ্র থেকে প্রবাহিত হয়েছে শহর-প্রান্তের বনানীর নীরবতার দিকে এবং সেই বনানীতে লুকানো বিশাল গোরস্তানের দিকে। কখনো কখনো সুন্দর সুন্দর গাড়ি নিঃশব্দ চাকার উপরে, ধাবমান ঘোড়ার ক্ষুরের দ্রুত খট্ খট্ খট্ খট্ ছন্দের সাথে তাল মিলিয়ে যেনো উড়ে চলে; আর যদি তা শীতকাল হয় এবং রাস্তাটি ঢাকা পড়ে যায় ফুট-গভীর তুষারে, আর তখন তার উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে শ্লেজ গাড়ি এবং ঘোড়ার নাসা থেকে বেরিয়ে আসে বাষ্প, আর কুয়াশায় ভারাক্রান্ত হাওয়ায় টুঙটুঙ করতে থাকে তাদের ঘণ্টাগুলি আর তুমি যদি নিজেই বসে একটি শ্লেজ গাড়ির ভেতরে এবং অনুভব করো, কুয়াশা তোমার পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে আর তোমার গালে লাগছে তার হিমশীতল পরশ, তোমার শিশুসুলব হৃদয় বুঝতে পারবে—ধাবমান ঘোড়াগুলি এমন এক সুখের দিকে তোমাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে যার আরম্ভ নেই, শেষও নেই।

তারপর, গ্রামাঞ্চলে গ্রীষ্মের সেই মাসগুলি যেখানে আমার এক ধনী ব্যাঙ্কার নানা রেখেছিলেন এক বড় জমিদারী, তাঁর বড় পরিবারের খুশির জন্য। অলস-গতি ছোট্ট একটি নদী বয়ে যেতো, যার দুই পারে ছিলো উইলো গাছের সারি; তারপর, শান্ত-শিষ্ট গবাদিতে ভর্তি সেখানকার গোলাবাড়িগুলি—আর এমন একটি আলো-আঁধারী যা জন্তু-জানোয়ার ও খড়ের গন্ধে ছিলো রহস্যজনকভাবে পূর্ণ, আর রুথেনিয়ো কিষাণ কন্যাদের হাসি, যারা সন্ধ্যাকালে ব্যস্ত থাকতো গাই দোহানে ; সোজা দোনার ভেতর থেকে উষ্ণ ফেনিল দুধ পান করতে পারো তুমি, কেবল তৃষ্ণার্ত বলেই নয়, বরং এখনও যা তার জান্তব উৎসের এতো কাছাকাছি রয়েছে তেমন কিছু পান করাটাই ছিলো উত্তেজনাপূর্ণ। আগস্ট মাসের সেই তপ্ত দিনগুলি, যা আমি কাটিয়েছি মাঠে কামলাদের সংগে, যারা গম কাটছিলো, আর সেই মেয়েদের সংগে যারা সেগুলি একত্র করে আঁটি বাঁধছিলোঃ তরুণী সেই সব নারী, দেখতে সুন্দর, ভারিক্কি দেহ, বুকভরা স্তন আর কঠিন সজীব বাহু, যার শক্তি আমি অনুভব করতাম যখন ওরা দুপুর বেলা খেলাচ্ছলে আমাকে গমের স্তূপের উপরে গড়িয়ে দিতো; অবশ্য, সে সময় আমার বয়স ছিলো এতো অল্প যে ওদের হাস্যমুখর আলিংগনের এর বেশি কোনো অর্থ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

আর আব্বা-আম্মার সাথে আমার ভিয়েনা এবং বার্লিন, আল্পস্ পর্বতমালা এবং বোহেমিয়ার অরণ্যাঞ্চল, উত্তর সমুদ্দুর আর বাল্টিক সফর; স্থানগুলি এতো দূরে দূরে ছিলো যে, মনে হয়েছিলো প্রত্যেকটিই যেনো এক একটি নতুন দুনিয়া। যখনি আমি এ ধরনের সফরে বেরিয়েছি, ট্রেনের ইঞ্জিনের প্রথম হুইশল এবং তার চাকার প্রথম ঝাঁকুনির সংগে সংগে যে নয়া-নয়া বিস্ময় উদ্ঘাটিত হতে যাচ্ছে আমাদের নিকট, তারই কল্পনায় যেনো থেমে যেতো আমার হৃদ-স্পন্দন!

...তা ছাড়া ছিলো অনেক খেলার সাথী—ছেলে এবং মেয়েরা, একটি ভাই ও একটি বোন এবং বহু চাচাতো-খালাতো-মামাতো-ফুফাতো ভাই-বোন এবং হপ্তার ইস্কুলের দিনগুলির নিরানন্দতার পর...যা খুব পীড়াদায়ক ছিলো না, সেই উজ্জ্বল স্বাধীন

রোববারগুলি; গ্রামাঞ্চলে ছুটাছুটি করে বেড়ানো, আমার নিজের বয়সী সুন্দর বালিকাদের সাথে আমার প্রথম গোপন সাক্ষাতকার এবং অদ্ভুত এক উত্তেজনায় লাল হয়ে ওঠা, যা কাটিয়ে উঠতে আমার লাগতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা...

এই শৈশব ছিলো সুখের—অতীতের হলেও তৃপ্তিকর। আব্বা-আম্মার জীবন ছিলো আরাম-আয়েশের জীবন, বলা যায় তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্যই জীবন ধারণ করেছেন। পরবর্তী বছরগুলিতে অপরিচিত এবং কখনো প্রতিকূল অবস্থার সাথে আমি যে সহজভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছি, তার মূলে থাকতে পারে আমার আম্মারই প্রশান্তির এবং অবিচলিত নীরবতার কিছু-না-কিছু প্রভাব—অন্যদিকে আমার আব্বার মানসিক চঞ্চলতা হয়তো প্রতিফলিত হয়েছে আমার অস্থির প্রকৃতিতে....

আমাকে যদি আমার আব্বার বর্ণনা করতে হয়, আমি বলবো, এই সুন্দর, ছিপছিপে, মাঝারি আকৃতির গাঢ় রঙের মানুষটির—যাঁর চোখ দুটি ছিলো কালো এবং ব্যগ্র,—পরিবেশের সাথে খুব মিল ছিলো না। যৌবনের প্রথমদিকে তিনি স্বপ্ন দেখতেন বিজ্ঞান চর্চা করবেন—বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করবেন। কিন্তু তাঁর এই স্বপ্ন তাঁর জীবনে সফল হয়নি। তিনি ব্যারিস্টার হয়েই খুশি থাকতে বাধ্য হন। অবশ্য তাঁর এই পেশায় তিনি বেশ সফলই হয়েছিলেন, কারণ তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যগ্র মনের জন্য এ পেশা হয়তো একটা চ্যালেঞ্জের মতন ছিলো। তবু আব্বা কখনো এই পেশাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁকে ঘিরে জেঁকেছিলো যে একাকীত্বের একটি ভাব, তার মূলে হয়তো ছিলো হামেশা-বিদ্যমান এই সচেতনতা যে, তাঁর সত্যিকার পেশা তাঁকে ছলনা করেছে।

আমার আব্বার আব্বা ছিলেন তখনকার দিনের অস্ট্রীয় প্রদেশ বুকোভিনার রাজধানী জার্নোবিৎসের এক গোঁড়া রাব্বী তথা ইহুদী মোল্লা। আমার এখনো মনে পড়ে—বুড়ো ছিলেন খুবই সুন্দর, তাঁর হাত দুটি ছিলো নরম মোলায়েম এবং লম্বা, সাদা দাড়ির ফ্রেমের মধ্যে আঁটা ছিলো তাঁর উৎসুক অনুভূতিময় মুখখানা। তিনি তাঁর অবসর সময়ে সারাজীবন ধরেই গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন; এই দুই শাস্ত্রে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিলো। তাছাড়া তিনি ছিলেন সেই এলাকার সেরা দাবাড়ে—আর এটাই হয়তো ছিলো...গোঁড়া গ্রীক আর্কবিশপের সাথে তাঁর সুদীর্ঘ বন্ধুত্বের বুনিয়াদ, কারণ, আর্কবিশপ নিজেও ছিলেন একজন নামকরা দাবাড়ে। দুই বুড়ো সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা কাটাতেন দাবার ছক নিয়ে, তাদের আসর শেষ হতো নিজ নিজ ধর্মের তূরীয় প্রতিজ্ঞাগুলির আলোচনায়। অনেকে মনে করতে পারে, এ ধরনের মানসিক প্রবণতা নিয়ে আমার দাদার পক্ষে আমার আব্বার বিজ্ঞানমুখিতাকে অভিনন্দিত করাই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু মনে মনে তিনি শুরু থেকেই সিদ্ধান্ত করেন, তাঁর পয়লা পুত্র অনুসরণ করবে ইহুদী রাব্বীর ঐতিহ্য, যা ছিলো তাঁদের পরিবারের কয়েক পুরুষের পুরোনো ঐতিহ্য। আমার আব্বার জন্য অন্য কোনো পেশার কথা বিবেচনা করে দেখতেও তিনি রাজী ছিলেন না। তাঁর এই প্রতিজ্ঞা হয়তো আরো মজবুত হয়েছিলো পারিবারিক আলমারিতে রক্ষিত একটি কলংকজনক কংকালের দ্বারা; তাঁর এক চাচার অর্থাৎ আমার পর-দাদার এক ভাই-এর স্মৃতি, যিনি অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে 'ভংগ করেছিলেন' পারিবারিক ঐতিহ্য—এমনকি, তাঁর পিতৃপুরুষের ধর্মকেও পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন।

মনে হয়, পর-দাদার সেই প্রায়-উপকথার ভাই,—যাঁর নাম কখনো সশব্দে উচ্চারিত হতো না এ পরিবারে—মানুষ হয়েছিলেন একই পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যে। অতি তরুণ বয়সে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন পুরো রাব্বী আর এমন এক রমণীর সাথে সেই বয়সেই তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছিলো যাকে তিনি ভালোবাসতেন বলে মনে হয় না। সেকালে রাব্বীর পেশার মাইনে খুব বেশি ছিলো না। তাই তিনি আয় বৃদ্ধির জন্য পশমের ব্যবসা করতেন, আর এজন্য প্রতি বছর তাঁকে যেতে হতো ইউরোপের কেন্দ্রীয় পশমের বাজার লীপ্‌জিগে। যখন তাঁর বয়স প্রায় পঁচিশ বছর, তখন তিনি ঘোড়ার গাড়িতে করে এ ধরনের এক দীর্ঘ সফরে বেরিয়ে পড়েন। সে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কথা; সেবারো তিনি লীপ্‌জিগে গিয়ে তাঁর পশম বিক্রি করেন; কিন্তু তিনি ঘরে না ফিরে তাঁর গাড়ি এবং ঘোড়া দুই-ই বিক্রি করে দিলেন। তারপর, দাড়ি আর জুলফি চেছে ফেলে দিয়ে, যে স্ত্রীকে তিনি ভালোবাসাতেন না তাকে ভুলে গিয়ে চলে যান ইংল্যাণ্ডে। কিছুদিন তিনি তাঁর দিন-গুজরান করেন গতর খাটিয়ে, সন্ধ্যাকালে তিনি অধ্যয়ন করতেন জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গণিতশাস্ত্র। তাঁর কোনো এক পৃষ্ঠপোষক তাঁর জোহেনের পরিচয় পেয়েছিলেন ব'লে মনে হয়—তিনিই অক্সফোর্ডে তাঁর পড়াশোনা চালাবার ব্যবস্থা করে দেন! অক্সফোর্ড থেকেই কয়েক বছর পরে আমার পর-দাদার ভাই বেরিয়ে আসেন এক প্রতিশ্রুতিশীল পণ্ডিত এবং নও-খৃষ্টানরূপে। তাঁর ইহুদী স্ত্রীর নিকট তালাকনামা পাঠাবার কিছু পরেই তিনি বিয়ে করেন অ-ইহুদীদের এক বালিকাকে। তাঁর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে আমাদের পরিবারে বিশেষ কিছু জানা যায়নি—তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসাবে বেশ খ্যাতি অর্জন করেন এবং নাইট হিসাবে ইন্তেকাল করেন, কেবল এটুকুই জানা গিয়েছিলো।

মনে হয়, এই ভয়ংকর দৃষ্টান্তই, 'জাহিলদের' বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য আমার আব্বার যে আগ্রহ ছিলো তার প্রতি আমার দাদার মনোভাবকে এতো অনমনীয় করে তোলে। তাঁকে একজন রাব্বী হতে হবে—এবং এই শেষ কথা! অবশ্যি আমার আব্বা এতোটা সহজেই হাল ছেড়ে দেবার জন্য তৈরি ছিলেন না। দিনের বেলা তিনি পড়তেন 'তালমুদ'—কিন্তু রাতের বেলা লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি পড়তেন কোনো শিক্ষকের সাহায্য না নিয়েই,—মানবতামূলক 'মাধ্যমিক কারিকুলাম'। পরে তিনি তাঁর মার কাছে তা খুলে বলেন। তাঁর পুত্রের গোপন পড়াশোনায় তিনি হয়তো মনে কষ্ট পেয়ে থাকবেন, তবু তিনি তাঁর মহৎ প্রকৃতির দরুন বুঝতে পারেন, পুত্রকে তাঁর অন্তরের ইচ্ছা মতো কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা খুবই নির্দয় কাজ হবে। বাইশ বছর বয়সে, আট বছরের 'মাধ্যমিক' কোর্স চার বছরে শেষ করে আমার আব্বা বি. এ. পরীক্ষার জন্য তৈরি হন এবং কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। এই ডিগ্রী নিয়ে তিনি এবং তাঁর আম্মা আমার দাদার কাছে ভয়ংকর খবরটি প্রকাশ করার জন্য সাহস করে তৈরি হলেন। এর ফলে যে নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হয় তা আমি অনুমান করতে পারি। কিন্তু এর পরিণতি এই হলো যে আমার দাদা শেষতক নরম হয়ে পড়েন এবং রাজী হয়ে গেলেন, আমার আব্বা আর রাব্বীর পড়শোনা করবেন না, তার বদলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়বেন। অবশ্যি, পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন ছিলো না যে তিনি তাঁর প্রিয় বিষয় 'পদার্থ বিজ্ঞান' অধ্যয়ন করতে পারেন। এ জন্য তিনি এর চাইতে অধিকতরো অর্থকরী একটি পেশা—আইনজীবীর পেশার আশ্রয় নেন এবং

যথাসময়ে একজন ব্যারিস্টার হয়ে বের হয়ে আসেন। কয়েক বছর পর তিনি পূর্ব গ্যালিসিয়ার ল্বাও শহরে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানেই স্থানীয় একজন ধনী ব্যাংকারের চার কন্যার অন্যতমা—আমার আম্মাকে শাদি করেন। সেখানে ১৯০০ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁদের তিনটি সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তানরূপে আমি জন্মগ্রহণ করি।

আমার আব্বার ব্যর্থ বাসনার প্রকাশ ঘটে বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি নিয়ে তাঁর ব্যাপক পড়াশোনায় এবং হয়তো তাঁর এই দ্বিতীয় পুত্রের—অর্থাৎ আমার প্রতি তাঁর অদ্ভুত অথচ খুবই চাপা পক্ষপাতিত্বে। মনে হয়, আমিও সেই সব বিষয়ের প্রতিই বেশি অনুরাগী ছিলাম যার সংগে কোনো সম্পর্ক ছিলো না আশু অর্থ-উপার্জনের এবং সফল 'কর্ম-জীবনে'র। তা সত্ত্বেও তিনি যে আমাকে একজন বৈজ্ঞানিক বানাবার স্বপ্ন দেখতেন তা পূরণ হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিলো না। আমি বোকা না হলেও, ছাত্র হিসাবে ছিলাম খুবই উদাসীন প্রকৃতির। গণিতশাস্ত্র এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি ছিলো আমার কাছে বিরক্তিকর। আমি অপরিসীম আনন্দ পেতাম সিয়েন্‌কীবিজের উত্তেজনাকর ঐতিহাসিক রোমান্সগুলি পড়তে, জুল ভার্নের উদ্ভট কাহিনী, জেম্‌স ফেনিমোর কুপার এবং কার্ল মে'-এর রেড ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে লেখা গল্প এবং পরে রিলকের কবিতা ও গভীর উদাত্ত ছন্দে রচিত 'অলসো স্প্রাখ জরথুস্ত্র' পাঠ করতে। লাতিন এবং গ্রীক ব্যাকরণের মতোই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও বিদ্যুতের রহস্য আমাকে উৎসাহিত করতো না মোটেই। এর ফলে, প্রতিবারই আমি পরীক্ষায় ফেল করতে করতে প্রমোশন পেয়েছি। নিশ্চয়ই আমার আব্বার জন্য এ ছিলো তীব্র নৈরাশ্যের ব্যাপার। কিন্তু খুব সম্ভব, এ বিষয়ে তিনি সান্ত্বনা বোধ করে থাকবেন যে, আমার ওস্তাদেরা পোলিশ ও জার্মান সাহিত্য এবং ইতিহাসের প্রতি আমার ঝোঁক দেখে খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন।

আমার পারিবারিক ঐতিহ্যের অনুসরণে আমি ঘরেই ওস্তাদের কাছে হিব্রু ধর্মে পুরাদস্তুর ইলম হাসিল করি। এর কারণ, আমার আব্বা-আম্মার প্রকাশ্য ধার্মিকতা নয়। ওঁরা ছিলেন এমন এক জামানার মানুষ যখন মানুষ পূর্বপুরুষদের জীবন যে ধর্ম-বিশ্বাসগুলি দ্বারা গঠিত হয়েছিলো সেগুলির কোনো-না-কোনোটির প্রতি কেবল মৌখিক আনুগত্যই প্রকাশ করতো; সে ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী তার ব্যবহারিক, এমনকি নৈতিক চিন্তাকেও গড়ে তোলার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও কেউ করতো না। এহেন সমাজে ধর্মের ধারণারই অবনতি ঘটেছিলো, নিম্নেবর্ণিত দুটির একটিতে—সেই সব লোকের নীরস প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতায়—যারা কেবল অভ্যাসবশে, কেবল অভ্যাসেরই বশে...তাদের ধর্মীয় উত্তরাধিকারকে আঁকড়ে ধরেছিলো—কিংবা অধিকতরো 'সংস্কারমুক্তদের উন্নাসিক উদাসীনতায়, যারা মনে করতো ধর্ম একটি জরাজীর্ণ কুসংস্কার বিশেষ, মানুষ যার সাথে মাঝে মাঝে বাহ্যিক খাপ খাইয়ে চলতে পারে, কিন্তু যার সম্পর্কে সে মনে মনে শরমিন্দা, বুদ্ধি দিয়ে তাকে সমর্থন করা যায় না ব'লে। সকল দিক দিয়েই, আমার আব্বা-আম্মা ছিলেন প্রথমোক্ত দলের মানুষ। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে এই ক্ষীণ সন্দেহ জাগে—অন্ততপক্ষে আমার আব্বার ঝোঁক ছিলো দ্বিতীয় দলটিরই দিকে। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর আব্বা ও শ্বশুরকে খুশি করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন—আমাকে দীর্ঘক্ষণ ধরে ধর্মীয় কিতাবগুলি পড়তে হবে। এভাবে বারো তেরো বছর বয়সে আমি যে কেবল খুব

ফুটপাতেই হোক ঃ একজন মানুষ যার নিজেকে নিয়ে কোনো নালিশ নেই—শান্ত এবং তৃপ্ত!

* * * * * * *

মামা ডোরিয়ান আমাকে যে 'আরব পাথুরে ঘরের' কথা লিখেছিলেন তা ছিলো সত্যি আনন্দদায়ক। বাড়িটি ছিলো 'প্রাচীন নগরীর' কিনারে, 'জাফা-দরোজার' কাছে। এর প্রশস্ত, উঁচু সিলিং-বিশিষ্ট কোঠাগুলি, অতীতের বিভিন্ন জামানায় যেসব অভিজাত এখানে বসবাস করতেন, তাঁদেরই স্মৃতিতে যেনো ভারাক্রান্ত—আর এর দেয়ালগুলির নিকটবর্তী বাজার থেকে ভেঙে-পড়া জীবন্ত বর্তমানের স্পন্দনে স্পন্দিত। আর সে সব দৃশ্য, ধ্বনি আর গন্ধ এমনি যার সংগে আমার অতীতের অভিজ্ঞতার কোনো মিলই নেই।

ছাতের চত্বর থেকে আমি দেখতে পেলাম—সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত প্রাচীন নগরীর এলাকা—জালের মতো ছড়ানো তার অনিয়মিত পথ-ঘাট আর পাথরে খোদাই অলি-গলিসহ। অপর প্রান্তে রয়েছেন, বিশাল বিস্তৃতির বিচারে অনেক কাছে, সুলায়মানের মসজিদ—এলাকা, আর রয়েছে একেবারে শেষ সীমানায় মসজিদুল আক্‌সা যা মক্কা মদীনার পরেই সবচেয়ে পবিত্র বলে গণ্য, আর ঠিক মাঝখানটায় রয়েছে, 'পাথুরে গম্বুজ'। তার ওপাশে প্রাচীন নগরীর দেয়ালগুলি প্রসারিত রয়েছে কিদ্‌রণ উপত্যকার দিকে আর উপত্যকার ওপাশে জেগে উঠেছে মোলায়েম মসৃণ লতা-পাতাশূন্য পাহাড়—কেবল পাহাড়ের ঢালুগুলিই এখানে-ওখানে জলপাই গাছের দ্বারা চিহ্নিত। পূর্বদিকে এর চেয়ে কিছুটা উর্বরতার চিহ্ন মেলে; ওদিকেই দেখতে পেলাম একটা বাগিচা, ঢালু হয়ে নেমে এসেছে রাস্তার দিকে, গাঢ় সবুজ সে বাগিচা আর দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এটি হচ্ছে 'জেথ্‌সিমেনের উদ্যান'। এরি মধ্য থেকে একদিকে জলপাই ও অপরদিকে সাইপ্রেস গাছের মধ্যে সোনালী, পেঁয়াজের আকারের রুশ গির্জার গম্বুজগুলি ঝলমল করছে।

এ যেনো, কিমিয়াগরের বক্-যন্ত্রে আন্দোলিত কম্পিত ঢালাই তরল পদার্থ, পরিষ্কার অথচ অবর্ণনীয়, হাজারো রঙে বিচিত্র, যা শব্দের অতীত, এমনকি, চিন্তারও আয়ত্তাতীত। এ রকমই আমার মনে হতো জলপাই পর্বত থেকে জর্ডান উপত্যকা আর মৃত-সাগরকে। ঢেউ-খেলানো পাহাড় আর দুগ্ধ-শুভ্র উজ্জ্বল পটভূমিকায় যেনো রুদ্ধশ্বাসের মতো অংকিত; তার সংগে জর্ডান নদীর গাঢ়-নীল রেখা এবং দূরে মৃত-সাগরের গোল আবর্ত এবং আরো দূরে, যেনো নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরেকটি জগৎ, প্রদোষ-মগ্ন মোআব গিরিশ্রেণী—এমন একটি অবিশ্বাস্য, বিচিত্র রূপময় সৌন্দর্য-চিত্র যে, আমার অন্তর তাতে উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করতো।

আমার কাছে জেরুজালেম ছিলো একটি সম্পূর্ণ নতুন দুনিয়া। 'পুরোনো নগরী'র প্রত্যেকটি স্থান থেকে জেগে উঠতো কতো ঐতিহাসিক স্মৃতি ঃ সেই সব রাস্তা, যারা শুনেছে ইশায়াকে প্রচার করতে, সেই সব খোয়া যার উপর দিয়ে হযরত ঈসা (আ) হাঁটতেন, সেই সব প্রাচীর যা পুরোনো হয়ে গিয়েছিলো যখন রোমান সৈনিকদের ভারি পদক্ষেপ প্রতিধ্বনিত হতো সেগুলি থেকে, আর দরোজার উপরের খিলান, যাতে খোদাই রয়েছে সালাহুদ্‌দীনের আমলের লিপি। আসমান ছিলো গাঢ় নীল, যা ভূমধ্যসাগরীয়

অন্যান্য দেশকে যারা জানে তাদের কাছে হয়তো নতুন মনে হতো না। কিন্তু আমার কাছে—যেহেতু আমি বেড়ে উঠেছি অনেক কম-বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায়—এই নীল ছিলো যুগপৎ একটি আহ্বান ও একটি প্রতিশ্রুতি। বাড়ি-ঘর আর রাস্তাঘাটগুলি যেনো কাঁপতে থাকা একটা কোমল উজ্জ্বলতায় মোড়ানো, আর লোকজনের চলন-বলন স্বতস্ফূর্ত, জড়তামুক্ত, অংগভংগী সম্ভ্রম ও আভিজাত্যপূর্ণ—আর লোকজন মানেই এখানকার আরবেরা,—কারণ ওরাই শুরু থেকে আমার চেতনায় ছাপ এঁকে দিয়েছিলো এদেশের মানুষ হিসাবে—এদেশেরই মাটি আর ইতিহাস থেকে তা জন্ম লাভ করেছে এবং এখানকার আলো-বাতাসের সাথে ওরা আছে এক হয়ে। ওদের পোশাক-পরিচ্ছদ বিচিত্র, বর্ণাঢ্য, বাইবেলী বর্ণনার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার তাদের পরনের কাপড়ের; 'ফেলাহ' হোক, আর বদ্যু হোক—কারণ, আমি প্রায়ই দেখতাম বদ্যা শহরে আসছে জিনিস-পত্র কেনা-বেচা করার জন্য প্রত্যেকেই তাদের কাপড়-চোপড় পরে নিজের মতো করে, সবসময়ই অন্যদের থেকে কিছুটা আলাদা, যেনো মুহূর্তের প্রেরণায় সে একটা নেহাৎ-নিজস্ব ফ্যাশন উদ্ভাবন করেছে।

ডোরিয়ানের বাড়ির সামনেই, সম্ভবত চল্লিশ গজের মতো দূরেই দাউদের কেল্লার খাড়া কাল-জীর্ণ প্রাচীরগুলি উঠেছে—এই কেল্লাটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের অংশবিশেষ; এটি একটি খাঁটি মধ্যযুগীয় আরব নগর-দুর্গ, আর সম্ভবত এটি তৈরি হয়েছিলো হিরোদীয় আমলের বুনিয়াদের উপরে; এর প্রহরা-কক্ষটি মিনারের মতো উঁচু আর সংকীর্ণ। (বাদশাহ্ দাউদের সাথে এর প্রত্যক্ষ কোনো যোগ না থাকলেও ইহুদীরা সবসময়েই একে এ নামেই অভিহিত করেছে; কারণ, বলা হয়, এখানে 'জিওন' পাহাড়ের উপরেই পুরানো শাহী প্রাসাদ ছিলো অবস্থিত)। 'প্রাচীন নগরী'টির দিকে রয়েছে একটি নীচু প্রশস্ত দালান, যার ভেতর দিয়ে চলে গেছে প্রবেশ দরোজাটি আর দরোজার সম্মুখে পুরোনো পরিখাটির উপরই রয়েছে পাথরে তৈরি ধনুকের মতো বাঁকা তোরণ—একটি পুল। বদ্যুরা যখন শহরে আসে তখন এই পথটিকে ওরা নিয়মিত ব্যবহার করে ওদের মিলনের জায়গারূপে। একদিন আমি দেখতে পেলাম—এক দীর্ঘ-দেহ বদ্যু সেখানে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে, রূপালী ধূসর আসমানের পটভূমিকায় একটি দেহাকৃতি, যেনো প্রাচীন কোনো উপকথার এক মূর্তি। ছোট্ট লাল-বাদামী দাড়ির ফ্রেমে, ধারালো চোয়াল-মুখমণ্ডলে একটি গভীর গাম্ভীর্যের অভিব্যক্তিঃ বিষণ্ন মলিন মুখমণ্ডল—যেনো সে কোনো কিছুর প্রত্যাশা করছে, অথচ ভাবতে পারছে না যে, সত্যি তা ঘটবে। তার গায়ের চওড়া বাদামী-সাদা ডোরাওয়ালা আল্‌খিল্লাটি জীর্ণ এবং ছেঁড়া! আর হঠাৎ আমার মনে হলো, কেন মনে হলো জানি না, এ আল্‌খিল্লাটি লোকটির গায়ে রয়েছে বহু মাস ধরে বিপদ আর পালিয়ে বেড়ানোর বহু মাস—ও কি তা হলে সেই ক'জন যোদ্ধারই একজন, যারা হযরত দাউদের অনুগমন করেছিলো যখন দাউদ তাঁর রাজা সলের ভয়ংকর ঈর্ষা থেকে বাঁচবার জন্য পালিয়েছিলেন, হয়তো এই মুহূর্তে কোথাও জুদী পাহাড়ের কোলে এ গুহায় লুকিয়ে ঘুমিয়ে আছেন দাউদ, আর এই বিশ্বস্ত ও সাহসী বন্ধুটি একজন সংগী নিয়ে চুপি চুপি এই রাজধানী শহরে এসেছে দেখতে—'সল' তাদের নেতা সম্পর্কে কী ভাবেন আর তাঁর জন্য ফিরে

আসা নিরাপদ কি না এবং এখন, এই মুহূর্তে, দাউদের এই বন্ধুটি এখানে অপেক্ষা করছে তার সংগীটির জন্য, সমূহ অমংগলের আশংকা নিয়ে ঃ ওরা হয়তো খোশ-খবর নিয়ে যেতে পারবে না দাউদের কাছে...

হঠাৎ বদ্যুটি নড়ে ওঠে এবং ঢালু বেয়ে নীচুতে নামতে শুরু করে আর আমার স্বপ্ন-কল্পনা টুটে যায়। তখন, সহসা আমার মনে পড়লোঃ এই লোকটি হচ্ছে একজন আরব, আর ওরা, বাইবেলের সেই মূর্তিগুলি ছিলো ইহুদী। কিন্তু আমার এই বিস্ময় কেবল মুহূর্তকাল স্থায়ী হলো, কারণ, অকস্মাৎ আমি বুঝতে পারলাম সেই স্বচ্ছতার সংগে যা হঠাৎ বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো কখনো কখনো আমাদের অন্তরে ঝলসে ওঠে এবং পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করে দেয় হৃদয়ের একটি মাত্র স্পন্দন-কালের জন্য সেই স্বচ্ছতার সংগে আমি বুঝতে পারলাম—দাউদ এবং দাউদের সময় ইবরাহীম ও ইবরাহীমের সময়ের মতোই তাদের আরব উৎসমূলের অনেক কাছে, আর সে কারণে, আজকের বেদুঈনদেরও তা নিকটতরো আজকের ইহুদীদের চাইতে—যাঁরা নিজেদেরকে মনে করে দাউদ ও ইবরাহীমের খান্দান বলে...

আমি প্রায়ই বস্‌তাম জাফা-দরোজার নীচে, পাথর নির্মিত সূঁচালো স্তম্ভটির উপর এবং দেখতাম দলে দলে মানুষ প্রাচীন নগরীতে ঢুকছে আর সেখান থেকে বের হচ্ছে, সবাই একে অপরের সাথে গা ঘষতে ঘষতে, একে অপরকে কুনইয়ের ধাক্কা দিতে দিতে চলছে—আরব এবং ইহুদী যতো রকমের হতে পারে, সকলেই। এদের মধ্যে রয়েছে শক্ত হাড়ডিওয়ালা 'ফেলাহীন'; মাথায় বাদামী রঙের কাপড় অথবা কমলা-রঙের পাগড়ি; আরো রয়েছে বেদুঈনেরা, মুখমণ্ডল, তাদের তীক্ষ্ম, পরিচ্ছন্ন এবং প্রায় সব সময়ই কৃশ; ওরা আল্‌খিল্লা পরে এক আশ্চর্য আত্মস্থ ভংগীতে, প্রায়ই দু'হাত নিতম্বের উপর রেখে কনুই প্রসারিত করে দিয়ে, যেনো তারা নিশ্চিত যে, প্রত্যেকেই ওদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেবে। ওদের মধ্যে কিষাণ রমণীদেরও দেখতাম ঃ কালো বা নীল রঙের সূতী বস্ত্র গায়ে, বুকের উপর সাদা সূতায় ফুল তোলা; প্রায়ই ওদের মাথায় থাকতো জুড়ি এবং ওরা চলতো একটা নম্র, সহজ সুন্দর গতিচ্ছন্দে। পেছন দিক থেকে তাকিয়ে অনেক ষাট বছরের রমণীকেও মনে হতো রমণী। ওদের চোখের দৃষ্টি মনে হতো পরিষ্কার এবং বয়সের প্রভাব-মুক্ত—যদি না ওরা আক্রান্ত হতো 'ট্রাকোমা' দ্বারা—এটি একটি দুরারোগ্য মিসরীয় চক্ষুরোগ, যা ভূমধ্যসাগরের পূর্বের সকল দেশের জন্যই এক অভিশাপ বিশেষ।

এবং ইহুদীদেরও দেখতাম ঃ স্থানীয় ইহুদী, যারা পরতো 'তারবুশ,' আর চওড়া, বিশাল আলখিল্লা, মুখাকৃতির দিক দিয়ে যাদের গভীর মিল রয়েছে আরবদের সাথে ; পোলাণ্ড আর রাশিয়া থেকে এসেছে যে ইহুদীরা, তারা তাদের অতীত ইউরোপীয় জীবনের এতো ক্ষুদ্রতা আর সংকীর্ণতা নিয়ে এসেছে সাথে করে যে ভাবতে আশ্চর্য লাগে, তারা দাবি করে তারা আর মরক্কো ও তিউনিসিয়ার সাদা বার্নাস পরিহিত গর্বিত ইহুদীরা একই বংশের লোক। তবু, ইউরোপীয় ইহুদীরা তাদের চারপাশের চিত্রের সংগে স্পষ্টই বেমানান হলেও ইহুদী জীবন ও রাজনীতির সুর এবং মেজাজ তারাই সৃষ্টি করে, আর এ কারণে, আরব ও ইহুদীদের মধ্যে প্রায় দৃশ্যমান মন-কষাকষির জন্য ওরাই দায়ী।

ঐ সময়ে একজন সাধারণ ইউরোপীয় কতোটুকু জানতো আরবদের সম্বন্ধে? আসলে কিছুই না। সে নিকট প্রাচ্যে আসার সময় সংগে বয়ে নিয়ে আসতো কতকগুলি রোমান্টিক এবং ভ্রান্ত ধারণা এবং যদি-সদিচ্ছা থাকতো এবং বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে যদি সে সৎ হতো, তা' হলে তাকে স্বীকার করতেই হতো যে, আরবদের সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞানই নেই। ফিলিস্তিনে আসার আগে আমি তো কখনো এ দেশকে আরবদেশ বলে ভাবিনি। অবশ্য, আমার এ অস্পষ্ট ধারণা হয়েছিলো যে, এখানে 'কিছু সংখ্যক' আরবও বাস করে—তবে ওদের আমি কল্পনা করেছিলাম কেবল মরুভূমির তাঁবুর বাসিন্দা যাযাবর এবং স্নিগ্ধ মরূদ্যানের বাসিন্দারূপে। ফিলিস্তিন সম্পর্কে এর আগে আমি যা কিছু পড়েছি সবই জিওনিস্টদের লেখা; স্বভাবতই এবং কেবল নিজেদের দৃষ্টিভংগীতেই ওরা লিখে থাকে। তাই আমি বুঝতে পারিনি যে, শহরগুলিও আরবদের দ্বারা পূর্ণ, বুঝতে পারিনি যে, আসলে ১৯২২ সনেও ফিলিস্তিনে যেখানে ইহুদী ছিলো একজন, সেখানে পাঁচজন ছিলো আরব, সে কারণে ফিলিস্তিন যতোটা না ইহুদীদের দেশ তার চাইতে বহু–বহু গুণে বেশি আরবদেরই দেশ!

আমি যখন জিওনিস্ট সংগ্রাম কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ উসীশকিনের নিকট এ বিষয়ে মন্তব্য করলাম, আমার মনে হলো, জিওনিস্টরা আবরদের এই সংখ্যাগুরুত্বের সত্যটিকে বিবেচনা করে দেখতেও রাজী নয়। জিওনিজমের বিরুদ্ধে আরবদের বিরোধিতাকে তারা কোনো গুরুত্ব দিতেই তৈরি নয়। মিঃ উসীশ্‌কিনের প্রতিক্রিয়া আরবদের প্রতি ঘেন্না ও তাচ্ছিল্য ছাড়া আর কিছুই মনে হলো না ঃ

—'এদেশে আমাদের বিরুদ্ধে আরবদের সত্যিকার কোনো আন্দোলনই নেই—অর্থাৎ, এমন কোনো আন্দোলনই নেই যার মূল রয়েছে জনতার মধ্যে। যাকে আপনি বিরোধিতা মনে করছেন এ সবই আসলে কতিপয় অসন্তুষ্ট এজিটেটরের চিৎকার মাত্র। নিজে নিজেই তা ভেঙে পড়বে কয়েক মাসেই—বড়জোর কয়েক বছরেই।'

তাঁর এ যুক্তি আমার কাছে মোটেই সন্তোষজনক মনে হলো না। শুরু থেকেই আমার মনে হচ্ছিলো ফিলিস্তিনে ইহুদী বসতি স্থাপনের গোটা ধারণাটি কৃত্রিম, অবাস্তব আর তার চাইতে বিপদের কথা—এতে করে, ইউরোপীয় জীবনের সকল জটিলতা ও অসমাধ্য সমস্যা এমন একটি দেশে আমদানি হওয়ার আশংকা রয়েছে যা হয়তো এ সবকে বাদ দিয়েই অধিকতরো সুখী থাকতে পারে। ফিলিস্তিনে ইহুদীরা সত্যি এমনভাবে আসছিলো না যাকে বলা যেতে পারে প্রত্যাবর্তন, বরং তারা, ফিলিস্তিনকে ইউরোপীয় লক্ষ্য নিয়ে ইউরোপীয় ছকে স্বদেশে পরিণত করার জন্যই মরিয়া হয়ে উঠেছিলো। অল্প কথায় ওরা হচ্ছে দরোজায় প্রবিষ্ট বিদেশী। তাই নিজেদের মাঝখানে ইহুদীদের একটি স্বদেশের ধারণার বিরুদ্ধে আরবদের দৃঢ় বিরোধিতায় আমি আপত্তির কিছুই খুঁজে পাইনি। বরং আমি শীগ্‌গীরই বুঝতে পারলাম, জোর করে একটি ইহুদী রাষ্ট্র চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে আর এর বিরুদ্ধে আরবরা সংগতভাবেই সংগ্রাম করে চলেছে।

১৯১৭ সনের ব্যালফোর ঘোষণায়, ফিলিস্তিনে একটি ইহুদী 'জাতীয় আবাসে'র ওয়াদা করা হয়। আমি এই ঘোষণায় দেখতে পেলাম একটি নিবিড় রাজনৈতিক চাল,

সকল ঔপনিবেশিক শক্তিই যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। চালটি হচ্ছে ভেদনীতির মাধ্যমে কোনো দেশ শাসনের বহু পুরোনো নীতি। ফিলিস্তিনের বেলায় এই নীতিটি ছিলো আরো নির্লজ্জ। কারণ, ১৯১৬ সনে তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্যের প্রতিদান হিসাবে ইংরেজরা তখনকার মক্কার শাসক শরীফ হোসেনকে একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। কথা ছিলো, ভূমধ্যসাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্তী সব ক'টি দেশ নিয়ে গঠিত হবে এ রাষ্ট্র। ইংরেজরা যে কেবল এক বছর পরই ফ্রান্সের সাথে সাইফ-পিক্ট চুক্তি করে (যাতে ক'রে লেবানন ও সিরিয়ার উপর ফরাসী প্রভুত্ব কায়েম হয়) সে ওয়াদা খেলাফ করে তা নয়, বরং আরবদের ব্যাপারে ওরা যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলো কার্যত ফিলিস্তিনকে তার আওতা থেকেও বাদ দেয়া হয়।

নিজে ইহুদী খান্দানের লোক হলেও শুরু থেকেই আমি জিওনি-নিজমের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড আপত্তি অনুভব করি। আরবদের প্রতি আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতির কথা বাদ দিলেও বিদেশী বৃহৎ শক্তির সাহায্যে বহিরাগতরা বাইরে থেকে এ দেশে আসবে সংখ্যা গুরুত্ব অর্জনের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য নিয়ে আর এভাবে একটা জাতিকে উচ্ছেদ করবে তার দেশ থেকে, যে-দেশ স্মরণাতীতকাল থেকে বরাবরই তারই দেশ—ব্যাপারটি আমার কাছে ঘোর নৈতিকতা-বিরুদ্ধ বলে মনে হলো। তাই আরব-ইহুদী সমস্যা নিয়ে যখনি কোনো কথা ওঠে আমি স্বভাবতই আরবদের পক্ষ নিই। আর এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতো প্রায়ই। এ মাসগুলিতে যে-সব ইহুদীর সংস্পর্শে আমি আসি তাদের প্রায় সকলেই আমার মনোভাব বুঝতে ছিলো অপারগ। আমি আরবদের মধ্যে যা দেখেছি তা ওরা বুঝতে পারতো না। ওদের মতে, আরবরা এক পশ্চাদ্‌পদ জনগোষ্ঠী ছাড়া আর কিছুই নয়। অমন এক মনোভাব নিয়ে ওরা আরবদের প্রতি তাকাতো যা মধ্য আফ্রিকার ইউরোপীয় আবাদীদের মনোভাবের থেকে খুব আলাদা নয়। আরবরা কী ভাবছে এ নিয়ে ওদের মোটেই কোনো মাথাব্যথা ছিল না। ওদের প্রায় কেউই আরবী শেখার কোনো চেষ্টা করতো না, আর সকলেই বিনাদ্বিধায় এই আপ্তবাক্য গ্রহণ করেছিলো যে, ফিলিস্তিন হচ্ছে ইহুদীদেরই ন্যায্য উত্তরাধিকার।

এ বিষয়ে, জিওনিস্ট আন্দোলনের তর্কাতীত নেতা শাইম ওয়াইজম্যানের সংগে আমার যে মুখতসর আলোচনা হয়েছিলো এখনো তা আমার মনে আছে। তিনি ফিলিস্তিনে তাঁর নিয়মিত সফরের একটিতে এখানে এসেছিলেন। (আমার বিশ্বাস, তাঁর স্থায়ী ঠিকানা ছিলো লণ্ডনে) তাঁর সাথে আমার দেখা হয় এক ইহুদী বন্ধুর বাড়িতে। এ লোকটির অপরিসীম প্রাণশক্তিতে আমি প্রভাবিত না হয়ে পারিনি—এমন এক প্রাণশক্তি যার অভিব্যক্তি ঘটেছিলো তাঁর দৈহিক গতিবিধিতেও, তাঁর দীর্ঘ স্প্রিং-এর মতো পদক্ষেপেও, কারণ এভাবেই তিনি পায়চারি করছিলেন ঘরের ভেতর। আমি প্রভাবিত না হয়ে পারিনি তাঁর প্রশস্ত কপালে ফুটে ওঠা বুদ্ধির দীপ্তিতে আর তাঁর চোখের মর্মভেদী চাহনিতে।

তিনি কথা বলছিলেন টাকা-কড়ির অসুবিধা সম্বন্ধে যে-সব অসুবিধা ইহুদী জাতীয়-আবাসের স্বপ্নকে রূপ দেবার পথে ছিলো বাধাস্বরূপ—আর বলছিলেন, বিদেশে ইহুদীরা এই স্বপ্নে যে সাড়া দেয় তার ক্ষীণতা সম্বন্ধে। এতে আমার এই বিরক্তিকর ধারণাই হলো ঃ

ওয়াইজম্যানও প্রায় অন্য সকল ইহুদীর মতোই উৎসুক ছিলেন ফিলিস্তিনে যা কিছু ঘটছিলো তার নৈতিক দায়িত্ব 'বহির্জগতে' চালান দিতে। এর ফলে আমি বাধ্য হলাম সেই সশ্রদ্ধ নীরবতা ভাঙতে যে নীরবতার সাথে উপস্থিত সকলেই তাঁর কথা শুনছিলো। আমি জিগ্‌গাস করি ঃ

—'কিন্তু আরবদের সম্বন্ধে কী?'

আলোচনার মধ্যে এ ধরনের একটি তাল-কাটা সুর এনে নিশ্চয়ই আমি 'ভুল' করেছিলাম, কারণ, ওয়াইজম্যান তাঁর মুখ ধীরে ধীরে ফেরালেন আমার দিকে, তাঁর হাতের পেয়ালাটি রেখে দিলেন আর আমরা কথাটির পুনরাবৃত্তি করলেন ঃ

—'এবং আরবদের সম্বন্ধে কী?'

—'আরবদের তুমুল বিরোধিতার মুখে আপনি কী করে আশা করছেন যে, ফিলিস্তিনকে আপনারা নিজেদের স্বদেশ বানিয়ে ফেলবেন? অথচ, মোদ্দাকথা তো এই, আরবরাই এদেশে সংখ্যাগুরু।'

জিওনিস্ট নেতা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—'আমরা আশা করছি, অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই ওরা আর মেজরিটি থাকছে না।'

—'হয়তো তা-ই! আপনি এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন বহু বছর ধরে, আপনি পরিস্থিতি আমার চেয়ে অবশ্যই ভালো বোঝেন। কিন্তু, আরবরা যে-সব রাজনৈতিক বাধাবিঘ্ন আপনাদের জন্য সৃষ্টি করতে পারে—হয়তো না-ও করতে পারে—সে-সবের কথা বাদ দিয়েও, এ সমস্যার নৈতিক দিকটা কি আপনাকে মোটেই বিব্রত করে না? আপনি কি মনে করেন না যে, যারা এদেশে চিরকাল বসবাস করে এসেছে তাদের উচ্ছেদ করা আপনাদের পক্ষে অন্যায়?'

—'কিন্তু এদেশ তো আমাদের', ডঃ ওয়াইজম্যান ভুরু জোড়া কপালে তুলে জবাব দেন, 'যা থেকে আমাদেরকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিলো আমরা তো তাই ফেরত নেয়ার বেশি কিছু করছি না।'

—'কিন্তু আপনারা প্রায় দু'হাজার বছরের কাছাকাছি, ফিলিস্তিন থেকে দূরে রয়েছেন। এর আগে, আপনারা এদেশ শাসন করেছিলেন, কিন্তু পুরা দেশটি কখনো নয়—পাঁচশো বছরেরও কম। আপনি কি মনে করেন না যে, একই যুক্তিতে আরবরা দাবি করতে পারে স্পেন, কারণ, তারাও তো স্পেনে কর্তৃত্ব করেছিলো প্রায় সাতশো বছর, আর প্রায় পাঁচশো বছর আগে তা সম্পূর্ণ খুইয়ে বসে।'

দেখতে পেলাম ডঃ ওয়াইজম্যান অধৈর্য হয়ে উঠেছেনঃ

—'বাজে কথা! আরবরা তো স্পেন 'জয় করেছিলো' মাত্র; সে দেশ কখনো তাদের নিজেদের আদি বাসভূমি ছিলো না। তাই, স্পেনীয়রা শেষ নাগাদ ওদেরকে সেখান থেকে বের করে দিয়েছিলো—তা ঠিকই হয়েছিলো।'

—'মাফ করবেন' আমি পাল্টা জবাব দিই, 'আমার মনে হচ্ছে এতে ঐতিহাসিক তথ্যগত কিছু ভুল রয়ে গেছে। আসলে, হিব্রুরাও তো ফিলিস্তিনে এসেছিলো বিজয়ী হিসাবে। তাদের বহু বহু আগে এখানে বাস করতো অনেক সেমিটিক এবং অ-সেমিটিক

গোত্র—যেমন আমেরাইত, এদুমাইত, ফিলিস্টাইন, মোআইবাত এবং হিট্টাইট প্রভৃতি। ইসরাঈল এবং যুদা'র রাজত্বকালেও তো এসব কবিলা এখানেই বাস করতো। রোমানরা যখন আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেয় তখনো ঐসব গোত্র এখানেই বাস করতো। ওরা এখনো এখানেই বাস করছে। সপ্তম শতকে যে-সব আরব এ অঞ্চল জয় করে সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করে, তারা সবসময়ই জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র মাইনরিটি মাত্র ছিলো। বাকী যাদেরকে আমরা আজ ফিলিস্তিনী বা সিরীয় 'আরব' বলে বর্ণনা করে থাকি আসলে তারা হচ্ছে এখানকার আরবায়িত মূল বাসিন্দা মাত্র। বহু শতাব্দীতে এদের অনেকেই মুসলমান হয়ে গেছে। অন্যরা খ্রিস্টানই রয়ে গেছে। মুসলমানেরা স্বভাবতই আরব থেকে আগত তাদের ধর্মাবলম্বীদের সাথে তাদের ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয়। কিন্তু আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন, ফিলিস্তিনের বেশির ভাগ লোক, যারা আরবীতে কথা বলে, তারা মুসলমানই হোক বা খ্রিস্টানই হোক, তারা সরাসরি সূত্রে, এখানকার আদি বাসিন্দাদেরই বংশধর—আদি এই অর্থে যে, হিব্রুরা এখানে আসার বহু শতাব্দী আগেও তারা এখানেই বাস করতো!'

আমার এই বিস্ফোরণে ডঃ ওয়াইজম্যান ভদ্র হাসিতে মোলায়েম হয়ে ওঠেন এবং আলোচনার মোড় অন্য বিষয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেন।

আমার এই হস্তক্ষেপের যে পরিণতি হলো তাতে আমি সুখী হইনি। আমি অবশ্যি আশা করিনি, উপস্থিত কেউ—ডঃ ওয়াইজম্যান তো ননই—আমার সাথে একমত হবেন যে, নৈতিকতার বিচারে জিওনিস্ট আদর্শটি খুবই দুর্বল এবং খেলো। কিন্তু এই প্রত্যাশা আমার ছিলো ঃ আরবদের লক্ষ্যের প্রতি আমার সমর্থন আর কিছু না হোক জীওনিস্ট নেতৃত্বের মধ্যে অন্তত কিছুটা অস্বস্তির জন্ম দেবে—এমন এক অস্বস্তি যা ওদের মধ্যে এনে দিতে পারে আরও বেশি অন্তর্মুখিতা, আর তাতে করে হয়তো একথা মেনে নেয়ার জন্য সৃষ্টি করতে পারে অধিকতরো মানসিক প্রস্তুতি। কথাটি এই যে আরবদের জিওনিজম বিরোধিতার মধ্যে একটি নৈতিক অধিকারের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তার কিছুটা ঘটলো না। তার বদলে আমি দেখতে পেলাম একটা শূন্য দেয়াল যেন চোখ বের করে তাকিয়ে আছে আমার দিকেঃ আমার হঠকারিতার বিরুদ্ধে তিরস্কারই ভরা প্রতিবাদ—এখন সেই হঠকারিতা, যা ওদের পূর্বপুরুষদের দেশে, ইহুদীদের প্রশ্নাতীত অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার দুঃসাহস করেছে!

ভেবে ভেবে বিস্মিত হতাম আমি—অমন সৃজনধর্মী বুদ্ধির অধিকারী ইহুদীদের পক্ষ্যে জিওনিস্ট-আরব বিরোধটিকে কী করে কেবল ইহুদীদেরই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সম্ভব হচ্ছে! ওরা কি বুঝতে পারেনি যে, শেষতক ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সমস্যাটির সমাধান কেবলমাত্র আরবদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ভেতর দিয়েই সম্ভব হতে পারে? ওদের এই পলিসি যে যন্ত্রণাদায়ক ভবিষ্যৎ ডেকে আনবে অনিবার্যভাবেই সে বিষয়ে ওরা কি ছিলো সত্যি সত্যি অতোটা অন্ধ? যদি সাময়িকভাবে সফলও হয় তবু এক শত্রুভাবাপন্ন আরব সমুদ্দুরের মধ্যে ইহুদী-রাষ্ট্ররূপ ছোট্ট দ্বীপটি চিরকালের জন্য যে সংঘাত, ঘেন্না ও তিক্ততার মুখোমুখি হবে তা দেখার মতো দৃষ্টিশক্তি কি ওদের একেবারেই ছিলো না?

এবং কী আশ্চর্য, আমি ভাবতাম, যে জাতি তার দীর্ঘ এবং যন্ত্রণাদায়ক ইতিহাসে, বারবার অন্যায় জুলুম-নিপীড়নের শিকার হয়েছে, আজ সে-ই তার নিজের লক্ষ্য হাসিলের ঐকান্তিক চেষ্টায় অপর একটি জাতির প্রতি মারাত্মক জুলুম করতে উদ্যত—আর সে জাতিও এমন এক জাতি যারা ইহুদীদের অতীত দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে একেবারেই নিরপরাধ! আমি জানতাম, ইতিহাসে এরূপ ঘটনা কখনো ঘটেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার চোখের সামনেই তা ঘটতে যাচ্ছে দেখে আমার দুঃখের সীমা রইলো না।

সে সময়ে, ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক দৃশ্যপট নিয়ে আমার এই অষ্টপ্রহর চিন্তা-ভাবনার মূলে যে কেবল আরবদের প্রতি আমার সহানুভূতি আর জিওনিস্টদের এক্সপেরিমেন্টে আমার উদ্বেগই কাজ করেছে তা নয়—এর মূলে আমার সাংবাদিক কৌতূহলও ছিলো সক্রিয়—কারণ আমি তখন 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ-এর বিশেষ সংবাদদাতা আর ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রগুলির অন্যতম ছিলো এ কাগজ। অনেকটা আকস্মিকভাবেই আমি এ সুযোগ পেয়ে যাই।

এক সন্ধ্যায় আমি আমার এক স্যুটকেসে ঠাসা পুরোনো কাগজপত্রগুলি বাছাই করছি—কাগজ ঘাটতে ঘাটতে এক বছর আগে বার্লিনে ইউনাইটেড টেলিগ্রাফের প্রতিনিধি হিসাবে যে কার্ডটি আমাকে দেওয়া হয়েছিলো, তা পেয়ে গেলাম। আমি প্রায় ওটি ছিঁড়েই ফেলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় ডোরিয়ান মামা আমার হাত ধরে রসিকতার সাথে বলে উঠলেন ঃ 'ছিঁড়ো না। তুমি যদি হাইকমিশন অফিসে এই কার্ডটি পেশ করো, কয়েকদিনের মধ্যেই সরকারী ভবনে খানার দাওয়াত পেয়ে যাবে। এদেশে সাংবাদিকরা খুবই বাঞ্ছিত জীব।'

আমি যদিও অনাবশ্যক কার্ডটি ছিঁড়ে ফেললাম, তবু মামার ঠাট্টা আমার মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। অবশ্য আমি সরকারী ভবনে খানার দাওয়াতের জন্য মোটেই উদগ্রীব ছিলাম না—কিন্তু তাই বলে এমন একটি সময়ে নিকটপ্রাচ্যে থাকার এই দুর্লভ সুযোগ কেন আমি কাজে লাগাবো না—যখন দেখতে পাচ্ছি—মধ্য ইউরোপের খুব কম সাংবাদিকই এখানে সফরের সুযোগ পাচ্ছে, আমি কেন আবার আমার সাংবাদিক কাজকর্ম শুরু করবো না? তবে ইউনাইটেড টেলিগ্রাফের প্রতিনিধি হিসাবে নয়, কোনো একটি মশহুর দৈনিকের সংবাদদাতা হিসাবে। এবং যেরূপ অকস্মাৎ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি তেমনি সহসা আমি স্থির করে ফেললাম—আমি 'সত্যিকার' সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করবো!

'ইউনাইটেড টেলিগ্রাফে'র সাথে এক বছর কাজ করলেও কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদপত্রের সাথেই আমার সরাসরি কোনো সম্পর্ক ছিলো না। তাছাড়া, যেহেতু আমার নিজের নামে আজো কিছুই ছাপা হয়নি, তাই সংবাদপত্র জগতে আমার নাম এখনো সম্পূর্ন অজানা, অপরিচিত। অবশ্য, এতে আমি নিরাশ হয়ে পড়িনি। আমি ফিলিস্তিন সম্পর্কে আমার ধারণার উপর একটি প্রবন্ধ লিখলাম এবং দশটি জার্মান সংবাদপত্রে পাঠালাম তার কপি। সংগে আমি এ প্রস্তাবও দিলাম যে, নিকট-প্রাচ্যের উপর আমি ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লিখতে তৈরি আছি।

এ হচ্ছে ১৯২২ শেষের দিকের মাসগুলির কথা—তখন জার্মানীতে চরম সর্বনাশা মুদ্রাস্ফীতি বিরাজ করছে। জার্মান সংবাদপত্রগুলির পক্ষে টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়েছিলো। অতি অল্পসংখ্যক খবরের কাগজই পারতো মুদ্রায় তাদের বৈদেশিক সংবাদদাতাদের খরচ বহন করতে। কাজেই এ মোটেই আশ্চর্যজনক ছিলো না যে, আমি যে-দশটি সংবাদপত্রে আমার নমুনা প্রবন্ধটি পাঠিয়েছিলাম তারা একের পর এক, কমবেশি ভদ্র ভাষায় তাদের প্রত্যাখ্যানের কথা লিখে জানালো। দশটি পত্রিকার মধ্যে কেবল একটিই আমার পরামর্শ গ্রহণ করে এবং মনে হয়, আমি যা লিখেছিলাম তাতে খুশি হয়েই আমাকে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের বিশেষ ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা নিয়োগ করে, আর তার সংগে একটি চুক্তিপত্রও পাঠায়—ফিরে গিয়ে আমাকে একটি বই লিখে দিতে হবে। এই পত্রিকাটিই 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ'। আমি প্রায় কাৎ হয়ে গেলাম, যখন দেখতে পেলাম, আমি যে কেবল একটি সংবাদপত্রের সাথে (আর কী সে সংবাদপত্র!) সম্পর্কই স্থাপন করতে পেরেছি তা নয়, পয়লা চেষ্টায়ই অমন একটা মর্যাদা হাসিল করেছি যা বহু ঝানু সাংবাদিকেরও ঈর্ষার বস্তু হতে পারে!

অবশ্য এর মধ্যে একটা কাঁটাও ছিলো। মুদ্রাস্ফীতির জন্য 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ' আমাকে নগদ টাকায় আমার মাইনে দিতে সক্ষম ছিলো না। বিনয়ের সাথে তারা বললো, আমার পারিশ্রমিক দেয়া হবে জার্মান মার্কের হিসাবে; ওদের মতোই আমিও জানতাম যে, এতে আমার প্রবন্ধগুলি পাঠাবার জন্য খামের উপর যে টিকেট লাগাতে হবে তার খরচ বহন করাও কঠিন হবে। কিন্তু 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ'—এর বিশেষ সংবাদদাতা হওয়ার গৌরব অনেক—অনেক বেশি মূল্যবান মনে হলো—সংবাদদাতা হিসাবে টাকা-কড়ি না পাওয়ার সাময়িক অসুবিধা সত্ত্বেও। আমি ফিলিস্তিনের উপর প্রবন্ধ লিখতে শুরু করে দিলাম এই আশায় যে, শীগ্গীরই হোক বা বিলম্বেই হোক, ভাগ্যে কোনো শুভ পরিবর্তনের ফলে, একদিন হয়তো আমি গোটা নিকট-প্রাচ্যেই, সফর করতে সক্ষম হবো।

* * * * * * * *

ফিলিস্তিনে এখন আমার বন্ধু অনেক—ইহুদী এবং আরব, উভয়ই।

একথা সত্য যে, আরবদের প্রতি আমার সহানুভূতির জন্য, যা 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ'-এ প্রকাশিত আমার প্রবন্ধগুলিতে ছিলো সুস্পষ্ট, জিওনিস্টরা আমাকে দেখতো অনেকটা বিস্ময়-মেশানো সন্দেহের সংগে। স্পষ্টই তারা স্থির করতে পারছিলো না আমি কি আরবদের দ্বারা 'খরিদ' হয়ে গেছি (কারণ, জিওনিস্টরা প্রায় সমস্ত কিছুকেই টাকা-কড়ির অর্থে ব্যাখ্যা করতে ছিলো অভ্যস্ত)! না কি, আমি কেবল একটা উদ্ভট বুদ্ধিজীবী, বিদেশী সবকিছুকেই যে ভালোবাসে। কিন্তু তখন যেসব ইহুদী ফিলিস্তিনে বাস করতো তাদের সবাই যে জিওনিস্ট ছিলো তা নয়। ওদের কেউ কেউ ফিলিস্তিনে এসেছে, রাজনৈতিক কোনো মতলব নিয়ে নয়, বরং পাকভূমি আর তার সাথে জড়িত বাইবেলী স্মৃতি-অনুষংগের প্রতি একটি ধর্মীয় অনুরাগবশে।

এই দলের মধ্যে ছিলেন আমার ডাচ্ বন্ধু ইয়াকব দ্য হান—দেখতে ছোটো-খাটো, গোলগাল, মুখে সোনালী রঙের দাড়ি, বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। এখানে আমার

আসার আগে তিনি ছিলেন হল্যাণ্ডের একটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক। এখন তিনি আমস্টার্ডামের 'হ্যাণ্ডেল্‌সব্লাড' ও লণ্ডনের 'ডেলি একপ্রেসে'র বিশেষ সংবাদদাতা। তাঁর ধর্মবিশ্বাস ছিলো গভীর, পূর্ব ইউরোপের যে-কোনো ইহুদীর মতোই গোঁড়া—কিন্তু তিনি জিওনিস্ট চিন্তাধারা সমর্থন করতেন না, কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন, 'প্রতিশ্রুত ভূমিতে তাঁর জাতির প্রত্যাবর্তনের জন্য তাদেরকে মিসাইআ্যার আগমনের অপেক্ষা করতে হবে।'

—'আমরা ইহুদীরা', তিনি আমাকে একাধিকবার বলেছেন, 'আমরা পাক ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলাম এবং পৃথিবীর সর্বত্র আমাদেরকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো, কারণ আল্লাহ্ আমাদের যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমরা তা পালন করতে পারিনি। তিনি আমাদেরকে মনোনীত করেছিলেন তাঁর কালাম প্রচারের জন্য, কিন্তু আমরা আমাদের উদ্ধত অহংকার-বশে ভাবতে শুরু করলাম, তিনি কেবল খাতিরেই 'মনোনীত জাতি' করেছেন—এবং এভাবে, আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। এখন আর তওবা করা আর অন্তর সাফ করা ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই। এবং আমরা যখন আবার তাঁর কালাম শোনার লায়েক হবো, তিনি একজন মিসাইআ্যা পাঠাবেন তাঁর বান্দাদেরকে প্রতিশ্রুত দেশে আবার নিয়ে যাবার জন্য।'

—'কিন্তু', আমি জিগ্‌গাস করি, 'জিওনিস্ট' আন্দোলনের মূলেও এই মিসাইআ্যার ধারণা নেই কি? আপনি জানেন, আমি তা সমর্থন করি না; কিন্তু প্রত্যেক জাতিরই কি এ বাসনা স্বাভাবিক নয় যে, তাদের একটি নিজস্ব আবাস-ভূমি থাকবে?

ডঃ দ্য হা'ন আমার দিকে একটু লঘু পরিহাস মেশানো নজরে তাকান,—'আপনি কি মনে করেন, ইতিহাস কেবল কতকগুলি ঘটনাপরম্পরা? আমি তা মনে করি না। আল্লাহ্ যে আমাদেরকে বাধ্য করেছিলেন আমাদের দেশ হারাতে, আর আমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন নানা দেশে, তা উদ্দেশ্যহীন ছিলো না। কিন্তু জিওনিস্টরা নিজেরা একথা স্বীকার করতে রাজী নয়; যে-আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব আমাদের পতনের জন্য দায়ী ওরা সেই অন্ধতায়ই ভুগছে। ইহুদীদের দু'হাজার বছরের নির্বাসন এবং দুঃখ-কষ্ট ওদেরকে কিছুই শেখায়নি। আমাদের দুঃখ-কষ্টের মূল কারণটি বুঝবার চেষ্টা না করে তাকে এখন এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে; বলা যায়, পশ্চিমা শক্তির রাজনীতি থেকে পাওয়া বুনিয়াদের উপর একটা 'জাতীয় আবাস' তৈরি করে—এবং জাতীয় আবাসভূমি তৈরির এই প্রচেষ্টায় অপর একটি জাতিকে তার নিজের আবাস থেকে বঞ্চিত করার অপরাধই করে চলেছে ওরা!

স্বভাবতই, ইয়াকব দ্য হানের রাজনৈতিক মতামত তাকে জিওনিস্টদের মধ্যে খুবই অপ্রিয় করে তোলে (আসলে আমার ফিলিস্তিন ত্যাগের কিছুদিন পরেই, আমি শুনে মর্মাহত হই যে, তাঁকে সন্ত্রাসবাদীরা এক রাত্রে গুলী করে হত্যা করেছে)। তাঁর সংগে যখন আমার পরিচয় হয় তখন তাঁর নিজের মতের অল্প ক'জন ইহুদীদের মধ্যেই তাঁর সামাজিক মেলামেশা ছিলো সীমাবদ্ধ—এদের কেউ কেউ ছিলো ইউরোপীয়, কেউ কেউ ছিলো আরব। আরবদের প্রতি তাঁর খুবই দরদ ছিলো বলে মনে হয়, আর তাঁর সম্বন্ধে আরবদেরও ছিলো খুব উচ্চ ধারণা। ওরা প্রায়ই ওঁকে দাওয়াত করতো ওদের বাড়িতে।

আসলে তখনো আরবরা ইহুদী হিসাবেই ইহুদীদের প্রতি সর্বতোভাবে বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠেনি। কেবল ব্যালফোর ঘোষণার পরই—অর্থাৎ শত শত বছর পাশাপাশি সম্প্রীতির সাথে বসবাস এবং একটা জাতিগত ঐক্য-চেতনা সত্ত্বেও আরবরা ইহুদীদেরকে রাজনৈতিক দুশ্‌মন ভাবতে শুরু করে। কিন্তু দ্বিতীয় দশকের প্রথমদিকের বদলে-যাওয়া পরিস্থিতিতেও আরবরা জিওনিস্ট এবং ডঃ দ্য হা'নের মতো বন্ধুভাবাপন্ন ইহুদীদেরকে স্পষ্টভাবেই আলাদা করে দেখতো।

... ...

আরবদের মধ্যে আমার সফরের এই প্রথমদিকের নিয়তি-নির্দিষ্ট মাসগুলি যেনো আবেগ-অনুভূতি ও চেতনা প্রতিবিম্বের এক প্রবাহ বইয়ে দিলো। বলতে কি, ব্যক্তিগত ধরনের কতকগুলি অনুচ্চারিত আশা-আকাঙ্ক্ষা আমার চেতনায় স্থান পাবার দাবি জানাতে থাকলো।

আমি অমন একটা জীবনবোধের সম্মুখীন হলাম যা ছিলো আমার কাছে একেবারেই নতুন। মনে হলো, এই মানুষগুলির রক্ত থেকে একটি উষ্ণ, তপ্ত, মানবিক নিশ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে ওদের চিন্তায়, ওদের অংগ-ভংগীতে-আত্মার সেইসব যন্ত্রণাদায়ক ফাটল, ভয়, ক্ষোভ এবং মানসিক বাধার সেইসব প্রেত যা ইউরোপের জীবনকে কুৎসিততরো এবং প্রতিশ্রুতির দিক দিয়ে অতো কাঙাল করেছে...এই আরবদের মধ্যে এর কোনোটিরই অস্তিত্ব নেই। আমি আমার নিজেরও অজান্তে হামেশা যা কামনা করে এসেছি তারই কিছুটা পেতে শুরু করি আরবদের মধ্যেঃ হালকাভাবে জীবনের সকল প্রশ্নের মুকাবিলা করার জন্য এটি একটি আবেগধর্মী মনোভাব। বলা যায়, অনুভূতির ক্ষেত্রে এক মহৎ কাণ্ডজ্ঞান।

কালক্রমে, এই মুসলিম জাতির মর্মকথা বোঝা আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠলো। এর কারণ এ নয় যে, ওদের ধর্ম আমাকে আকর্ষণ করেছিলো (কারণ তখনো এ সম্বন্ধে আমি জানতাম সামান্যই) বরং তা এ কারণেই আমার কাছে অতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যে, ওদের মধ্যে আমি দেখতে পেয়েছিলাম মন ও ইন্দ্রিয়ের এক সহজাত সংগতি, যা ইউরোপ খুইয়ে বসেছিলো। আরো নিবিড়ভাবে আরবদের জীবন বোঝার মাধ্যমে কি আমাদের পশ্চিমা জগতের দুঃখ-যন্ত্রণা, মানবিক সংহতির ক্ষয়কর অভাব আর সেই দুঃখ-যন্ত্রণার কারণের মধ্যে যে গোপন সম্পর্ক রয়েছে তা আবিষ্কার করা সম্ভব নয়? কী সেই জিনিস, যা আমাদেরকে, পশ্চিমাদেরকে, জীবনের সেই পরম স্বাধীনতা থেকে পলায়ন করতে শিখিয়েছে, যে স্বাধীনতার অধিকারী এই আরবেরা, ওদের এই মানসিক রাজনৈতিক অবক্ষয়ের যুগেও— যার অধিকারী আমরাও হয়তো ছিলাম অতীতের কোনো এক সময়ে? তা যদি না হতো, আমরা কী করে সৃষ্টি করতে পারতাম আমাদের অতীতের মহৎ সব শিল্পকলা, মধ্যযুগের সার্থক গির্জাসমূহ, রেনেসাঁসের উন্মাদ উল্লাস, রেমব্রাতের চিত্রের আলো-আঁধারের খেলা, বাখের সুর-মূর্ছনা, মোজার্টের স্নিগ্ধ মোলায়েম অস্বপ্ন, আমাদের চাষীদের চিত্রকলায় ময়ূরের পেখমের গৌরব এবং অস্পষ্ট, প্রায় অমূল্য শিখর-চূড়ার দিকে বীথোফেনের গর্জনময় আশায়-দীপ্ত উড্ডয়ন, যেখান থেকে

মানুষ বলতে পারে—'আমি আর আমার নিয়তি অভিন্ন।

আত্মশক্তির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য কী তা আমরা জানি না বলে আমাদের পক্ষে আর ঐসব শক্তির সত্যিকার ব্যবহার সম্ভব নয়। আমাদের মধ্যে আর কখনো জন্ম হবে না কোনো বীথোফেনের বা কোনো রেমব্রাতের! তার বদলে এখন আমরা জানি শিল্পকলায়, সমাজ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি-বিজ্ঞানে প্রকাশের নব নব রূপ নিয়ে কেবল মারাত্মক দলাদলি, কেবলি পরস্পরবিরোধী শ্লোগান, ও সূক্ষ্মভাবে, পরিকল্পিত নীতির মধ্যে তুমুল সংগ্রাম। আমাদের সব যন্ত্রপাতি, আর আসমান-ছোঁয়া দালানকোঠা আমাদের আত্মার সমগ্রতা পুনরুদ্ধারের জন্য কিছুই করতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ...ইউরোপের অতীতের সেই হারানো আত্মিক গৌরব কি প্রকৃতপক্ষে চিরদিনের জন্যই হারিয়ে গেছে? আমরা কোথায় ভুল করেছি তা উপলব্ধি করে আমরা কি সেই আত্মিক গৌরবের কিছুটা ফিরে পেতে পারি না?

এবং প্রথমে যা, আরবদের রাজনৈতিক লক্ষ্যের প্রতি, আরবীয় জীবনের বাইরের রূপ, আর আমি এ জাতির লোকদের মধ্যে আবেগের দিক দিয়ে যে স্থির-নিশ্চয়তা লক্ষ্য করেছি তার প্রতি আমার পক্ষে সহানুভূতি মাত্র ছিলো, তাই ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞাতসারে, এমন কিছুতে রূপান্তরিত হলো যা এক ব্যক্তিগত অন্বেষার সাথেই তুলনীয়। আমি ধীরে ধীরে আরো সচেতন হয়ে উঠলাম একটি আচ্ছন্ন-করা তন্ময় বাসনা সম্পর্কে—জানার এ বাসনা যে, আবেগের দিক দিয়ে ওদের নিশ্চিন্ত নির্ভরতার মূলে কী রয়েছে, আর কী সেই জিনিস যা আরবদের জীবনকে অতো আলাদা করে দিয়েছে পাশ্চাত্য জীবন থেকে? আর মনে হলো, এই বাসনা যেনো আমার নিজের গহনতম সমস্যাগুলির সাথেই রহস্যজনকভাবে জড়িত। আমি পথ খুঁজতে লাগলাম যা আমাকে দেবে আরবদের চরিত্রে, তাদের ধ্যান-ধারণায় গভীরতরো অন্তর্দৃষ্টি, যে-চরিত্র ও ধ্যান-ধারণা ওদেরকে দিয়েছে একটা বিশেষ রূপ আর আত্মিক দিক দিয়ে ওদেরকে করেছে ইউরোপীয়দের থেকে অতো স্বতন্ত্র! ওদের ইতিহাস, তমদ্দুন আর ধর্ম সম্বন্ধে আমি গভীরভাবে পড়াশোনা শুরু করে দিলাম। আর এই তাগিদ, যা আমি সেই জিনিসটি আবিষ্কার করার জন্য অনুভব করি যা ওদের হৃদয়কে করেছে উদ্বুদ্ধ আর পরিপূর্ণ আর দিয়েছে ওদের পথের দিশা—তারি মধ্যে যেনো আমি আভাস পেলাম একটি প্রেরণার, এক গোপন শক্তি আবিষ্কারের, যা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, পূর্ণ করেছে, আর দিয়েছে দিক্-নির্দেশনার প্রতিশ্রুতি— ।

কণ্ঠস্বর

এক

আমরা চলছি উটের উপর সওয়ার হয়ে, আর জায়েদ গান গাইছে। বালিয়াড়িগুলি এখন আগের চেয়ে আরো প্রশস্ত। এখানে ওখানে বালু জায়গা ছেড়ে দেয় নুড়ি পাথরের শয্যার জন্য এবং খণ্ড খণ্ড বেসল্টের জন্য, আর আমাদের সম্মুখেই, অনেক দক্ষিণে, জেগে ওঠে গিরিশ্রেণীর ছায়া ছায়া রেখা ঃ জাবাল শাম্মার পর্বতশ্রেণী।

জায়েদের গানের পদগুলি একাকার হয়ে ভেদ করে আমার নিদ্রালুতাকে—কিন্তু ঠিক অমন মাত্রায় যে, আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে যে-শব্দগুলি সেগুলিই এমন এক বিস্তৃততরো, গভীরতরো তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠছে যার সাথে তাদের বাহ্য অর্থের কোনো যোগই নেই!

এ হচ্ছে উট সওয়ারের সেই গানগুলির একটি, যা আপনি প্রায়ই শুনতে পাবেন আরব দেশে—এমন গান যা মানুষ গায় তাদের জন্তুগুলির পদক্ষেপকে নিয়মিত ও ক্ষিপ্র রাখতে এবং ঘুমিয়ে-পড়া থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে—মরু-মানবের সুর, যারা অমন স্থানের সাথে দিন গুজরান করে যার কোনো সীমা-সরহদ নেই, প্রতিধ্বনিও নেইঃ যে সুর সবসময়ই তোলা হয় বাদ্যযন্ত্রের প্রধান চাবিতে, সুরের একই সমতলে, ঢিলা-ঢালা আর কিছুটা কর্কশ—বেরিয়ে আসছে গলার একেবারে উপর থেকে, আর আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে শুষ্ক হাওয়ায় ঃ যেনো. মরুভূমির নিশ্বাস ধরা পড়েছে মানুষের একটি কণ্ঠস্বরে। মরুভূমির ভেতর দিয়ে যে মানুষ কখনো সফর করেছে সে কিছুতেই ভুলতে পারবে না এই কণ্ঠস্বর। এ কন্ঠস্বর যেখানে জমি নিষ্ফলা, বাতাস উষ্ণ আর চতুর্দিক উন্মুক্ত অবারিত আর জীবন কঠিন—সব জায়গায় একই।

আমরা চলেছি উটের উপর সওয়ার হয়ে আর জায়েদ গেয়ে চলেছে, যেমন তার আগে নিশ্চয়ই গেয়েছে তার আব্বা এবং তার কবিলার আর সকল মানুষ এবং আরো বহু কবিলার মানুষ, হাজার হাজার বছর ধ'রে; কারণ, এই গভীর, একঘেয়ে সুরগুলি গড়ে তুলতে এবং তাদেরকে চূড়ান্ত রূপ দিতে দরকার হয়েছে হাজার হাজার বছরের। বহু সুরে সুরেলা পাশ্চাত্য সংগীত প্রায় সবসময়ই প্রকাশ করে কোনো-না-কোনো ব্যক্তিগত অনুভূতি, কিন্তু এই আরবীয় সুরগুলি—অগণিতবার যাতে তোলা হয়েছে একই সুরের আমেজ—এগুলি যেনো, অনুভূতি থেকে পাওয়া উপলব্ধির সুরময় প্রতীক মাত্র, যার অভিজ্ঞতা রয়েছে বহু মানুষের, যার উদ্দেশ্য কোনো একটা ভাব জাগানো নয়, বরং আপনাকে আপনার আত্মিক অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। এইসব সুরের জন্ম হয়েছিলো বহু বহু আগে, মরুভূমির আবহাওয়া থেকে, বাতাসের আর যাযাবর জিন্দেগীর ছন্দ থেকে, বিশাল মাঠ-প্রান্তরের বিশালতার অনুভূতি থেকে, এক চিরন্তন বর্তমানের ধ্যান থেকে ঃ এবং ঠিক যেমন জীবনের মৌলিক বিষয়গুলি সব- সময়ই একই থাকে তেমনি এই সুরগুলিও সময়ের অতীত, পরিবর্তনের অতীত।

এই ধরনের সুরের কথা প্রতীচ্যে ক্বচিৎ কেউ ধারণা করতে পারে। প্রতীচ্যে, আলাদা আলাদা সুর কেবল সংগীতেরই একটা দিক নয়, এ তার অনুভূতি ও কামনা- বাসনারও একটি দিক। শীতল আবহাওয়া, ছুটে চলা নদী-নালা, পর পর চারটি ঋতু—এসব উপাদান জীবনকে এতো বহুমুখী তাৎপর্য ও দিক নির্দেশ করে যে, পাশ্চাত্যের মানুষ অতি স্বাভাবিকভাবেই পীড়িত হয় বহু কামনা-বাসনা দ্বারা' এবং পরিণামে একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষার দ্বারা, সে আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র করার তাগিদেই কাজ করার আকাঙ্ক্ষা। তাকে সবসময়ই সৃষ্টি করতে হবে, নির্মাণ করতে হবে, জয়ী হতে হবে, তার নিজের জীবনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে, নিজের অস্তিত্বকে বারবার উপলব্ধি করার জন্য; আর এই নিত্য পরিবর্তনশীল জটিলতা তার সংগীতেও প্রতিফলিত। তরংগিত উদাত্ত পশ্চিমা সংগীতেও ধ্বনি আসে বুকের ভেতর থেকে এবং উদাত্ত সব- সময়ই—বিভিন্ন তালে ওঠা-নামা করতে করতে; এ সংগীতে কথা বলে সেই 'ফাউস্টীয় প্রকৃতি—যার প্রভাবে পশ্চিমী মানুষেরা অনেক বেশি স্বপ্ন দেখে, অনেক বেশি কামনা করে এবং জয়লাভের ইচ্ছায় অনেক বেশি সংগ্রাম করে—কিন্তু তার সংগে হয়তো ওরা হারায়ও অনেক বেশি এবং তা হারায় বেদনাদায়কভাবে! কারণ, পশ্চিমী মানুষের জগৎ হচ্ছে ইতিহাসের জগৎ ঃ কেবলি হওয়া, ঘটা আর অতীত হয়ে যাওয়া; এতে শান্ত থাকার প্রশান্তিটুকু নেই ঃ সময় হচ্ছে একটি দুশমন—যাকে সবসময়ই দেখতে হবে সন্দেহের নজরে; এবং 'এখন' এই কথাটি কখনো বহন করে না চিরন্তনের কোনো ইংগিত...

পক্ষান্তরে মরুভূমি আর স্তেপ অঞ্চলের আরবকে তার চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য স্বপ্নের মায়াময় জগতে নিয়ে যায় না, এ দৃশ্য তার কাছে দিনের মতোই কঠোর বাস্তব ; এতে অনুভূতির আলো-ছায়া খেলার কোনো অবকাশ নেই। বাহির আর ভেতর, আমি আর পৃথিবী তার কাছে বিপরীত এবং পরস্পরবিরোধী কোনো সত্তা নয়, বরং এক অপরিবর্তনীয় বর্তমানেরই বিভিন্ন দিক ; গোপন ভয় তার জীবনের উপর প্রভুত্ব করে না এবং যখনই সে কোনো কাজ করে সে তা করে বাহ্য প্রয়োজনে, মানসিক নিরাপত্তার বাসনার তাগিদে নয়। ফলের দিক দিয়ে সে পশ্চিমাদের মতো দ্রুত বৈষয়িক 'সাফল্য' হাসিল করতে পারেনি সত্য, কিন্তু সে তার আত্মাকে বাঁচাতে পেরেছে।

... ...

...'কতো কাল'—আমি প্রায় একটা শরীরী চমকের সাথে নিজেকে নিজে সুধাই—জায়েদ আর জায়েদের জাতের লোকেরা, অমন সূক্ষ্মভাবে, অমন নির্দয় কঠোরতার সাথে যে-বিপদ তাদেরকে ঘিরে ফেলছে চারদিক থেকে তার মুকাবিলায় বাঁচাতে পারবে তাদের আত্মাকে? আমরা বাস করছি অমন একটা সময়ে যখন অগ্রসরমান পশ্চিমের মুকাবিলায় আর নিষ্ক্রিয় থাকতে পারবে না প্রাচ্য। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক—হাজারো শক্তি এসে আঘাত করছে মুসলিম জাহানের দরোজায়। মুসলিম জাহান কি অভিভূত হয়ে পড়বে পশ্চিমী বিশ শতকের চাপে এবং এই প্রক্রিয়ায় হারাবে কেবল তার নিজের ঐতিহ্যিক রূপগুলিকে নয়, তার আত্মিক বুনিয়াদকেও ?

দুই

মধ্যপ্রাচ্যে আমি যে বছরগুলি কাটিয়েছি ১৯২২ থেকে ১৯২৬ তক, একজন সহানুভূতিশীল বাইরের লোক হিসাবে এবং এরপর থেকে, মুসলিম হিসাবে ইসলামী কওমের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যের অংশীদার রূপে সেই সময়টাতে আমি লক্ষ্য করেছি, কীভাবে ইউরোপীয়রা ধীরে ধীরে অপ্রতিহতভাবে মুসলমানদের তামদ্দুনিক জীবন ও রাজনৈতিক আযাদীকে গ্রাস করে চলেছে; এবং যেখানেই মুসলিম জাতিগুলি এই অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে নিজেদের বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সাধারণ জনমত তাদের প্রতিরোধকে আখ্যায়িত করছে 'জেনোফোবিয়া বলে, তাদের সরল বিশ্বাস আহত হয়েছে, এই মনোভাব নিয়ে!

মধ্যপ্রাচ্যে যা-কিছু ঘটছে তাকে এমনি স্থূলভাবে সরল করে দেখতে এবং মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান ইতিহাসকে কেবলমাত্র ইউরোপের স্বার্থের এলাকা বিচার করতে ইউরোপ বহুকাল ধ'রে অভ্যস্ত। যদিও পশ্চিমের সর্বত্র (বৃটেন ছাড়া) জনমত সব- সময়ই প্রচুর সহানুভূতি দেখিয়েছে আইরিশ আযাদী আন্দোলনের প্রতি অথবা (রাশিয়া ও জার্মানীর বাইরে) পোল্যাণ্ডের জাতীয় জাগরণের প্রতি, তবু মুসলমানদের এরূপ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের প্রতি সে সহানুভূতি কখনো সম্প্রসারিত হয়নি। পশ্চিমের প্রধান যুক্তিই হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ভাঙন এবং অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা; এবং প্রত্যেকটি সক্রিয় পশ্চিমী হস্তক্ষেপেরই উদ্দেশ্য, এই হস্তক্ষেপের উদ্যোক্তাদের মতে (এবং খালিস নিয়তের ভান করেই তারা এরূপ বলে থাকে), কেবল পশ্চিমের 'আইনসংগত' স্বার্থ সংরক্ষণ নয়, স্থানীয় লোকদের নিজেদের প্রগতি সাধনও বটে!

বাইরের প্রত্যেকটি সরাসরি, এমনকি, সদাশয় হস্তক্ষেপও যে একটি দেশের বিকাশকে কেবল বিঘ্নিতই করে, মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ের পশ্চিমী জ্ঞানার্থীরা তা বেমালুম ভুলে গিয়ে এ ধরনের দাবিগুলি গিলতে হামেশাই উৎসুক! তারা কেবল দেখে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি দ্বারা তৈরি নতুন রেলপথসমূহ; একটি দেশের সামাজিক কাঠামোর ধ্বংস তাদের নজরে পড়ে না। তারা নতুন বিজলীর কিলোয়াট্ গোণে, একটি জাতির আত্মগৌরবের উপর যে আঘাত হানা হয় তা গোণে না।

বল্কানে অস্ট্রিয়ার হস্তক্ষেপের যুক্তিসংগত অজুহাত হিসাবে অস্ট্রিয়া কর্তৃক বলকানকে 'সভ্য করার মিশন' যে-সব লোক কখনো গ্রহণ করবে না, তারাই কিন্তু একই রকমের অজুহাত সাগ্রহে গ্রহণ করে থাকে ব্রিটেনের বেলায় মিসরে, রাশিয়ার বেলায় মধ্য এশিয়ায়, ফ্রান্সের বেলায় মরক্কোতে এবং ইতালীর বেলায় লিবিয়াতে; এবং একথা কখনো তাদের মনে জাগে না যে, মধ্যপ্রাচ্য যে-সব সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যাধিতে ভুগছে তার অনেকগুলিই এই পশ্চিমী স্বার্থেরই প্রত্যক্ষ পরিণাম; একথাও তাদের মনে জাগে না যে, পশ্চিমী হস্তক্ষেপের অনিবার্য লক্ষ্য হচ্ছে আভ্যন্তরীণ যে ভাঙন এরি মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তাকে স্থায়ী এবং প্রশস্ততরো করে তোলা আর এভাবে সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির আত্মস্থ হওয়াকে অসম্ভব করে তোলা।

আমি এটা পয়লা অনুভব করতে শুরু করি ১৯২২ সনে, যখন আমি আরব আর জিওনিস্টদের বিরোধের ব্যাপারে ব্রিটিশ শাসকদের দ্বৈত ভূমিকা লক্ষ্য করি। আমার কাছে তা আরো পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে উঠলো ১৯২৩ সনের শুরুর দিকে, যখন অনেকগুলি মাস ফিলিস্তিনে ঘুরে ঘুরে কাটানোর পর আমি আসি মিসরে। মিসর তখন প্রায় একটানা বৈপ্লবিক আন্দোলন করে চলেছে ব্রিটিশ প্রটেক্টরেটের বিরুদ্ধে। যে-সব প্রকাশ্য জায়গায় ব্রিটিশ সেপাইরা প্রায়ই যেতো সেখানেই নিক্ষেপ করা হতো বোমা—এবং তার জবাব দেওয়া হতো নানারকম দমনমূলক পন্থায়—সামরিক শাসন, রাজনৈতিক গ্রেফতারী, নেতাদের নির্বাসন, পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া ইত্যাদির মাধ্যমে। কিন্তু এ ব্যবস্থাগুলি যতো কঠোরই হোক এর কোনোটিই জনসাধারণের আযাদী স্পৃহাকে দমিয়ে দিতে পারেনি। গোটা মিসরীয় জাতির মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েছিলো ব্যাকুল নিরুদ্ধ কান্নার ঢেউ-এর মতো একটা কিছু—নৈরাশ্যে নয়, বরং এ ছিলো ব্যগ্র উৎসাহজনিত কান্না, নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির মূল আবিষ্কারের উত্তেজনায় ক্রন্দন!

সেই দিনগুলিতে কেবলমাত্র ধনী পাশারা, বিশাল বিশাল জমিদারীর যারা ছিলো মালিক, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি তারাই ছিলো আপোসধর্মী। বাকী অগণিত মানুষ, যাদের মধ্যে ছিলো হতভাগা 'ফেলাহিনে'রা, এক একর জমি যাদের মনে হতো একটা গোটা পরিবারের জন্য আর্শীবাদস্বরূপ এক সম্পদ,তারা সবাই সমর্থন করতো আযাদী আন্দোলনকে। একদিন হয়তো শোনা গেলো, খবরের কাগজের হকারেরা রাস্তায় রাস্তায় চিৎকার করছে—'ওয়াফদ পার্টির সকল নেতা মিলিটারী গভর্নর কর্তৃক গেরেফতার', কিন্তু পরদিনই, নতুন নেতার দ্বারা পূর্ণ হয়ে যেতো তাদের স্থান—এভাবে, আযাদীর ক্ষুধা এবং বিদ্বেষ দুই বাড়তে থাকে। ইউরোপীয়দের এর জন্য একটি মাত্র শব্দই ছিলো—'জেনোফোবিয়া।

সে সময়ে আমার মিসরে আসার মূলে ছিলো একটি ইচ্ছা—আমি 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ'-এর জন্য আমার কাজের পরিসর সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলাম ফিলিস্তিনের বাইরে, অন্যান্য দেশেও। ডোরিয়ান মামার আর্থিক অবস্থা অমন ছিলো না যে তিনি আমার এই সফরের খরচ বহন করতে পারেন। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন, আমি এই সফরের জন্য অত্যুৎসুক তখন তিনি নিজেই অগ্রণী হয়ে আমাকে কিছু আগাম টাকা দিলেন, যাতে আমার জেরুজালেম থেকে কায়রো যাওয়া-আসার রেলের ভাড়া এবং সেখানে পনেরো দিন থাকার খরচ কোনো রকমে চলে।

কায়রোতে আমি থাকবার জায়গা পেলাম একটি চিপা গলিতে, যেখানে প্রধানত আরব হস্তশিল্পী ও গ্রীক দোকানদাররাই বাস করতো। আমার বাড়ির মালিক ছিলেন ত্রিয়েস্তিনের এক বৃদ্ধা, দীর্ঘাংগী, ভারিক্কি, এলোমেলো, শুভ্রকেশী। তিনি সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত কড়া গ্রীক শরাব গলায় ঢালতেন এবং এক মেজাজ থেকে আরেক মেজাজে হোঁচট খেয়ে পড়তেন। তাঁর মেজাজ ছিলো খুবই উগ্র আর তীব্র, যা কখনো তার নিজ স্বরূপ বুঝতো বলে মনে হয় না। কিন্তু তিনি আমার প্রতি ছিলেন বন্ধুভাবাপন্না, আর তাঁর

উপস্থিতিতে আমার ভালোই লাগতো।

প্রায় এক হপ্তা পরে আমার হাতের নগদ টাকা প্রায় ফুরিয়ে এলো। আমার ইচ্ছা ছিলো না যে আমি অতো তাড়াতাড়ি ফিলিস্তিনে আমার মামার বাড়ির নিরাপত্তায় ফিরে যাই। তাই আমি আমার রুজির অন্য উপায় খুঁজতে শুরু করি।

আমার জেরুজালেমের বন্ধু ডঃ দ্য হা'ন কায়রোর এক ব্যবসায়ীর নিকট একটি চিঠি দিয়েছিলেন আমার পরিচয় দিয়ে। আমি তাঁর কাছেই গেলাম পরামর্শের জন্য। তিনি হল্যাণ্ডের লোক; দেখলাম, তিনি খুবই উদার আর সহৃদয়, আর তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে বহু দূর বিস্তৃত তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক ঔৎসুক্য ও আকর্ষণ। ইয়াকব দ্য হা'নের চিঠি থেকে তিনি জানতে পারলেন যে, আমি 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ'-এর একজন সংবাদদাতা। তাঁর অনুরোধে আমি যখন তাঁকে হালে ছাপা আমার কয়েকটি প্রবন্ধ দেখালাম, বিস্ময়ে তাঁর চোখের ভুরু একেবারে কপালে উঠে গেলো ঃ

—'বলুন, আপনার বয়স কতো?'

—'বাইশ বছর।'

—' তা' হলে মেহেরবানী করে আমাকে অন্য কথা বলুন। এই প্রবন্ধগুলি দিয়ে আপনাকে কে সাহায্য করেছে?—দ্য হা'ন?'

আমি হাসলাম—'অবশ্যি নয়, আমি নিজেই লিখেছি! আমি আমার কাজ হামেশা নিজেই করি। কিন্তু আপনি সন্দেহ করছেন কেন?'

তিনি তাঁর মাথা নাড়েন যেনো বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে—'কিন্তু খুবই তাজ্জব মনে হচ্ছে...এ ধরনের প্রবন্ধ লেখার পরিপক্কতা আপনি কোথেকে পেলেন? আপনি কেমন করে অর্ধেক একটি বাক্যে, যে-সব ব্যাপার অতো সাধারণ বলে মনে হয়, তাতেও প্রায় মরমী এক তাৎপর্য দান করেন?'

এর মধ্যে যে শ্রদ্ধা লুকানো ছিলো তাতে আমি অতোটা গৌরববোধ করি যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ফলে, আমার আত্মমর্যাদাবোধ বেড়ে গেলো অনেক। আমার এই নতুন পরিচিত দোস্তের সাথে আলোচনায় বোঝা গেলো, তাঁর নিজের ব্যবসায়ে কর্ম-সংস্থানের কোনো সুযোগ নেই; কিন্তু তিনি মনে করেন, তিনি হয়তো একটি মিসরীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে আমাকে একটি কাজ যোগাড় করে দিতে পারেন—যে প্রতিষ্ঠানটির সংগে রয়েছে তাঁর নিজের লেনদেন।

তিনি আমাকে যে অফিসটি দেখিয়ে দিলেন সেটি ছিলো কায়রোর এক প্রাচীনতরো মহল্লায়। আমার বাসা থেকে তা খুব দূরে ছিলো না ঃ একটি চিপা গলি—যার দু'পাশে রয়েছে এককালের অভিজাত বাড়িঘর; এখন যা অফিস আর সস্তা এপার্টমেন্টে রূপান্তরিত। আমার ভাবী মুনিব একজন বয়স্ক, টেকো, মিসরীয় ব্যবসায়ী, যার মুখখানা সময়ে-পাকা এক শকুনেরই মুখের মতো। তাঁর একজন পার্ট-টাইম কেরানী দরকার, তাঁর হয়ে ফরাসী ভাষায় চিঠি-পত্রের আদান-প্রদানের জন্য। আমি তাঁকে এ বিষয়ে সন্তুষ্ট করতে পারলাম যে, এ দায়িত্ব পালন আমি করতে পারবো, যদিও ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা আমার একদম নেই। আমাকে মাত্র তিন ঘণ্টা কাজ করতে হবে। সে অনুপাতে মাইনেও কম, কিন্তু এ

মাইনেও আমার বাড়িভাড়া চুকানো আর অনির্দিষ্টকাল আমাকে রুটি, দুধ ও জলপাই-এ তৃপ্ত রাখার জন্য ছিলো যথেষ্ট।

আমার বাসা আর অফিসের মধ্যেই পড়ে কায়রোর বারাংগনা পল্লী। এলাকাটি হচ্ছে একটি জটিল গোলক-ধাঁধাঁ বিশেষ, যেখানে অভিজাত আর নীচ বারাংগনারা কাটায় তাদের দিন আর রাত। বিকালে আমি যখন কাজে যাই অলিগলিগুলি দেখি শূন্য, নীরব। ঘুলঘুলি দেয়া জানালার ছায়ায় কোনো নারী হয়তো তার দেহ ছড়িয়ে দিতো আলসভরে; এ-বাড়ি না হয় ও-বাড়ির সম্মুখে, ছোটো ছোটো টেবিলের পাশে বসে গম্ভীর মুখে, দাড়িওয়ালা লোকদের সাথে, শান্তভাবে কফি পান করে বালিকারা, আর তারা ঐকান্তিকতার সব লক্ষণ সমেত, অমন সব বিষয়ে আলাপ করে যা সব রকমের উত্তেজনা আর দৈহিক মত্ততা থেকে অনেক দূরের বলে মনে হতো।

কিন্তু সন্ধ্যায় যখন আমি ঘরে ফিরে আসি তখন দেখতে পাই মহল্লাটি অন্য যে-কোনো মহল্লা অপেক্ষা অধিকতরো প্রাণবন্ত। আরবীয় বাঁশির নরম মোলায়েম সুর এবং ঢোল ও নারীর হাসিতে গুঞ্জন উঠেছে মহল্লাটিতে। বহু বিজলী বাতি আর রঙিন লণ্ঠনের আলোর নিচ দিয়ে যখন আপনি হাঁটছেন, প্রতি পদক্ষেপেই একটি মোলায়েম বাহু জড়িয়ে ধরবে আপনার গলায়, বাহুটি হতে পারে বাদামী অথবা সাদা—কিন্তু সব-সময়ই তা সোনা ও রূপার চেন আর চুড়িতে ঝনঝন করবে এবং সবসময়ই তাতে পাওয়া যাবে মেশ্‌ক, গুগ্‌গুল ও উষ্ণ জন্তু-ত্বকের গন্ধ। আপনাকে খুবই দৃঢ় থাকতে হবে—নিজেকে এই সব সহাস্য আলিংগন এবং 'ইয়া হাবিবী' 'হে আমার প্রিয় সাআদাতাক্', 'সুখী হও তুমি'— এই সব আহবান থেকে মুক্ত রাখতে। আপনাকে পথ করে যেতে হবে স্পন্দিত অংগ-প্রত্যংগের মধ্য দিয়ে, যার অধিকাংশই সরল, সুন্দর এবং ইংগিতপূর্ণ দেহ-ভাজ দ্বারা আপনাকে মাতিয়ে দেয়। গোটা মিসর যেন ভেঙে পড়ছে আপনার উপর, ভেঙে পড়ছে মরক্কো, আলজিরিয়া, ভেঙে পড়ছে সুদান, নুবিয়া, ভেঙে পড়ছে আরব, আর্মেনিয়া, সিরিয়া, ইরান—গৃহের দেয়ালের সাথে লম্বালম্বি করে রাখা বেঞ্চির উপর পাশাপাশি বসেছে লম্বা, রেশমী জামা-কাপড় পরা লোকেরা...হর্ষে উৎফুল্ল...হাসছে, মেয়েদের ডাকছে, অথবা নীরবে নারকেলের হুকা টানছে। ওরা সকলেই কিন্তু এখানকার 'খদ্দের' নয়...অনেকেই এসেছে, এই মহল্লার গতানুগতিকতামুক্ত হর্ষোৎফুল্ল আবহাওয়ায় দু-একটা ঘণ্টা কাটাতে...কখনো বা আপনাকে পিছিয়ে যেতে হচ্ছে সুদানের ছেঁড়া-জীর্ণ কাপড় পরা দরবেশের সমুখ হতে, যিনি ভিক্ষা চেয়ে গান গাইছেন আবিষ্ট মুখে, অনড় দু'হাত বাড়িয়ে। সুগন্ধি বিক্রেতা হকারের দোলায়মান ধুনুচি থেকে ওঠা ধূপের ধোঁয়া, কুণ্ডলী-পাকানো মেঘের আকারে আপনার মুখকে বুরুশ্ করে দিচ্ছে! প্রায়ই আপনি শুনতে পাচ্ছেন মিলিত কণ্ঠে গান এবং আপনি বুঝতে শুরু করবেন শোঁ শোঁ করা, মোলায়েম আরবী ধ্বনিগুলির কোনো কোনোটির অর্থ।...এবং ঘুরে ফিরে আপনি শুনতে পাচ্ছেন কোমল, কল-কল্লোলের মতো, সুখের উক্তি...ঔসব বালিকার জান্তব সুখ (কারণ ওরা সন্দেহাতীতভাবেই উপভোগ করছিলো নিজেদেরকে), যাদের পরনে রয়েছে হালকা-নীল, হলদে, লাল, সবুজ, সাদা, ঝিলিক-মারা সোনালি পোশাক, মিহি রেশমী, সূক্ষ্ম জালি জালি

করে বোনা পাতলা টিউল, ভয়েল অথবা বুটিদার কাপড়ে তৈরি—আর ওদের হাসি যেনো নুড়ি বিছানো ফুটপাতের উপর দিয়ে বিড়ালের মতো নিঃশব্দ পদক্ষেপে ছুটে চলেছে—এই উচ্ছ্বসিত, এই নিম্নগামী এবং পরমুহূর্তেই আবার স্ফূরিত হচ্ছে অন্যদের ওষ্ঠ থেকে...।

এই মিসরীয়রা—কী করে ওদের পক্ষে সম্ভব হতো এই হাসি? কী আনন্দ আর ফূর্তির সংগেই না ওরা, দিন নেই রাত নেই, চলতো কায়রোর পথে পথে, দুলুনী চালে, লম্বা লম্বা ধাপে পা ফেলতে ফেলতে, ওদের দীর্ঘ শার্টের মতো 'গাল্লাবিয়া' গায় দিয়ে, যাতে থাকতো ডোরা, রংধনুর প্রত্যেকটি রঙের—চলতো ওরা লঘু চিত্তে, মুক্ত মনে, যাতে করে মনে হতো, মানুষের জীবনকে চূর্ণ করা দারিদ্র্য, অসন্তোষ আর রাজনৈতিক বিক্ষোভ, এ সমস্তকে মানুষ গুরুত্ব দেয় কেবলি আপেক্ষিক অর্থে। এই মানুষগুলির প্রচণ্ড বিস্ফোরণমুখী উত্তেজনায় সবসময়ই, দৃষ্টিগ্রাহ্য কোনো ভাবান্তর ছাড়াই অবকাশ থাকতো। পরিপূর্ণ শান্তি, এমনকি আলস্যের যেনো কিছুই কখনো ঘটেনি এবং কিছুই খোয়া যায়নি। এজন্য অধিকাংশ ইউরোপীয়রা মনে করতো (এবং হয়তো এখনো মনে করে) আরবরা মানুষ হিসাবে লঘু, ভাসাভাসা। কিন্তু প্রথমদিকে, সেই দিনগুলিতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম—আরবদের প্রতি পশ্চিমের এই তাচ্ছিল্যের মূলে রয়েছে যে-সব আবেগ 'গভীর' প্রতীয়মান হয় সেগুলিকে অতি-গুরুত্ব দেয়ার প্রবণতা এবং যা-কিছু 'লঘু' 'ভাসাভাসা, যা-কিছু হাল্কা, বায়বীয় এবং নির্ভার তাকেই নিন্দা করার প্রবণতা। আমি উপলব্ধি করেছিলাম—যে-সব মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাত ও চাপ পশ্চিমের বৈশিষ্ট্য আরবরা মুক্ত রয়েছে সেগুলি থেকে। কাজেই আমাদের মাপকাঠি আমরা ওদের বেলায় কী করে ব্যবহার করতে পারি? ওদের যদি 'লঘু' ভাসাভাসাই মনে হয়, তারো কারণ হয়তো এই যে, ওদের আবেগগুলি দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মুকাবিলা না করেই স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয় ওদের আচরণের মধ্যে। হয়তো 'পশ্চিমীকরণের' চাপে ওরাও ধীরে ধীরে বাস্তবের সাথে সাক্ষাৎ যোগাযোগের এই স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বসবে। কারণ, ঐ পশ্চিমী প্রভাব নানাভাবে সমকালীন আরব চিন্তার ক্ষেত্রে একটা উদ্দীপক ও ফলপ্রসূ নিমিত্ত হওয়া সত্ত্বেও অনিবার্যভাবেই তা আরবদের মধ্যে সেই সব মারাত্মক সমস্যাই সৃষ্টি করে যার দ্বারা পশ্চিমের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবন পীড়িত, বিড়ম্বিত।

... ...

আমার ঘরের ঠিক বিপরীতদিকেই—এবং অতো নিকেট যে আমি হাত বাড়িয়ে প্রায় নাগাল পেতে পারি—দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটা মসজিদ, যার রয়েছে সরু একটি মিনার, যে-মিনার থেকে রোজ পাঁচবার সালাতের জন্য দেয়া হয় আযান। সাদা পাগড়ি পরা একজন লোক মিনারে চড়ে দু'হাত তুলে সুর করে গায়—'আল্লাহু-আকবর'—আল্লাহ্ মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল...ও যখন ধীরে ধীরে চারদিকে মুখ ফেরায় তার কণ্ঠের ধ্বনি উঠতে থাকে উর্ধ্ব দিকে, পরিষ্কার হাওয়ায় তা বুলন্দ হয়ে ওঠে, আরবী ভাষায়—গলা থেকে-আসা গভীর শব্দগুলির উপর দোল খেতে খেতে, আন্দোলিত হয়ে, কখনো আগিয়ে, কখনো পিছিয়ে। ওর গলার স্বর গাঢ় উদাত্ত,

মোলায়েম এবং দৃঢ়—যার মধ্যে অবকাশ রয়েছে অনেক ওঠা–নামার। কিন্তু আমি বুঝতে পারি, তপ্ত আবেগই কণ্ঠস্বরকে করেছে সুন্দর, বলার চাতুর্য নয়!

—'মুয়াজ্জিন'–এর এই সুর ছিলো কায়রোতে আমার দিবস ও সন্ধ্যার মূল সংগীত—ঠিক যেমন তা আমার জন্য মূল সংগীত ছিলো প্রাচীন জেরুজালেম নগরীতে এবং পরবর্তীকালেও মুসলিম দেশগুলিতে তা–ই আমার প্রত্যেকটি সফরকালে বিদ্যমান ছিলো আমার একমাত্র সংগীতরূপে। উপভাষার পার্থক্য এবং লোক–সমাজের রোজকার কথাবার্তার উচ্চারণের যে বৈষম্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা সত্ত্বেও আযান ঘোষিত হয় সর্বত্র ঃ শব্দের এই ঐক্য থেকে, আমি আমার কায়রোর সেই দিনগুলিতেই উপলব্ধি করি, সকল মুসলমানের মধ্যে অন্তরের ঐক্য কতো গভীর এবং তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের যে রেখা রয়েছে তা কতো কৃত্রিম আর অর্থহীন। ওদের চিন্তার পদ্ধতি একই, ভাল–মন্দ সৎ–অসতের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের বেলায় সকল মুসলমানই এক এবং মহৎ জীবনের উপাদানগুলি সম্পর্কে ওদের ধারণাও অভিন্ন!

এই প্রথমবারের মতো আমার মনে হলো আমি অমন একটি জনগোষ্ঠীর দেখা পেয়েছি যেখানে মানুষে মানুষে আত্মীয়তা, দৈবক্রমে একই রক্ত—বংশজাত হওয়ার উপর বা অর্থনৈতিক স্বার্থভিত্তিক নয়—বরং তার ভিত্তি অনেক বেশি গভীর, অনেক বেশি স্থায়ী কিছু। এ আত্মীয়তার উৎস একই দৃষ্টিভংগি, যে দৃষ্টিভংগি মানুষে মানুষে নিঃসংগতাস্বরূপ যতো রকম প্রতিবন্ধক রয়েছে সমস্ত কিছুকেই করে উন্মুলিত।

১৯২৩ সনের গ্রীষ্মে মধ্যপ্রাচ্যের জীবন ও রাজনীতি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছতরো দৃষ্টিভংগিতে সমৃদ্ধ হয়ে আমি ফিরে আসি জেরুযালেমে।

আমার বন্ধু ইয়াকব্ দ্য হানের সহায়তায় পার্শ্ববর্তী এলাকা ট্রান্সজর্ডানের আমীর আবদুল্লাহ্র সাথে আমি পরিচিত হই। তিনি আমাকে দাওয়াত করেন তাঁর মুলুকে। এখানেই আমি পয়লা দেখলাম একটা খাঁটি বেদুঈন দেশ। রাজধানী আম্মান, টলেমিআস ফিলাডেলফাস কর্তৃক নির্মিত গ্রীক উপনিবেশ ফিলাডেলফিয়ার ধ্বংসাবশেষের উপর তৈরি একটি ছোট শহর ছিলো তখন । লোক সংখ্যা ছয় হাজারের বেশি ছিলো না। রাস্তাঘাটগুলি ভর্তি বেদুঈনদের দ্বারা, খোলা স্তেপ অঞ্চলের খাঁটি বেদুঈন, যাদের ক্বচিৎ দেখা যায় ফিলিস্তিনে—স্বাধীন যোদ্ধা আর উটপালক বেদুঈন! সার্কাসিয়ান গরুর গাড়িগুলি (কারণ, শহরটি প্রথম আবাদ করেছিলো সার্কাসিয়ানরা; ওরা উনিশ শতকে ওদের স্বদেশ রাশিয়ানরা দখল করে নিলে এদেশে চলে এসে এখানে বসতি স্থাপন করে) আস্তে আস্তে কষ্টে–সৃষ্টে চলতো বাজারের মধ্য দিয়ে। বাজারটি আকারে বড় হলেও এতে যে হট্টগোল ও উত্তেজনা দেখা যেতো তা অনেক বেশি বড়ো এক নগরীকেই মানায়।

শহরে দালান–কোঠা খুব বেশি ছিলো না; তাই আমীর আবদুল্লাহ্ তখন বাস করছিলেন পাহাড়ের উপর এক তাঁবু খাটানো ক্যাম্পে; পাহাড়টি যেনো উপর দিক হতে তাকিয়ে আছে নিচে, আম্মানের দিকে। তাঁর তাঁবুটি ছিলো অন্যান্য তাঁবুর চেয়ে কিছুটা বড়ো; তার মধ্যে ছিলো ক্যানভাসের পার্টিশন দেয়া কয়েকটি কোঠা; চূড়ান্ত সরলতায়

তাঁবুটি আলাদা ছিলো অন্য সকল তাঁবু থেকে। এরি একটি কোঠায়, এক কোণে জমিনের উপর কালো ভালুকের চামড়া বিছিয়ে তৈরি করা হয়েছে বিছানা। অভ্যর্থনা কোঠায়, কেউ যখন গালিচার উপর বসতো তখন তার বাহুদ্বয় রাখার জন্য সেখানে ছিলো রূপার কাজ-করা অগ্রভাগ বিশিষ্ট এক জোড়া সুন্দর উটের জীন।

আমীরে'র প্রধান পরামর্শদাতা ডঃ রিজা তওফিক বে'র সাথে যখন আমি তাঁবুতে ঢুকলাম, তখন কেবল একজন নিগ্রোই ছিলো সেখানে, যার পরনে ছিলো জমকালো ব্রোকেডের জামা-কাপড় আর কোমরে একটি সোনার ছুরি। রিজা তওফিক বে' ছিলেন একজন তুর্কী, আগে ছিলেন এক বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক, আর কামাল আতাতুর্কের আগে, তিন বছরের জন্য ছিলেন তুর্কী মন্ত্রিসভার একজন সদস্য। তিনি আমাকে বললেন, আমীর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরবেন। এই মুহূর্তে তিনি কয়েকজন বেদুঈন সর্দারের সাথে আলাপ করছেন দক্ষিণ ট্রান্সজর্ডানে সর্বশেষ নযদী হানা নিয়ে। ঐ সব নযদী ওয়াহাবীরা, ডঃ রিজা আমাকে বোঝালেন, ইসলামের অভ্যন্তরে অমন একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছে যা খৃশ্চান জগতের গোঁড়া সংস্কারপন্থীদের থেকে আলাদা নয়, কারণ ওরা পীর-দরবেশের পূজার ঘোর বিরোধী, বহুশতকের পরিক্রমায় যে-সব মরমী কুসংস্কার ইসলামের ভেতরে ঢুকে পড়েছে সেগুলিরও ঘোর বিরোধী। তা'ছাড়া, ওরা শরীফী খান্দানেরও আপোসহীন দুশমন, যে-খান্দানের প্রধান হচ্ছে 'আমীরে'র পিতা, হিজাজের বাদশাহ্ হোসাইন। রিজা তওফিক বে'র মতে, ওয়াহাবীদের ধর্মীয় মতামত সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা যায় না; আসলে, ওদের মতামত, অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে যে-সব ধারণা রয়েছে তার চেয়ে আল্ কুরআনের মর্মের অনেক কাছাকাছি। আর তা ইসলামের সাংস্কৃতিক বিকাশের উপর বিস্তার করতে পারে এক কল্যাণকর প্রভাব। অবশ্য ওদের অতিশয় গোড়ামি অন্যান্য মুসলমানের পক্ষে ওয়াহাবী আন্দোলনকে পুরাপুরি বোঝা কিছুটা কঠিন করে তুলেছে; আর এই ক্রটি, তিনি বলেন, কোনো কোনো বিশেষ মহলে হয়তো অনভিপ্রেত নয়, যারা আরব জাতিগুলির সম্ভাব্য পুনর্মিলনকে এক ভয়ংকর বিপদের সম্ভাবনা বলে গণ্য করে।

কিছুক্ষণ পর 'আমীর এসে ঢুকলেন। চল্লিশের মতো বয়েস—মাঝারী আকৃতি, ছোটো সোনালী রঙের দাড়ি, কালো প্যাটেন্ট চামড়ার চটি পায়ে, মৃদু পদক্ষেপে, সাদা ঝকঝকে রেশমের ঢিলা আরবী পোশাকে—যার উপরে রয়েছে প্রায় স্বচ্ছ সাদা সূতী 'আবায়া। তিনি বললেন ঃ

—'আহ্লান ওয়া সাহ্লান,—'এ আপনারই ঘর, সহজ হোন', এই প্রথম আমি শুনলাম—এই সুন্দর আরবী অভিবাদন!

আমীর আব্দুল্লাহ্র ব্যক্তিত্বের মধ্যে অমন কিছু রয়েছে যা আকর্ষণীয়, যা প্রায় বলপূর্বক জয় করে নেয় মানুষকে—আর সে জিনিস হচ্ছে তাঁর প্রগাঢ় রসবোধ, তাঁর আবেগ-তৃপ্ত কথাবার্তা আর তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। সে সময় যে তিনি কী জন্য তাঁর লোকজনের কাছে অতো জনপ্রিয় ছিলেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। অবশ্য তিনি তুর্কীদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের প্ররোচিত শরীফীয় বিদ্রোহে যে ভূমিকা গ্রহণ করেন তার জন্য বহু আরব খুশি ছিলো না।

ওরা তাঁর এই ভূমিকাকে মুসলিমের প্রতি মুসলিমের বিশ্বাসঘাতকতা বলেই মনে করতো। তা সত্ত্বেও জিওনিজমের বিরুদ্ধে আরবদের স্বার্থ রক্ষায় নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তিনি বেশ কিছুটা মর্যাদা হাসিল করেন। সেদিন তখনো আসেনি যখন তার রাজনীতির পাক্‌চক্র তাঁর নামকে গোটা আরব জাহানে করে তুলবে ঘৃণ্য।

হাব্‌শী পরিচারক, ছোটো ছোটো যে পেয়ালায় আমাদের কফি পরিবেশন করলো, তা থেকে চুমুক দিয়ে কফি খেতে খেতে আমরা কথা বলছিলাম। মাঝে মাঝে আমাদের সাহায্য করছিলেন ডঃ রিজা, তিনি চমৎকার ফরাসী বলতেন। আমরা কথা বলছিলাম এই নতুন দেশ ট্রান্সজর্ডানের শাসন বিষয়ক অসুবিধাগুলি নিয়ে। ওখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই অস্ত্র নিয়ে চলাফেরা করে এবং কেবল নিজের কবিলার আইন-কানুন মানতেই সে অভ্যস্ত।—'কিন্তু, 'আমীর বললেন, 'আরবদের কাণ্ডজ্ঞান চমৎকার। বেদুঈনরা পর্যন্ত বুঝতে শুরু করেছে—বিদেশী প্রভুত্ব থেকে মুক্ত হতে হলে, ওদের পুরানো যেমন-খুশি চলার অভ্যাস অবশ্যি বর্জন করতে হবে। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যেসব ঝগড়া-ফাসাদের কথা আপনি নিশ্চয় শুনে থাকবেন সেগুলি এখন ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে।

এরপর তিনি অসংযত চঞ্চল বেদুঈনদের বর্ণনা করে চলেন ঃ ওরা সামান্যতম উসিলায়ই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে থাকে। ওদের খান্দানগত শত্রুতা প্রায়ই বহু পুরুষ ধরে চলতে থাকে এবং কখনো কখনো তা পিতা থেকে পায় পুত্র, এমনকি শতাব্দির পর শতাব্দি ধ'রে—যার ফলে চলতে থাকে নিত্যনতুন খুনজারি, রক্তপাত এবং নবতরো তিক্ততা, আদি কারণটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেলেও। শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ মাত্র একটিই আছে; পূর্বতন নিহত ব্যক্তিটির গোত্র ও কবিলার কোনো জোয়ান যদি অপরাধীর গোত্র ও কবিলার কোনো কুমারীকে অপহরণ করে এবং তাকে বিয়ে করে, তাহলে বিয়ের রাতের রক্ত—যা খুনীর কবিলার রুক্ত—প্রতীক-রূপে এবং চূড়ান্তভাবে, হত্যার সময় যে রক্তপাত করা হয়েছিলো তারই প্রতিশোধরূপে গণ্য হয়। মাঝে মাঝে দেখা যায়, বহু পুরুষ ধরে বিদ্যমান শত্রুতায় উভয় গোত্রের লোকেরাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কারণ তাতে উভয় দলেরই শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। এমন সব ক্ষেত্রে প্রায়ই তৃতীয় গোত্রের কোনো ঘটক কর্তৃক অপহরণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

—'আমি এর চাইতেও ভালো করেছি', আমীর আমাকে বললেন, 'আমি যথার্থ খান্দানী শত্রুতা কমিশন' গঠন করেছি; এই কমিশন বিশ্বস্ত লোকদের নিয়ে গঠিত। ওরা সারা দেশে ঘুরে বেড়ায় এবং বিবদমান গোত্রগুলির মধ্যে এই ধরনের প্রতীকী অপহরণ ও বিয়ের ব্যবস্থা করে থাকে। 'কিন্তু', বলতে বলতে তাঁর চোখ ঝিলিক দিয়ে ওঠে—'আমি সবসময় কমিশনের সদস্যদের বোঝাবার চেষ্টা করি'—যেনো তারা কুমারীদের নির্বাচন করতে গিয়ে হুশিয়ারির সাথে কাজ করে—কারণ, আমি চাই না যে, বরের সম্ভাব্য হতাশার কারণে আবার পরিবারের 'ভেতরেই শত্রুতা সৃষ্টি হোক'।...

দরমের আড়াল থেকে বার হয়ে একটি বালক, বারো বছরের মতো ওর বয়স। সন্ধ্যার আঁধার নামা তাঁবুর কামরার ভেতর দিয়ে ও ছুটে যায় ক্ষিপ্রগতিতে, নিঃশব্দ পদক্ষেপে, আর তাঁবুর বাইরে রাখা একটা ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে, রেকাবে

পা না রেখেই; একটি নওকর, ঘোড়াটিকে ধরে দাঁড়িয়েছিলো—ওরি জন্য প্রস্তুত ছিলো ঘোড়াটিঃ ছেলেটি আর কেউ নয়, 'আমীরে'র বড়ো ছেলে তালাল; তার হাল্‌কা দেহে, ঘোড়ার পিঠে একলাফে তার আরোহণে, তার উজ্জ্বল চাউনিতে আবার আমি লক্ষ্য করলাম সেই জিনিসঃ নিজের জীবনের সাথে স্বপ্নমুক্ত বাস্তব যোগ, যা আমি ইউরোপে যা-কিছু জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম তার সব কিছু থেকেই আরবকে স্থাপন করেছে অত দূর ব্যবধানে!

তাঁর ছেলের প্রতি আমার এই সুস্পষ্ট সপ্রশংস দৃষ্টি লক্ষ্য করে 'আমীর' বললেন—'অন্য প্রত্যেকটি আরব শিশুর মতোই সে বেড়ে উঠেছে কেবল একটিমাত্র চিন্তা মনে নিয়ে ঃ মুক্তি, আযাদী।' আমরা আরবরা মনে করি না যে, আমাদের কোনো ত্রুটি নেই অথবা আমরা ভুল থেকে মুক্ত। তবে আমরা আমাদের ভুলগুলি নিজেরাই করতে চাই এবং এভাবে শিখতে চাই—কেমন ক'রে এই ভুলগুলি থেকে বাঁচা যায়। ঠিক যেমন একটি গাছ বাড়তে বাড়তেই জানে কেমন করে বাড়তে হয়; কিংবা একটি স্রোত চলতে চলতে খুঁজে পায় ওর নিজের সঠিক চলার পথ। যে সব লোকের নিজেদের কোনো প্রজ্ঞা নেই—যাদের আছে কেবল ক্ষমতা আর বন্দুক আর অর্থবিত্ত, যারা জানে কেবল সেইসব বন্ধুদের হারাতে যাদেরকে ওরা সহজেই রাখতে পারতো নিজেদের বন্ধুরূপে—আমরা চাই না যে, তারা আমাদেরকে প্রজ্ঞার পথ দেখাক!'[১]

অনির্দিষ্টকালের জন্য ফিলিস্তিনে থাকার ইচ্ছা আমার ছিলো না। ইয়াকব দ্য হা'ন আবার ছুটে এলেন আমার সাহায্যে। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিলো সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইউরোপের সর্বত্র নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে ছিলো তাঁর সম্পর্ক। তাঁর সুপারিশের ফলে আমি দুটি ছোট্ট খবরের কাগজের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে সক্ষম হই ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ লেখার জন্য; কাগজ দু'টির একটি ইংল্যাণ্ডের, অপরটি সুইজারল্যাণ্ডের। চুক্তি হলোঃ কাগজ দু'টি আমার পারিশ্রমিক পরিশোধ করবে ডাচ্ গিল্ডারে এবং সুইস্ ফ্রাঁ-তে। কাগজগুলি ছিলো প্রাদেশিক ধরনের আর এদের খুব বেশি মর্যাদাও ছিলো না। মোটা মাইনা দেবার ক্ষমতা ওদের ছিলো না। কিন্তু আমার চালচলন সরল হওয়ায় ওদের কাছ থেকে আমি যে অর্থ পেলাম তাই আমার পরিকল্পিত মধ্যপ্রাচ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত সফরের খরচের জন্য যথেষ্ট মনে হলো।

আমার ইচ্ছা ছিলো—প্রথমে আমি যাই সিরিয়ায়। কিন্তু ফরাসী কর্তৃপক্ষ, যারা সবেমাত্র এক শত্রুভাবাপন্ন জনতার মাঝখানে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে, অস্ট্রিয়ার একজন প্রাক্তন বিদেশী শত্রু-সৈন্যকে প্রবেশ পত্র দিতে রাজী ছিলো না। এ আঘাত ছিলো নিষ্ঠুর; কিন্তু এ ব্যাপারে আমার করবার কিছুই ছিলো না। তাই আমি স্থির করলাম—আমি

১. সে সময়ে (১৯২৩) কেউই আঁচ করেনি যে, পরবর্তীকালে আমীর আবদুল্লাহ এবং তাঁর পুত্র তালালের সম্পর্ককে নষ্ট করে দেবে তীব্র বিরোধিতা—পুত্র ঘেন্না করছেন আরব জগতে ব্রিটিশ নীতির প্রতি তাঁর পিতার আপস মনোভাবকে এবং পিতা তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ করছেন তাঁর তীব্র স্পষ্ট ভাষণের বিরুদ্ধে। তখন কিংবা পরে তালালের মধ্যে কখনো আমি দেখিনি—কোনো 'মানসিক ব্যাধির লক্ষণ, যে ওজুহাত তাঁকে ১৯৫২ সনে বাধ্য করা হয় জর্ডানের তখ্‌ত ত্যাগ করতে।

হাইফা যাবো এবং সেখানে গিয়ে জাহাজে উঠবো ইস্তাম্বুলের পথে। বলাবাহুল্য এ–ও ছিলো আমার পরিকল্পনার অন্তর্গত।

জেরুযালেম থেকে হাইফা যাওয়ার ট্রেনে সফরে আমি এক মুসিবতে পড়ি। আমার একটা কোট পথে হারিয়ে যায়, যার মধ্যে ছিলো আমার ছাড়পত্র আর একটি ছোট্ট থলে। আমার কাছে রইলো কেবল কটি রূপার মুদ্রা আমার প্যান্টের পকেটে। কাজেই এখনকার মতো আমার ইস্তাম্বুল যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে নাঃ পাসপোর্ট নেই, টাকাও নেই। বাসে করে জেরুযালেম ফেরা ছাড়া আমার আর কোনো গতি রইলো না। ভাড়া পরিশোধ করতে হবে সেখানে পৌঁছুনোর পর, বরাবরকার মতোই, ডোরিয়ান মামার কাছ থেকে ধার ক'রে। জেরুযালেম আমাকে অপেক্ষা করতে হবে কয়েক সপ্তাহ, কায়রোর অস্ট্রীয় কনসুলেট থেকে একটি ছাড়পত্রের জন্য (কারণ, তখন ফিলিস্তিনে কোনো কনসুলেট ছিলো না) এবং হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ড থেকে আরো কিছু অর্থের জন্য।

এমনি করে পরদিন সকালবেলা আমি গিয়ে হাজির হই হাইফার প্রান্তে, একটি বাস–অফিসে। ভাড়া সম্পর্কে কথাবার্তা শেষ করে নিলাম। বাস ছাড়ার তখনো এক ঘন্টা বাকি। সময় কাটানোর জন্য আমি রাস্তায় পায়চারি শুরু করি, কখনো সামনে, কখনো পেছনে ফিরে আসি; নিজের প্রতি আমার অপরিসীম বিরক্তি—বিরক্তি আমার ভাগ্যকে নিয়ে যা আমাকে বাধ্য করেছে জীবন সংগ্রামে অমন হীনভাব পিছু হটতে। ইন্তেজারি সবসময়ই অপ্রীতিকর—এবং জেরুযালেম প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে, আমার এই চিন্তা, এই পরাজয়বোধ ছিলো সবচাইতে তিক্ত, বেশি করে আরো এ কারণে যে, এরূপ সামান্য টাকা–পয়সা নিয়ে আমি আমার পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারবো কি–না, এ সম্বন্ধে ডোরিয়ান ছিলেন হামেশাই সন্দিহান। তাছাড়া আমি সিরিয়া সফর করতে পারবো না এবং আল্লাহই জানেন, আবার কখনো আমি আসতে পারবো কি–না পৃথিবীর এই এলাকায়। এ সম্ভাবনা অবশ্যি ছিলো যে, পরবর্তী কোনো সময় 'ফ্রাঙ্কফুর্টার শাইটুঙ' মধ্যপ্রাচ্যে আমার আরেকটি সফরের খরচ বহন করতে পারে এবং ফরাসী সরকারও পারে কোনো একদিন প্রাক্তন–শত্রু বিদেশীদের উপর থেকে তাদের বাধা–নিষেধ তুলে নিতে। কিন্তু তা নিশ্চিত ছিলো না এবং ইত্যবসরে দামেশ্‌ক সফরের সৌভাগ্য আমার এবার আর হলো না...'কেন' আমি নিজেকে জিগ্‌গাস করি, তিক্তভাবে, 'দামেশ্‌ক নিষিদ্ধ হলো আমার জন্য?'

কিন্তু আসলে কি তা–ই সত্য? অবশ্য আমার পাসপোর্ট নেই, টাকা–কড়িও নেই। কিন্তু পাসপোর্ট আর টাকা–কড়ি কি সত্যি একেবারে অপরিহার্য ছিলো..?

চিন্তায় এতোদূর আগানোর পর হঠাৎ আমি থেমে যাই। যদি মনোবল থেকে যথেষ্ট, আমি পায়দল সফর করতে পারি, আরব গেরামবাসীদের উপর ভরসা করে। এবং হয়তো–বা আমি কোনো–না–কোনোভাবে গোপনে পার হয়ে যেতে পারি সরহদ–পাসপোর্ট আর প্রবেশপত্রের অন্য মাথা না ঘামিয়েই...

এবং আমি এ ব্যাপারে পুরাপুরি অবহিত হওয়ার আগেই আমার সিদ্ধান্ত ঠিক হয়ে গেলো ঃ আমি দামেশ্‌ক যাচ্ছি।

একটি পরিচিত লোক দীর্ঘ দ্রুত পদক্ষেপে আমার পাশ কেটে আগিয়ে যায়—লোকটি জায়েদ, কাউকে খোঁজ করছে নিশ্চয়ই।

—'জায়েদ, কোথায় যাচ্ছো?'

সে হঠাৎ তার গতি থামিয়ে উৎসুক মুখে আমার দিকে তাকায়—'আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি চাচা, আপনার জন্য এক তাড়া চিঠি জমে ছিলো ডাকঘরে। এই নিন চিঠিগুলি। আর শায়ক আয্‌-যুগাইবী, আস্‌সালামু আলাইকুম—আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।'

আয্‌-যুগাইবীর দোকানের সামনে পায়ের উপর পা রেখে বসে খামগুলি ছিঁড়ে পড়তে থাকি ঃ মক্কার বন্ধুদের কাছ থেকে এসেছে কয়েকটি চিঠিঃ একটি চিঠি লিখেছেন সুইজারল্যাণ্ডের 'নিউ শরখার সাইটুঙে'র সম্পাদক, আমি যে-পত্রিকার সংবাদদাতা গত ছয় বছর ধরে। একটি চিঠি এসেছে ভারত থেকে, যাতে আমাকে তাগিদ দেয়া হয়েছে ওখানে গিয়ে পৃথিবীর একক বৃহত্তম মুসলিম সম্প্রদায়ের সংগে পরিচয় করতে। কয়েকটা চিঠি লেখা হয়েছে নিকট প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। আর একটি চিঠির উপর রয়েছে তেহ্‌রানের ডাকঘরের ছাপ। চিঠিটা লিখেছেন আমার পরম বন্ধু আলী আগা, যাঁর কাছ থেকে এক বছরেরও বেশি হলো আমি কোনো খবর পাইনি। আমি সেটি খুলে আলী আগার সুন্দর পরিপাটি শিকস্তা[১] হরফে লেখা পৃষ্ঠাগুলির উপর চোখ বুলিয়ে যাইঃ

> আমার প্রিয়তম বন্ধু এবং ভাই, আমার হৃদয়ের জ্যোতি, পরম শ্রদ্ধার পাত্র আসাদ আগার প্রতি, আল্লাহ্‌ তাঁর হায়াত দারাজ করুন এবং প্রতি পদে তাঁর নিগাবান হোন। আমীন!
>
> আস্‌সালামু আলাইকুম, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, বর্ষিত হোক আল্লাহ্‌র রহমত, হরদম—সবসময়। আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করি, তিনি যেনো আপনাকে দেন স্বাস্থ্য ও সুখ, আর এ কথাও যখন জানি যে, আপনি শুনে খুশী হবেন, আমিও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ভোগ করছি, তাই প্রশংসা আল্লাহ্‌র।
>
> আমি আপনাকে দীর্ঘকাল চিঠিপত্র লিখিনি। কারণ গত কয়েক মাস ধরে আমার জীবন আগিয়েছে এলোমেলো, বিশৃংখলভাবে। আমার পিতা, আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতি রহম করুন, এক বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন এবং আমি যেহেতু তাঁর ছেলেদের মধ্যে সকলের বড় সেজন্য আমাদের পারিবারিক ব্যাপার-বিষয়াদি গুছাতে গিয়ে আমাকে অনেক সময় দিতে হয়েছে এবং দুশ্চিন্তা পোহাতে হয়েছে। আর এ আল্লাহ্‌রই মর্জি, তাঁর এ অযোগ্য বান্দার জীবনে এসেছে অপ্রত্যাশিত সমৃদ্ধি, কারণ গভর্নমেন্ট তাঁকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত করেছেন। তদুপরি, আমি আশা করছি শীঘ্রই আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবো—এক লাবণ্যময়ী সুন্দরী মহিলা আমার চাচাতো বোন শিরির সংগে; আর এভাবে আমার পুরানো অব্যবস্থিত দিনগুলির সমাপ্তি আসছে ঘনিয়ে। আপনার বন্ধুসুলভ হৃদয়ের কাছে এ তো খুবই জানা কথা যে, অতীতে আমি গোনাহ্‌ খাতা এবং ভুলত্রুটির উর্ধ্বে ছিলাম না, কিন্তু হাফিজ কি বলেননি ঃ

১. শাব্দিক অর্থে ভাঙা-আরবী হরফের একটি পারস্য রূপ, যা দ্রুত লিখনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

'হে আল্লাহ্, মধ্য সাগরে তুমি নিক্ষেপ করেছো একটি তক্তা, তুমি কি আশা করতে পারো তক্তাটি শুকনা থাকুক?'

কাজেই প্রবীণ আলী আগা শেষপর্যন্ত ঘর বাঁধতে এবং শ্রদ্ধার পাত্র হতে যাচ্ছেন! তিনি অতোটা শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন না যখন বাম্ নামক শহরে তাঁর সাথে আমার সাক্ষাত হয়, সাত বছরের কিছু আগে। আলী আগাকে 'নির্বাসন' দেওয়া হয়েছিলো এই শহরটিতে। তাঁর বয়স ছিলো তখন মাত্র ছাব্বিশ বছর। তবু তাঁর অতীত দিনগুলি ছিলো চাঞ্চল্য ও কর্মতৎপরতায় ভরপুর। রিজা খান ক্ষমতা দখল করার আগে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তেহ্রানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব ছিলো তাঁর জন্য যদি না তিনি অতিমাত্রায় আমোদ–ফূর্তির মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিতেন। তাঁকে তাঁর উদ্বিগ্ন এবং প্রভাবশালী পিতা ইরানের দক্ষিণ–পূর্বতম এই অঞ্চলের যোগাযোগবিহীন বাম্ শহরে এই আশায় এনেছিলেন যে, তেহ্রানের আমোদ–ফূর্তি থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে ফেললে তিনি শুধরে যেতে পারেন। কিন্তু বামে এসে আলী আগা নারী, শরাব আর আফিঙের মিঠা বিষের মধ্যে তাঁর ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। বলাবাহুল্য এ সবের প্রতি নিদারুণ আসক্তি ছিলো আলী আগার।

১৯২৫ সালের এই সময়ে আলী আগা ছিলেন জেলা সামরিক পুলিশের একজন কমাণ্ডার। তাঁর মর্যাদা ছিলো একজন লেফটেন্যান্টের। আমি যখন বিশাল দশ্‌ত–ই– লুত মরুভূমি পার হতে যাচ্ছি তখন আমি কিরমান প্রদেশের গভর্নরের একটি পরিচয়–পত্র নিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করি। ঐ পরিচয়–পত্রটিও লিখিত হয়েছিলো প্রধানমন্ত্রী এবং ডিক্‌টেটর রিজা খানের একটি চিঠিকে ভিত্তি করে। আমি তাঁকে পাই কমলালেবু, অলিয়েণ্ডার ও পাম্ গাছের এক ছায়াময় বাগিচায়, যেখানে ধারালো পাম্ পাতার তোরণের ফাঁকে ফাঁকে এসে পড়ছিলো সূর্যের রশ্মি। তাঁর পরণে ছিলো লম্বা হাতাওয়ালা শার্ট। লনের উপর ছিলো একটি গালিচা বিছানো আর সে গালিচার উপর ছিলো বর্তন আর অর্ধেক শূন্য হওয়া আরকের বোতল। বর্তনগুলিতে খাদ্যাবশেষ ছিলো তখনো। আলী আগা বিনীতভাবে কৈফিয়ত দেন—'এই অভিশপ্ত গর্তের মধ্যে শরাব খাওয়া সম্ভব নয়' এবং তারপর তিনি আমাকে বাধ্য করেন স্থানীয় আরক পান করতে; এ এমনি এক কড়া জিনিস যে, আমার মগজে গিয়ে পৌঁছুলো একটা ঘুষির মতো। পারস্যের উত্তর অঞ্চলের একজন মানুষের সন্তরণশীল চোখ দিয়ে কিরমানের চিঠিটির উপর তিনি দৃষ্টি বুলিয়ে যান; তারপর সেটিকে টোকা দিয়ে একদিকে রেখে বলেন, 'আপনি যদি কোন পরিচয়পত্র ছাড়াই আসতেন তবু আমি দশটি লোকের ভেতর দিয়ে আপনার এই সফরে অবশ্যই আপনার সংগী হতাম। আপনি আমার মেহ্মান। আমি কখনো আপনাকে বালুচী মরুভূমির ভেতর দিয়ে একা সওয়ারী হাঁকিয়ে যেতে দিতাম না।'

কোনো এক যুবতী তখনো একটি গাছের ছায়ায় নিজেকে লুকিয়ে বসেছিলো। ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়ালো—পরণে তার হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হালকা আসমানী–রং সিল্কের কোর্তা এবং প্রকাণ্ড সাদা বালুচী সালোয়ার। মুখটা ওর ইন্দ্রিয়জ বাসনার প্রতীক, মনে হয় যেনো

ভেতর থেকে তা জ্বলছে, স্পষ্ট ঠোঁটগুলি লাল এবং সুন্দর, তবে চোখ দুটি বিস্ময়করভাবে ঘোলাটে এবং উদাসীন, চোখের পাতা সুরমা দিয়ে রঞ্জিত।

—মেয়েটি অন্ধ, আলী আগা ফরাসী ভাষায় ফিস্‌ফিস্ করে আমাকে বলেন, 'কিন্তু ও গান গায় অদ্ভুত, চমৎকার!'

আলী আগা যে মহৎ নম্রতা ও শ্রদ্ধার সাথে মেয়েটির প্রতি ব্যবহার করলেন আমি তার প্রশংসা না করে পারি না। মেয়েটি একটি পেশাদার গায়িকা, ইরানের মেয়েদের এমন একটি শ্রেণীতে সে পড়ে যা কম-বেশি বারাঙ্গনাদেরই সমান। অথচ তেহরানের কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রতিও এর চেয়ে উত্তম ব্যবহার তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

আমরা তিনজনই গালিচার উপর বসে পড়ি এবং আলী আগা যখন তাঁর কলকে এবং আফিঙের পাইপ টানতে ব্যস্ত তখন আমি বালুচী মেয়েটির সংগে কথা বলি। মেয়েটি তার অন্ধতা সত্ত্বেও এমনভাবে হাসতে পারে যা কেবল তারাই পারে যারা বাস করে হৃদয়ের আনন্দের গভীরে এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে সে এমন চাতুর্য এবং বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য করে চললো যাতে এই বিশাল পৃথিবীর কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলারই লজ্জিত হবার কোনো অবকাশ নেই। আলী আগা তাঁর পাইপ শেষ করে আলতো করে ওর হাত নিজের হাতে নিয়ে বলেন, 'এই যে বিদেশী এখানে রয়েছেন, ইনি হচ্ছেন একজন অস্ট্রীয়। ইনি নিশ্চয়ই তোমার একটি গান শুনতে পছন্দ করবেন। ইনি এখন পর্যন্ত কখনো বালুচীদের গান শোনেননি।'

সে দৃষ্টিহীন মুখের উপর ছিলো একটি সুদূর স্বপ্নিল মুখের ছাপ, যখন সে আলী আগার দেয়া বাঁশীটি নিয়ে তার তারে আঙুল বুলাতে লাগলো। সে গভীর ভাঙা স্বরে গাইলো একটি বালুচী তাঁবুর গান, যা তার আবেগোষ্ণ ঠোঁট থেকে যেনো জীবনেরই একটি প্রতিধ্বনির মতো সুরেলা হয়ে উঠেছে বলে মনে হলো।

আমি চিঠির কথায় আবার ফিরে যাচ্ছিঃ

ভাই এবং সম্মানিত বন্ধু, আমি জানি না আপনার এখনো স্মরণ আছে কিনা, কিভাবে আমরা দু'জন এক সাথে সেই পুরানো দিনগুলিতে সফর করেছিলাম দশ্‌ত-ই-লুতের মধ্য দিয়ে এবং কিবাবে আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য লড়তে হয়েছিলো সেই বালুচী দস্যুদের সাথে...?

আমার কি মনে আছে, আলী আগার এই অপ্রাসংগিক প্রশ্নে আমি মনে মনে হাসি এবং আমাকে ও আলী আগাকে দেখতে পাই সেই নগ্ন মরুভূমির জনশূন্য দশ্‌ত্-ই-লুত-এ, যা তার বিশাল শূন্যতাকে ছড়িয়ে রেখেছে বালুচীস্তান থেকে অনেক গভীরে, ইরানের একেবারে মাঝামাঝি পর্যন্ত। ইরানের পূর্বতম প্রদেশ সিস্‌তান হয়ে সেখান থেকে আফগানিস্তান যাওয়ার জন্য আমি এই মরুভূমি পাড়ি দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। যেহেতু আমি আসছিলাম কিরমান থেকে, এ ছাড়া অন্য কোন পথ ছিলো না আমার জন্য। উট ভাড়া করা এবং আমাদের সামনে যে দীর্ঘ পথ রয়েছে সে পথের জন্য খাবার কেনার উদ্দেশ্যে মরুভূমির কিনারে একটি সবুজ মরূদ্যানে আমরা থামি, আমাদের সাথে এক প্রদর্শক হিসাবে যে বালুচী পুলিশেরা রয়েছে তাদের নিয়ে। ইন্দো-ইউরোপীয় টেলিগ্রাফের

স্টেশন ঘর হলো আমাদের অস্থায়ী হেড কোয়ার্টার। লম্বা মোটা হাড়ডিওয়ালা তীক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন স্টেশন মাস্টারটি মুহূর্তের জন্য আমাকে তার দৃষ্টির বাইরে যেতে দিতে রাজী নয়। মনে হলো সে তার দৃষ্টি নিয়ে আমার অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করবার চেষ্টা করছে।

—'এর সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকবেন', আলী আগা আমাকে কানে কানে বলেন, 'এ একটি ডাকাত, আমি একে চিনি। আর ও জানে যে, আমি ওকে চিনি। কয়েক বছর আগে এ ছিলো একটি সত্যিকার দস্যু। কিন্তু এখন সে অনেক টাকা-কড়ি করেছে এবং মানী হয়ে উঠেছে। এখন সে তার সাবেক সংগীদের অস্ত্রসস্ত্র সরবরাহ্ করে আরো অনেক বেশি টাকা-পয়সা রোজগার করছে। আমি ওকে হাতে-নাতে ধরবার জন্য একটি সুযোগের অপেক্ষায় আছি; কিন্তু লোকটি ধূর্ত এবং কোনো কিছু প্রমাণ করা সত্যি কঠিন। আপনি অষ্ট্রিয়ার লোক, একথা শুনে সে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বিশ্বযুদ্ধের সময় অষ্ট্রিয়া এবং জার্মানীর কিছু এজেন্ট এই অঞ্চলের গোত্রগুলিকে বৃটিশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চেয়েছিলো। তাদের সংগে ছিলো সোনার মোহরের থলে; আর আমাদের এই বন্ধুটি মনে করে—প্রত্যেক জার্মান এবং অস্ট্রিয়ানই একইভাবে সজ্জিত।'

কিন্তু স্টেশন মাস্টারের চাতুর্যে আমরা উপকৃত হই; কারণ সে আমার জন্য ওই এলাকার সবচেয়ে ভাল সরওয়ারী উটের দু'টি যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিলো। দিনের বাকী অংশটি কাটলো মশক, উটের পশমের দড়ি, চাউল, বিশুদ্ধ মাখন এবং মরু-সফরের জন্য প্রয়োজনীয় আরো নানা জিনিসের জন্য দর-কষাকষিতে।

পরদিন বিকাল বেলা আমরা যাত্রা শুরু করি। আলী আগা স্থির করলেন, তিনি চারটি পুলিশসহ আমাদের আগে আগে গিয়ে রাত্রে তাঁবু গাড়ার জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করবেন। তাঁদের উটগুলির লম্বিত রেখা দেখতে না দেখতে মিলিয়ে যায় দিগন্তের আড়ালে। আমরা—ইব্‌রাহীম, আমি এবং পঞ্চম পুলিশটি—ওদের অনুসরণ করি অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে।

আমরা হেলতে দুলতে থাকি, (তখন তা কতো নতুনই না মনে হয়েছিলো আমার কাছে) হালকা-পাতলা উটগুলির হেলে-দুলে অদ্ভুত কদমতালে চলার সংগে সংগে—প্রথমে হলদে বালিয়াড়ির ভেতর দিয়ে, মাঝে মাঝে দূরে দূরে ঘাসের গুচ্ছ-চিহ্নিত, বালিয়াড়ি, তারপর আরো গভীরে, আরো ভেতরে প্রান্তরের মধ্যে— এক অন্তহীন, ধূসর প্রান্তর যা সমতল এবং শূন্য— এতো শূন্য যে, মনে হলো এ যেনো প্রবাহিত হচ্ছে না, বরং ভেঙে পড়েছে দিগন্তের দিকে; কারণ চোখের সামনে এমন কিছু নেই যার উপর চোখ একটু বিশ্রাম করতে পারে— নেই ভূমির উপর কোনো উঁচু স্থান, কোনো পাথর, কোনো ঝোঁপঝাড়, এমন কি ঘাসের এটি ডগা— কোনো প্রাণীর শব্দ, পাখির কিচির-মিচির বা গুবরে পোকার গুনগুন আওয়াজ এ বিশাল নীরবতা ভংগ করছে না; এমনকি বাতাস সামনে কোনো বাধা না থাকায় শূন্যের উপর নীচু দিয়ে বয়ে চলে নিঃশব্দে— না, তা নয়, শূন্যের মধ্যে তা পতিত হয়, যেমন একটি পাথর পড়ে অতল গর্তের ভেতরে... এ মৃত্যুর নীরবতা নয়, বরং এখনো যার জন্ম হয়নি তারই নীরবতা, যা এখন পর্যন্ত কখনো জন্মলাভ করেনি

তারই স্তব্ধতা—আদি শব্দের পূর্ববর্তী নৈঃশব্দ।

এবং তারপর তা ঘটলো। নীরবতা টুটে গেলো। এমটি মানুষের গলার স্বর পাখির গানের মতো মৃদু আঘাত হানলো বাতাসে আর যেনো তা ঝুলে রইলো শূন্যে আর আমার মনে হলো, আমি যেনো কেবল তা শুনছি না, বরং দেখছি—এমনি একাকী এবং অপ্রচ্ছন্নভাবে তা ভেসে চলেছে মরুপ্রান্তরের উপর দিয়ে। এ আর কেউ নয়, আমাদের বালুচী সেপাইটি। তার যাযাবর জীবনের একটি গান গাইছে যার অর্ধেকটা গাইছে সুর করে আর অর্ধেক করছে আবৃত্তি, দ্রুত তালে, পর্যায়ক্রমে—আবেগোষ্ণ এবং নাজুক শব্দের এক বিচিত্র সংগীত যা আমি বুঝতে পারছিলাম না। স্বল্প কয়েকটি রাগের মধ্যে বেজে উঠলো তার গলার স্বর, একটিমাত্র সমতলে, যার মধ্যে নেই কোনো উত্থান এবং পতন, এবং এমনি একটানা সে গেয়ে চললো যে ক্রমে ক্রমে তা রূপান্তরিত হলো এক ধরনের উজ্জ্বল দীপ্তিতে, যখন তা ভাঙা ভাঙা রাগিনীটিকে ঢেকে দিলো কণ্ঠ্য শব্দের আনুষঙ্গিক ক্রীড়ায় এবং কেবল একই বিষয়ের বারবার আবৃত্তি এবং অদল-বদলের মাধ্যমে উন্মোচিত করলো তার সমতল সুরের মধ্যে এক অপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্য-সমতল এবং সীমাহীন সেই দেশেরই মতো, যেখানে জন্ম হয়েছে এই গানের...।

আমরা মরুভূমির মধ্য দিয়ে যে অঞ্চল সফর করছি তাকে বলা হয় 'আহমদের ঘণ্টার মরুভূমি'। বহু বছর আগে আহমদ নামে কোনো এক ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি কাফেলা পথ হারিয়ে ফেলে এখানে এসে এবং ওরা সকলেই—মানুষ এবং জানোয়ার প্রত্যেকেই—পিয়াসে প্রাণ হারায়। আর আজো লোকে বলে, আহমদের উটেরা গলায় যে ঘুঙুর পরেছিলো তার ধ্বনি মাঝে মাঝে শুনতে পায় মুসাফিরেরা—ভৌতিক কান্নার মতো সেই শব্দ, যা গাফেল পথিককে মোহাবিষ্ট করে তাদের পথ থেকে নিয়ে যায় দূরে এবং মরুভূমিতে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

আমরা সূর্যাস্তের কিছু পরেই আলী আগা এবং অগ্রবর্তী দলটিকে ধরে ফেলি এবং 'কাহুর' তৃণের মধ্যে আমাদের তাঁবু গাড়ি—কয়েকদিনের জন্য এই শেষ দেখতে পেলাম এই তৃণ। শুকনা ডালপালা দিয়ে আগুন ধরানো হলো এবং তৈরি হলো যা না হলেই নয় সেই চা, যখন আলী আগা তাঁর অভ্যাস মতো টেনে চলেছেন আফিঙের পাইপ। উটগুলিকে খাওয়ানো হলো মোটা বার্লি তৈরি খাবার আর আমাদের চারদিকে বৃত্তাকারে সেগুলিকে বসিয়ে দেওয়া হলো ওদের হাঁটুর উপর। পুলিশের তিনজন লোককে ক্যাম্পের বাইরে বালিয়াড়ির উপর মোতায়েন করা হলো সান্ত্রী হিসাবে, কারণ আমরা যে অঞ্চলটিকে নিজেদের নিয়ে এসেছিলাম ঐ দিনগুলিতে সে অঞ্চলটি ছিলো মরুভূমির ভয়াল দানবদের ক্রীড়াক্ষেত্র—দক্ষিণ দিক থেকে আগত বালুচ উপজাতির হানাদারদের।

আলী আগা সবেমাত্র তাঁর পাইপ এবং চা শেষ করেছেন এবং পান করছেন আরক একাই—কারণ এ ব্যাপারে তাঁর সংগী হওয়ার মতো মন-মেজাজ ছিলো না আমার। হঠাৎ একটি রাইফেলের আওয়াজ রাত্রির নীরবতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। আমাদের সান্ত্রীদের রাইফেল থেকে দ্বিতীয় একটি আওয়াজ তার জবাব দেয় এবং তার পরপরই অন্ধকারের মধ্যে কোথাও শোনা গেলো একটি চীৎকার। ইবরাহীম তার চমৎকার উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে

বালু ছুঁড়ে মারে আগুনের উপর। চারদিক থেকে আরো উঠতে লাগলো রাইফেলের আওয়াজ। সান্ত্রীদের এখন দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ওরা একে অপরকে ডাকছে তা আমরা শুনতে পাচ্ছি। আক্রমণকারীদের সংখ্যা কতো বুঝতে পারলাম না। কারণ ওরা নীরবতা বজায় রেখেছিলো—ভৌতিক নীরবতা—কেবল মাঝে মাঝে কোনো রাইফেল থেকে একটা অস্পষ্ট আলোর ঝিলিক—যা ছুরির মতো বিদ্ধ করছে অন্ধকারকে ওরা যে আছে তা জানিয়ে দিচ্ছে এবং দু'একবার আবছা দেখতে পেলাম অন্ধকারের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে ছুটে চলেছে সাদা পোশাক পরা কতকগুলি মূর্তি। নীচু লেবেলে তাক করে ছোড়া কয়েকটি বুলেট শাঁ করে আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে যায়; কিন্তু আমাদের কারো গায়ে লাগলো না। আস্তে আস্তে এই চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা থেমে গেলো। আরো কয়েকটি গুলি ছোড়া হলো এবং রাত্রি শুষে নিলো তার শব্দ, আর হানাদারেরা আমাদের সতর্কতায় স্পষ্টতই নিরাশ হ'য়ে যেমন চুপি চুপি এসেছিলো তেমনি চুপি চুপি গায়েব হয়ে গেলো।

আলী আগা সান্ত্রীদের ডাকলে পর আমরা ছোটো-খাটো একটা আলোচনা বৈঠকে বসি। প্রথমে আমরা ঠিক করেছিলাম রাতটা এখানেই কাটাবো। কিন্তু যেহেতু আক্রমণকারী এ দলটি কতো শক্তিশালী সে সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই এবং আরো লোকজন নিয়ে ওরা আবার ফিরে আসবে কি না তা'ও যখন আমরা জানি না, আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এখনি তাঁবু গুটিয়ে আমাদের রওয়ানা দেওয়া উচিত।

পীচের মতোই কালো আজকের রাত। ঘন নীচু মেঘপুঞ্জে ঢাকা পড়ে গেছে চাঁদ এবং তারা। সাধারণত গ্রীষ্মকালে মরুভূমিতে রাতের বেলা পথ চলাই ভালো। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা এরূপ অন্ধকারে পথ চলার ঝুঁকি নিতাম না। কারণ, এতে পথ হারানোর আশংকা রয়েছে—কেননা দশ্‌ত-ই-লুতের কঠিন নুড়ি পাথর কোনো পথের চিহ্ন ধরে রাখে না। প্রাচীনকালে এ ধরনের মরুভূমিতে ইরানের বাদশাহ্‌রা কাফেলার রাস্তা চিহ্নিত করার জন্য ইট দিয়ে তৈরি করতেন গাইড পোস্ট, কিন্তু সেকালের অনেক ভালো জিনিসের মতোই এসব চিহ্নও মুছে গেছে বহুকাল আগে। আসলে এগুলির আর দরকারও এখন নেই। ভারতের সীমান্ত থেকে দশ্‌ত্‌-ই লুতের ভেতর দিয়ে কিরমান পর্যন্ত ইন্দো-ইউরোপীয় টেলিগ্রাফের যে-লাইন এই শতকের শুরুতে ব্রিটিশ সরকার স্থাপন করেছে তা-ই একই রকম সার্থকতার সংগে—বলা যায়, তারো চেয়ে উৎকৃষ্ঠভাবে—কাজ করছে গাইডের; কিন্তু রাতে তার এবং টেলিগ্রাফের খুঁটিগুলি দেখা যাচ্ছিলো না চোখে।

আতংকের সংগে আমরা আবিষ্কার করলাম এ ব্যাপারটি যখন আমাদের গাইডরূপে আগে আগে উট হাঁকিয়ে চল্‌ছিলো যে-পুলিশটি, সে প্রায় আধ ঘণ্টা পর হঠাৎ তার উটের লাগাম টেনে ধরে লজ্জিত মুখে আলী আগাকে জানালোঃ

—'হযরত', আমি আর টেলিগ্রাফের তার দেখতে পাচ্ছি না...।'

মুহূর্তের জন্য আমরা সকলে স্তব্ধ হয়ে যাই। আমরা জানতাম টেলিগ্রাফ লাইন দ্বারা চিহ্নিত রাস্তার পাশেই কেবল কুয়া রয়েছে; আর কুয়াগুলিরও একটি থেকে আরেকটির দূরত্ব অনেক। এখানে পথ হারানোর মানেই হচ্ছে আহমদের সেই গল্পের কাফেলার মতোই চিরতরে হারিয়ে যাওয়া...।

এরপর আলী আগা এমনভাবে কথা বললেন যা তাঁর স্বাভাবিক কথা বলার ধরনের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। যে কেউ নিরাপদে এই ধারণা করতে পারে যে, আরক এবং আফিঙুই এজন্য দায়ী। তিনি তার পিস্তল বার করে গর্জন করে উঠলেন ঃ

—'কোথায় তার? কুত্তার বাচ্চারা, কেন তার হারালি বল্? হ্যাঁ, আমি জানি তোরা ঐ ডাকাতদের সংগে জোট বেঁধেছিস্ এবং আমাদের গুম্‌রাহ্ করতে চাইছিস—যাতে আমরা মরি পানির অভাবে, আর তোদের সহজ লুটতরাজের বস্তু হয়ে উঠি।'

সত্যই এ তিরস্কার ছিলো অন্যায়; কারণ কোনো বালুচ একবার যার সাথে বসে নুন-রুটি খেয়েছে সে কখনো তার বিশ্বাসের খেয়ানত করবে না। আমাদের পুলিশগুলি ওদের লেফ্‌টেন্যান্টের অভিযোগে পষ্টই আহত হয়ে আমাদের এই আশ্বাস দিলো যে, ওদের কোনো দোষ নেই, কিন্তু আলী আগা আবার চীৎকার করে ওঠেনঃ

—'খামোশ্, এক্ষুণি টেলিগ্রাফের তার খুঁজে বের কর্; অন্যথায় আমি তোদের প্রত্যেককে গুলী করে সাবাড় করে দেবো—বুঝলে জাহান্নামীর পুত্ররা!'

অন্ধকারে আমি ওদের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, ওরা, এই আজাদ বালুচেরা এ অপমানে কতো গভীর আঘাত পেয়েছে! এমনকি, জবাব দেবার প্রয়োজনও ওরা আর বোধ করলো না। তারপর হঠাৎ ওদের একজন—কিছুক্ষণ আগেই যে ছিলো আমাদের গাইড—আলাদা হয়ে দাঁড়ালো দল থেকে, চাবুক হানলো তার উটের গায়ে, তারপর এক লাফে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

—'কোথায় যাচ্ছো?' চীৎকার করে ওঠেন আলী আগা এবং জবাবে তিনি শুনতে পান কয়েকটি অস্পষ্ট শব্দ। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য শোনা গেলো উটের পায়ের নরম মোলায়েম আওয়াজ। তারপর সেই শব্দ ডুবে গেলো রাত্রিতে।

বালুচ পুলিশের কোনো দোষ নেই, এ বিষয়ে আমার যে প্রত্যয় হয়েছিলো মুহূর্তকাল আগে, তা সত্ত্বেও আমার মনে দ্বিধাজড়িত এই ভাবনা খেলে যায়ঃ এখন সে গিয়েছে দস্যুদের কাছে! যা-ই হোক, আলী আগার ধারণাই ঠিক...আমি শুনতে পেলাম আলী আগা পিস্তল-কেস থেকে টেনে বের করছেন তাঁর পিস্তল, আর আমিও তাই করি। ইব্‌রাহীম আস্তে আস্তে হাতে তুলে নেয় তার গুলৃতি। আমরা আমাদের জীনের উপর বসে আছি নিশ্চল নিস্তব্ধ। পুলিশদের একজন ঘোঁৎঘোঁৎ করে ওঠে অনুচ্চ স্বরে; অপর একজন পুলিশের রাইফেলের বাঁটের গুঁতা লাগে একটি জীনের উপর। দীর্ঘ কয়েক মিনিট চলে যায়। নীরবতা এমনি যে, সব কটি মানুষের নিশ্বাসের শব্দই যেনো প্রায় শোনা যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ বিচ্ছিন্নভাবে একটি শব্দ ছুটে এলো অনেক দূর থেকে। আমার কাছে মনে হলো এটি কেবলই একটি ধ্বনি—'ও-ও-ও'। কিন্তু বালুচেরা এর অর্থ জানে এবং তার জবাবে ওদের একজন দু'হাত মুখের উপর পেয়ালার মতো করে রেখে উত্তেজিতভাবে ব্রাহুই ভাষায় চীৎকার করে কিছু বলে। আবার সেই দূরের চীৎকার। পুলিশদের একজন এবার আলী আগার দিকে ফিরে ফার্সী ভাষায় বলেঃ

—'তার, 'হযরত', তার পেয়েছে ও!'

চাপা উত্তেজনা এবার মুক্তি পায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি আমরা সকলে, অনুসরণ

করতে থাকি অদৃশ্য গাইডের গলার আওয়াজ, যে কিছুক্ষণ পর পর আমাদের দিচ্ছে পথের ডিরেকশন। আমরা যখন ওর কাছে পৌছলাম, সে তার জীনের উপর উঠে দাঁড়ালো এবং অন্ধকারের দিকে ইশারা করে বললোঃ

—'এই যে টেলিগ্রাফের তার!'

এবং ঠিকই, কয়েক মিনিট পরই আমরা টেলিগ্রাফের একটি খুঁটির সংগে ধাক্কা খেতে খেতে বেঁচে যাই। আলী আগা প্রথম যে কাজটি করলেন তা তাঁরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। তিনি সিপাইটির বেল্ট ধরে টেনে নিলেন নিজের কাছে এবং জীনের উপর ঝুঁকে পড়ে তার দুই গালে চুমু খেলেনঃ

—'ভাইটি, তুমি নও, আমি কুত্তার বাচ্চা! আমাকে মাফ করে দাও!'

পরে জানা গেলো মরুভূমির শিশু এই বালুচ সিপাইটি এঁকেবেঁকে চলছিলো উট হাঁকিয়ে কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে। তারপর, একসময়ে আধ মাইল দূর থেকে শুনতে পেলো বাতাস তারের উপর আঘাত করে সাঁ সাঁ শব্দ তুলছে—সেই সাঁ সাঁ শব্দ—এই মুহূর্তে যখন আমি ঠিক তার নীচ দিয়ে যাচ্ছি, তখনো আমার ইউরোপীয় কানে প্রায় অনুভবের অতীত!

আমরা আস্তে আস্তে সতর্কতার সাথে আগাতে থাকি আঁধারে ঢাকা রাত্রির মধ্য দিয়ে, অদৃশ্য টেলিগ্রাফের খুঁটি থেকে অদৃশ্য আরেক টেলিগ্রাফের খুঁটি পর্যন্ত। একজন পুলিশ সব সময়ই চলছে আমাদের আগে আগে। আর যখনই তার হাত একটা খুঁটির সাথে লাগছে সে চীৎকার করে তা বলছে আমাদের। আমরা আমাদের পথ খুঁজে পেয়েছি এবং আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, আমরা আমাদের পথ আর হারাবো না! আমি আমার স্বপ্ন থেকে জেগে উঠি এবং ফিরে যাই আলী আগার চিঠিতেঃ

> লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদে উন্নীত হবার পর এই অধমকে নিযুক্ত করা হয়েছে সামরিক বাহিনীর জেনারেল স্টাফ্-এ; আর কাজ, হে আমার বন্ধু এবং ভাই, একটি প্রাদেশিক শহরের গ্যারিসনের জীবন থেকে আমার কাছে বেশি আবেদন রাখে।

এ আবেদন সম্পর্কে আমি নিশ্চিত; রাজধানীর জীবন সম্পর্কে এবং তার চক্রান্ত, বিশেষ করে এর রাজনৈতিক চক্রান্ত সম্পর্কে সব সময়ই একটি স্বাভাবিক বিবেচনা রয়েছে আলী আগার। বস্তুত তিনি তাঁর চিঠিতে তেহরানের রাজনৈতিক আবহাওয়া বর্ণনা করছেন—মসৃণ সমতলের নীচে সেইসব অন্তহীন বাদ-বিসংবাদের কথা, সেইসব জটিল চালের কথা যা দিয়ে বৈদেশিক শক্তিগুলি ইরানকে এতদিন রেখেছে একটা অস্থির অবস্থার মধ্যে, যে-কারণে এ বিস্ময়কর প্রতিভাশালী জাতি তার নিজস্ব রূপে প্রকাশ করে উঠতে পারছে না নিজেকে।

> ঠিক এই মুহূর্তে আমরা ইংলিশ তৈল কোম্পানি কর্তৃক হয়রান হচ্ছি। আমাদের সরকারের উপর সাংঘাতিক চাপ দেওয়া হচ্ছে কনসেশন আরো বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এবং এভাবে আমাদের গোলামীকে আরো দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য। বাজারগুলিতে গুজবের জন্য কান পাতা যায় না আল্লাহ্ই জানেন এ সবের পরিণতি কী!...

প্রাচ্যের দেশগুলির রাজনৈতিক জীবনে বাজারের ভূমিকা সবসময়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ; তেহরানের বাজারের বেলায় তা আরো খাস করে সত্য ঃ এ বাজারে ইরানের গোপন হৃদয়

স্পন্দিত হচ্ছে অব্যাহতভাবে, সকল প্রকার জাতীয় অবক্ষয় এবং সময়ের সকল অগ্রগতিকে অগ্রাহ্য করে। আলী আগার চিঠি পড়তে পড়তে, এই বৃহৎ বাজারটি, যা নিজেই একটা নগরীর মতো, এমন পষ্ট আমার চোখের সামনে আবার ভেসে ওঠে যেনো আমি মাত্র কালই তা দেখেছি ঃ বড় বড় ফাঁকের জালির মতো আলো-আঁধারী রহস্যঘেরা অনেকগুলি হলের গোলকধাঁধা আর চলাচলের জন্য বিভিন্ন রাস্তা, যার উপর ছাদ তৈরি করেছে সূক্ষাগ্র তোরণ, দুই দিক থেকে এসে মিলিত হয়ে। সস্তা তুচ্ছ জিনিসপাতিতে ভর্তি আলোহীন ছোট্ট দোকানগুলি ছাড়িয়ে প্রধান রাস্তায় রয়েছে ছাদে ঢাকা প্রাংগণ, যে ছাদের মধ্যে আছে আলো প্রবেশের জন্য কাঁচের জানালা; এগুলি হচ্ছে একেকটি ষ্টোর, যেখানে ইউরোপ এবং এশিয়ার সবচেয়ে দামী রেশম বিক্রি হচ্ছে; দড়ি নির্মাতাদের কারখানার পরেই রৌপ্যকারদের কাঁচের কেস, যা সূক্ষ্ম সোনা-রূপার ঝালরের কারুকার্যময়; বোখারা এবং ভারতের নানা রংয়ের সূতীবস্ত্র আর দুর্লভ পারস্য গালিচা মিশে গেছে একসাথে, শিকারের চিত্রসম্বলিত গালিচা, যাতে রয়েছে ঘোড়-সওয়ার, বীর সিপাই, সিংহ, চিতাবাঘ, ময়ূর এবং হরিণের চিত্র; সেলাইর কলের পাশেই রয়েছে কাঁচ-মুক্তার গলার হার ও অটোমেটিক লাইটার, কালো হতভাগা ছাতাগুলি রয়েছে খোরাসানের ভেড়ার চামড়ার পোশাকের পাশাপাশি, যার কিনারে কাজ করা হয়েছে হলুদ রংয়ের; এই সুদীর্ঘ হলের মধ্যে এসবই এসে মিশেছে এক সাথে, যেনো একটি বৃহৎ এবং কিছুটা অযত্ন বিন্যস্ত দোকানের জানালায়।

এই পরস্পর বিজড়িত কুটির শিল্প ও বাণিজ্য দ্রব্যাদির অগণিত ছোট্ট-ছোট্ট গলিতে দোকানগুলি সাজানো হয়েছে পেশা অনুসারে। এখানে আপনি দেখতে পাবেন জীন নির্মাতা ও চর্মকারদের এক দীর্ঘ সারি, আর তার সাথে প্রধান রং হিসাবে পাবেন রং-করা চামড়ার লাল রং এবং চামড়ার কিছুটা টকটক গন্ধ, যা ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে; রয়েছে দর্জিরা—প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত উঁচু স্থান থেকে আপনি শুনতে পাচ্ছেন নিপুণ সেলাই কলগুলির একটানা শব্দ; প্রত্যেকটি দোকানীর জন্যই তিন থেকে চার বর্গফুট উঁচু একটা মেঝের উপর রয়েছে একেকটি দোকান; লম্বা লম্বা জামা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বিক্রির জন্য, সবসময় একই রকমের জামা, যার ফলে, আপনি যখন হাঁটেন, কখনো কখনো আপনার মনে হবে আপনি নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন। বাজারের অন্যান্য বহু অংশেও একই রকমের অনুভূতি হবে আপনার। তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি পৃথক ক্ষেত্রে এই বিপুল সাদৃশ্যের সাথে একঘেঁয়েমীর কোনো সম্পর্ক নেই। অপরিচিত লোকের মধ্যে এ সাদৃশ্য নেশা ধরিয়ে দেয় এবং একটা অস্বস্তিকর তৃপ্তিতে তার অন্তরকে দেয় পূর্ণ করে। আপনি যদি একশ' বারও আসেন, আপনি সবসময়ই দেখবেন আপনার চারপাশে মেজাজ-মর্জি এবং আবহাওয়া একই, মনে হবে যেন কোন পরিবর্তন ঘটেনি; কিন্তু সে মেজাজ এবং আবহাওয়া হচ্ছে সমুদ্র-তরংগের সেই অফুরন্ত অনুরণনশীল পরিবর্তনহীনতা যা সবসময়ই তার রূপ বদলায়, কিন্তু তার মূলকে রাখে অপরিবর্তিত।

আর তাম্রকারদের বাজারঃ যেনো দোলায়মান হাতুড়ির আঘাতে ব্রোঞ্জের তৈরি অনেকগুলি ঘণ্টার ঐকতানঃ সে হাতুড়িগুলি তামা, ব্রোঞ্জ এবং পিতল পিটিয়ে দেয় বহু বিচিত্র রূপ, আকারহীন ধাতুর পাতকে রূপান্তরিত করে গামলা, বেসিন ও বড় বড় পাত্রে।

ধ্বনির কী নিশ্চয়তার সংগে চলতে থাকে হাতুড়ির এই আঘাত, তাল কখনো উঁচুতে তুলে কখনো নীচুতে নামিয়ে, বাজারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত, প্রত্যেকেই হাতুড়ির বাড়ি দিতে গিয়ে অনুসরণ করছে অন্যের ছন্দকে, যাতে কানে কিছু অসংগত, বেসুরো না শোনায়; একশ' কারিগর হয়তো হাতুড়ি চালাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর উপর ভিন্ন ভিন্ন দোকানে—কিন্তু সারা বাজারে শুনতে পাওয়া যাবে একটিমাত্র সংগীত—একটিমাত্র রাগিণী... একটা সমন্বয় খুঁজে পাওয়ার জন্য এই গভীর, প্রায়-সামাজিক বাসনার মধ্যে—যা কেবল সংগীতের চাইতে আরো গভীর কিছু—ধরা পড়ে ইরানের আত্মার গোপন মাধুর্য।

এরপর মসলার বাজারঃ নীরব অলিগলি, যার দুই পাশে সজ্জিত সাদা জমাট মিশ্রীর তাল, চাউলের বস্তা, বাদাম এবং পেস্তার স্তূপ, হেজেল নাট ও তরমুজের শাঁস, শুকনা খোবানী ও আদা-ভর্তি ডালা, দারুচিনি, হলুদ, গোলামরিচ, জাফরান ও পোস্তদানা ভর্তি কাঁসার থালা, মৌরী মসলা, ভেনিলা, জিরা, লং এবং আরো অসংখ্য লতাগুল্ম ও শিকড়-ভর্তি বহু পাত্র, যেসব মসলা থেকে নির্গত হচ্ছে গাঢ়, অভিভূত করা সৌরভ। বুদ্ধের মতো পদ্মাসন করে বসে আছে এইসব বিস্ময়কর বস্তুর মালিকেরা উজ্জ্বল পিতলের দাড়ি পাল্লার উপর ঝুঁকে এবং কখনো কখনো নীচু গলায় পথচারীকে ডাকছে আর তার কি চাই জিগ্‌গাস করছে। এখানে কথা মানে অস্ফুট ধ্বনি, ফিসফিস করে কিছু বলা, কারণ যখন ব্যাগ থেকে পাল্লায় চিনি তোলা হয় আস্তে তখন কারো পক্ষে শোরগোল করা সম্ভব হয় না—যখন ওজন করা হচ্ছে... থাইম কিংবা জিরা... এ আর কিছু নয়; মন-মেজাজকে হাতের উপকরণের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার সেই ক্ষমতা যার বলে ইরানীরা পারে অগণিত রংয়ের পশমের সূতা থেকে গেরো দিয়ে দিয়ে চমৎকার গালিচা বুনতে—একটি একটি সূতা করে ইঞ্চির ভগ্নাংশের সঙ্গে ইঞ্চির ভগ্নাংশ জুড়ে দিয়ে—যে পর্যন্ত না গোটা গালিচাটি তৈরি হয়ে ওঠে তার লীলাময় পূর্ণতায়। পৃথিবীতে যে ইরানী গালিচার কোনো তুলনা নেই এ কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। নিজের হাতের কাজে এই গভীর নীরবতা, এ চিন্তামগ্নতা, এ আত্ম-নিমজ্জন আর কোথায় পাবেন?—কোথায় পাবেন এই চোখ, এই গভীর অতলতা যার কাছে সময় এবং সময়ের গতি এতো তুচ্ছ!

কোটরবিশিষ্ট তাকগুলিতে, যা স্বাভাবিক তাকগুলির চাইতে বড়ো, বসে কাজ করছে চিত্রকরেরা—ছোটো ছোটো ছবি আঁকছে। ওরা বহুকাল আগে যেসব হাতে লেখা পুঁথি ছিঁড়েছুঁড়ে গেছে তা থেকে ছোটো ছোটো ছবি নকল করছে, জীবনের বৃহৎ বিষয়গুলিকে রূপ দিচ্ছে নিশ্বাসের মতোই সূক্ষ্ম রেখা এবং রঙে ঃ যুদ্ধ এবং শিকারের চিত্র, প্রেম, সুখ এবং দুঃখের ছবি। ওদের ব্রাশ স্নায়ুতন্ত্রের মতোই মিহি এবং সূক্ষ্মঃ রঙগুলি কোনো নিষ্প্রাণ পাত্রে ওরা রাখে না বরং চিত্রকরের হাতের জীবন্ত তালুতে সেগুলি মিশিয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বড়ি এবং বিন্দু বানিয়ে তা মাখানো হচ্ছে তার বাম হাতের আঙুলগুলিতে। নিখুঁত শুভ্র নতুন পাতাগুলিতে পুরানো চিত্রগুলি নতুন জীবন লাভ করে তুলির আঁচড়ের পর আঁচড়ে, শেডের পর শেড। মূলের থাক থাক সোনালী পটভূমির পাশাপাশি ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে নকলগুলি; উজ্জ্বল পশ্চাদ্‌ভূমি। একটা শাহী পার্কে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া কমলালেবুর গাছগুলি এক নব বসন্তে আবার প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। রেশমী এবং পশমী পোশাক পরা তন্বীরা আবার তাদের

চিত্তহারী অংগভংগীতে হয়ে ওঠে জীবন্ত; সেই পুরান বীর যোদ্ধাদের পলো খেলার উপরে নতুন সূর্য ওঠে...আঁচড়ের পর আঁচড়ের শেডের পর শেড...নির্বাক মানুষেরা অনুসরণ করে এক মৃত শিল্পীর বলিষ্ঠ সৃজনধর্মী প্রয়াসকে এবং সেই মৃত শিল্পীর-মধ্যে ছিলো যেমন যাদু এদের মধ্যে রয়েছে তেমনিতরো প্রেম ঃ আর এই প্রেম আপনাকে প্রায় ভুলিয়ে দেয় নকলের অসম্পূর্ণতার কথা...

সময় আগিয়ে চলে; চিত্রকরেরা মাথা নুয়ে কাজ করে চলে, দিনের সাথে ঘটে না তাদের পরিচয়। সময় আগিয়ে চলে; বাজারের পশ্চিম খণ্ডের নিকটের রাস্তাগুলি ধীর গতিতে ক্রমশ আগিয়ে আগিয়ে ঢুকে পড়েছে দোকানগুলির মধ্যে; শিকাগো থেকে আমদানি করা কেরোসিনের বাতি, মাঞ্চেষ্টারের ছাপানো কাপড় এবং চেকোশ্লাভাকিয়ার চা-পাত্র আগিয়ে আসছে বিজয়ীর বেশে; কিন্তু চিত্রকরেরা তাদের জীর্ণ খড়ের মাদুরের উপর পদ্মাসন করে বসে সেকালের পরম আনন্দময় সুরে মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে নাজুক চোখ আর আঙুলের ডগা এবং তাদের শাহী শিকার এবং বিহ্বল প্রেমিকদের দিচ্ছে নতুন প্রাণ, দিনের পর দিন...

বাজারের লোক বেশুমার-অগুণতি; এদের মধ্যে রয়েছে ইউরোপীয় পোশাক পরা এবং প্রায়ই, ইউরোপীয় অথবা অর্ধ-ইউরোপীয় স্যুটের উপর মাটির উপর ঝুলে পড়া আরবী 'আবায়া' পরা ভদ্রলোকেরা, দীর্ঘ 'কাফতান' পরা এবং কোমরে রেশমী ফিতা বাঁধা রক্ষণশীল শহুরে লোকেরা, আর নীল অথবা মেটে জ্যাকেট পরা কৃষক ও কুটির শিল্পীরা। ইরানের শরীফ ভিক্ষুক গায়ক দরবেশদের দেখতে পাবেন তাদের সাদা ঢিলাঢালা লম্বা ঝুলাওয়ালা পোশাকে, কখনো চিতাবাঘের একটি চামড়া কাঁধে, মাথায় বাবরি চুল এবং প্রত্যেকেরই শরীরের গঠন চমৎকার। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েলোকের তাদের সামর্থ্য অনুসারে কেউ পরে সিল্কের কাপড়, কেউ বা সূতী বস্ত্র। কিন্তু কাপড়ের রং সবসময়ই কালো আর প্রত্যেকের মুখের উপরই ঝোলানো থাকে ঐতিহ্যপূর্ণ খাটো তেহরানী নেকাব। যারা গরীব তারা পরে হালকা রঙের ফুলওয়ালা সূতী চাদর। সেকেলে মোল্লারা সুন্দর কাজ করা বস্ত্র দিয়ে ঢাকা গাধা অথবা খচ্চরের পিঠে চড়ে চলাফেরা করে সাড়ম্বরে এবং অপরিচিত কাউকে দেখলে তার দিকে এমন গোঁড়া দৃষ্টি হানে যে, মনে হয় যেনো তা জিগ্‌গাস করছেঃ কি করছো 'তুমি' এখানে? আমাদের দেশকে ধ্বংস করার জন্য যারা কাজ করছে তুমি কি তাদেরই একজন?

পশ্চিমা ষড়যন্ত্রের যে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ইরানীদের হয়েছে তার ফলে ইরানী মানুষেরা হয়ে উঠেছে সন্দেহপরায়ণ। 'ফিরিংগি'দের দ্বারা তাদের দেশের কোনো উপকার হতে পারে এ আশা কোনো ইরানীই আসলে করে না। কিন্তু আলী আগাকে অনাবশ্যক নৈরাশ্যবাদী বলেও মনে হয় না ঃ

'ইরানের বয়স হয়েছে, কিন্তু নিশ্চয়ই ইরান মরতে এখনো প্রস্তুত নয়। আমাদের উপর বারবার জুলুম করা হয়েছে। বন্যাস্রোত বয়ে গেছে বহু জাতি আমাদের উপর দিয়ে এবং তাদের সবাই মৃত্যুবরণ করেছে; কিন্তু আমরা আছি। এর কারণ, আমরা ইরানীরা সবসময়ই আমাদের নিজের পথে চলি। কতবার বহির্বিশ্ব নতুন জীবন পদ্ধতি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে আমাদের উপর এবং প্রত্যেকবারই ব্যর্থ হয়েছে। আমরা বাইরের

শক্তিকে শক্তি দিয়ে মুকাবিলা করি না, যার ফলে মাঝে মাঝে মনে হতে পারে আমরা যেনো ওদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। কিন্তু আমরা হচ্ছি 'মুরিউন' খান্দানের লোক, সেই ক্ষুদ্র তুচ্ছ উইপোকা যা বাস করে দেয়ালের নীচে। আপনি, আমার হৃদয়ের জ্যোতি, আপনি কখনো না কখনো ইরানে নিশ্চয়ই দেখেছেন কিভাবে চাক্ষুষ কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ ধ্বসে পড়ে সুদৃঢ় দেয়ালবিশিষ্ট মজবুত দালানকোঠা। এর কারণ কি? আর কিছুই নয়, এ ছোট্ট পিঁপড়াগুলি, যারা বহু বছর ধরে অক্লান্ত চেষ্টায় দালানের ভিতের মধ্যে খুঁড়ে খুঁড়ে সৃষ্টি করে রাস্তা এবং গহ্বর, সবসময় তারা আগায় চুল পরিমাণ দূরত্ব, ধীরগতিতে, ধৈর্যের সংগে, সকল দিকে! ফলে শেষপর্যন্ত গৃহ-প্রাচীর হারিয়ে ফেলে তার ভারসাম্য এবং পড়ে যায় হুমড়ি খেয়ে। আমরা ইরানীরা হচ্ছি এ ধরনের পিঁপড়া। আমরা পৃথিবীর কোনো শক্তিকে শোরগোলপূর্ণ অর্থহীন বল দিয়ে মুকাবিলা করি না। বরং ওদেরকে ওদের সাধ্যমতো অন্যায় এবং জুলুম করবার সুযোগ দিই এবং আমরা নীরবে খুঁড়তে থাকি আমাদের রাস্তা এবং গহ্বর, যতক্ষণ না একদিন ওদের ইমারত হঠাৎ ধ্বসে পড়ে।

আর আপনি কি দেখেননি পানিতে যখন পাথর পড়ে তখন কী ঘটে? পাথরটি ডুবে যায়; পানির সমতলের উপর দেখা যায় কয়েকটি বৃত্ত। বৃত্তগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। শেষপর্যন্ত শুরুতে পানি যেমন নিস্তরংগ ছিলো আবার তেমনি নিস্তরংগ হয়ে যায়।

শাহ্—আল্লাহ্ তাঁর হায়াত দারাজ করুন—তাঁকে বহন করতে হচ্ছে একটি গুরুতর বোঝা, যার একদিকে রয়েছে ইংরেজরা আর অন্যদিকে রয়েছে রুশরা। কিন্তু আমাদের কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্‌র রহমতে তিনি খুঁজে পাবেন ইরানকে বাঁচাবার পথ...'

বাহ্যত রিজা শাহের উপর আলী আগার দৃঢ়মূল বিশ্বাস অপাত্রে বিশ্বাস বলে মনে হয় না। আমি মুসলিম বিশ্বে যেসব গতিশীল ব্যক্তিত্বের সংগে মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছি শাহ্ হচ্ছেন নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম এবং যেসব রাজাকে আমি জানি তাদের মধ্যে কেবল ইব্‌নে সউদকে তাঁর সংগে তুলনা করা যেতে পারে।

রিজা শাহের ক্ষমতারোহণের কাহিনী একটি কাল্পনিক রূপকথার মতো, যা কেবল প্রাচ্য জগতেই সম্ভব, যেখানে কখনো কখনো ব্যক্তির হিম্মত এবং প্রবল ইচ্ছা-শক্তি মানুষকে অখ্যাতি, অশ্রুতির অন্তরাল থেকে টেনে তুলতে পারে নেতৃত্বের শীর্ষ চূড়ায়। আমি যখন প্রথম তাঁকে জানবার সুযোগ পাই ইরানে আমার প্রথম অবস্থানকালে, ১৯২৪ সালের গ্রীষ্মের দিনগুলিতে, তখন তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং ইরানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ডিক্‌টেটর। কিন্তু তাকে এতো আকস্মিকতার সংগে এতো অপ্রত্যাশিতভাবে দেশের হাল-হকিকতের নিয়ন্ত্রণে দেখতে পেয়ে দেশের মানুষ যে ধাক্কা খেয়েছিলো, তার ধকল তারা তখনো পুরাপুরি কাটিয়ে ওঠেনি। আমার এখনো মনে আছে, তেহরানে জার্মানীর দূতাবাসের এক বৃদ্ধ ইরানী ক্লার্ক কী তাজ্জবের সংগে একদিন আমাকে বলেছিলোঃ "আপনি কি জানেন, খুব বেশি দিন নয়, মাত্র দশ বছর আগে আমাদের এই প্রধানমন্ত্রী এই দূতাবাসের গেটের একজন সাধারণ সিপাইরূপে পাহারা দিতেন, আর এই আমি, নিজে মাঝে মাঝে তার হাতে দিতাম কোনো চিঠি বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে পৌছিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাকে বকুনি দিয়ে

বলতাম—"এই কুত্তার বাচ্চা, ছুটে যা বাজারে, বাজে কাজে সময় নষ্ট করিস না।...!"

হ্যাঁ, এ খুব বহু বছর আগের কথা নয়, যখন অশ্বারোহী পুলিশ রিজা তেহরানের দূতাবাস এবং সরকারী ভবনগুলির সামনে কাজ করতেন সান্ত্রী হিসাবে। আমি কল্পনায় তাঁর ছবি দেখতে পাচ্ছি যখন তিনি ইরানী কোসাক্-ব্রিগেডের বিশ্রী উর্দী পরে দাঁড়াতেন তাঁর রাইফেলে ঠেস্ দিয়ে এবং চারপাশে বিভিন্ন রাস্তায় যে কর্মতৎপরতা চলছে তা দেখতেন তাকিয়ে তাকিয়ে; তাঁর চোখের সমুখ দিয়ে ইরানী লোকেরা পায়চারী করতো স্বপ্নের ছায়ার মতো, অথবা বিকালের ঠাণ্ডায় পানির খালের ধারে বসতো ওরা, যেমন আমি ওদের করতে দেখেছি। আর শুনতেন তাঁর পিঠের পেছনে ইংরেজদের ব্যাংক থেকে টাইপরাইটারের বিশেষ শব্দ, ব্যস্ত মানুষের শোরগোল, চাঞ্চল্যের সমুদয় অস্ফুট ধ্বনিটি যা সুদূর ইউরোপ নিয়ে এসেছে তেহরানের ঐ প্রাসাদটিতে, যার সম্মুখ-ভাগটি খচিত নীল বর্তনের টুকরা দিয়ে। হতে পারে, প্রথম বারের মতো (আমাকে কেউ একথা বলেনি, কিন্তু কেন যেনো আমার মনে হয়, ঠিক এ রকমটিই ঘটে থাকবে) সিপাই রিজার অশিক্ষিত মাথায় জেগেছিলো এই বিস্ময়সূচক জিগ্গাসময় চিন্তাঃ এই রকম হওয়াই কি অপরিহার্য?... হ্যাঁ, এ রকমটি হওয়াই কি অনিবার্য যে, অন্যান্য জাতির লোকেরা যখন কাজ করছে, চেষ্টা করছে, তখন আমাদের জীবন বয়ে চলবে একটি স্বপ্নের মতো?

এবং হয়তো সেই মুহূর্তেই পরিবর্তনের সেই বাসনা—যা সমস্ত মহৎ কর্ম, আবিষ্ক্রিয়া ও বিপ্লবের জন্ম দেয়—দীপ্তিময় হয়ে উঠতে শুরু করেছিলো তাঁর মগজে এবং নির্বাক অবস্থায় চাইছিলো তার অভিব্যক্তি...

অন্যান্য সময় তিনি হয়তো বৃহৎ কোনো ইউরোপীয় দূতাবাসের দাখিল দরোজার বাগানের সমুখে দাঁড়িয়ে সান্ত্রী হিসাবে। সযত্ন-লালিত গাছগুলি আন্দোলিত হচ্ছে বাতাসে এবং নুড়ি পাথর বিছানো পায়ে-চলা রাস্তাগুলি মস্‌মস্ করছে সাদা পোশাক পরা নওকরদের পায়ের নীচে। পার্কের মাঝামাঝি সেই বাড়িটিতে যেনো বাস করছে এক রহস্যময় শক্তি; এই দরোজার ভেতর দিয়ে যে-সব ইরানী বার হয়ে যায় তারা প্রত্যেকেই এর জন্য থাকে ভীত এবং আত্মসচেতনভাবেই তাকে তার পোশাক আর কাপড়-চোপড় টেনে লম্বা করে ধরতে বাধ্য করে এবং তার হাতগুলিকে করে তোলে কুণ্ঠিত এলোমেলো। কখনো কখনো আসে সুন্দর নিখুঁত ঘোড়ার টানা গাড়ি এবং তার ভেতর থেকে বের হয়ে আসেন ইরানের রাজনীতিবিদেরা। সিপাই রিজা এদের অনেককেই দেখে চিনতে পারেন; ইনি হচ্ছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী, উনি হচ্ছেন অর্থমন্ত্রী। ওঁরা যখন সেই দরোজা দিয়ে প্রবেশ করেন সবসময়ই দেখা যায় তাঁদের মুখে উত্তেজনা এবং আশংকার ছাপ; আর যখন ওঁরা দূতাবাস ত্যাগ করেন তখন ওঁদের মুখের ভাব কেমন যেনো হাস্যকর দেখা যায়ঃ কখনো কখনো দেখা যায় ওঁদের মুখ খুবই উজ্জ্বল, যেনো ওঁদের উপর মস্ত বড়ো একটা অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে; কখনো কখনো দেখা যায় ওঁদের মুখ বিমর্ষ এবং হতাশামগ্ন যেনো এইমাত্র ওঁদের উপর মৃত্যুদণ্ড উচ্চারিত হয়েছে। প্রাসাদের ভেতরকার ঐ রহস্যময় লোকেরাই ঘোষণা করেছে এই দণ্ড। সিপাই রিজা বিস্মিত হয়ে ভাবেন—এই রকমটি হওয়াই কি অনিবার্য...'

মাঝে মাঝে এ রকম হয় যে, রিজা যে অফিস-ভবন পাহারা দিচ্ছেন সেখান থেকে

ছুটে বের হয়ে আসে একজন ইরানী ক্লার্ক আর তাঁর হাতে একটি চিঠি গুঁজে দিয়ে বলেঃ 'জল্‌দি এটি অমুকের নিকট পৌঁছিয়ে দে। কুত্তার বাচ্চা, দৌড় দে, নইলে রাষ্ট্রদূত চটে যাবেন।' এ ধরনের সম্বোধনে অভ্যস্ত ছিলেন রিজা, কারণ বিশেষণের ব্যবহারে তাঁর নিজের অফিসারেরা কম পটু নয়। তবে সম্ভবত—তাই বা কেমন করে বলি—প্রায় নিশ্চিতভাবেই 'কুত্তার বাচ্চা' এই শব্দ ক'টি তাঁকে ছুরির মতো বিদ্ধ করতো অপমানে, কারণ তিনি জানতেন, তিনি কুত্তার বাচ্চা নন; তিনি একটি মহান জাতির সন্তান, যে জাতি রুস্তম, দারায়ুস, নওশেরওয়া, কায়খসরু, শাহ্ আব্বাস, নাদির শাহ্‌র মতো নামগুলিকে আপন বলে জানে। কিন্তু এই প্রাসাদের ভেতরে যারা বাস করে তারা এর কী জানে? চল্লিশ বছরের একটি সিপাইয়ের বুকের ভেতর দিয়ে অন্ধকার বোবা স্রোতের মতো যে শক্তিগুলি প্রবাহিত হচ্ছে এবং কখনো কখনো যার চাপে তাঁর বুকের পাঁজরের বাঁধন ছিড়ে যেতে চাইছে আর অক্ষমের হতাশায় তাঁকে বাধ্য করছে নিজের হাত নিজেই কামড়াতে, 'ওহো, আমি যদি কেবল..?'

এবং প্রত্যেক ইরানীর হৃদয়ে কান্নার সংগে বাস করে যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার বাসনা—কখনো কখনো তা যন্ত্রণাদায়ক অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ডতার সংগে জেগে উঠতো সিপাই রিজার বুকের ভেতরে আর তার মনকে করে তুলছো স্বচ্ছ, যার ফলে, তিনি হঠাৎ দেখতে পেতেন একটি বিস্ময়কর, প্যাটার্ন, যা-কিছু তাঁর নযরে আসতো সমস্ত কিছুর মধ্যে...।

মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। বলশেভিক বিপ্লবের পর রুশ সৈন্যরা পূর্বে ইরানের যে-উত্তরাঞ্চল দখল করেছিলো সেখান থেকে সরে পড়ে। কিন্তু তার পরে পরেই প্রভাবশালী কুচুক খানের নেতৃত্বে এবং নিয়মিত রুশ স্থল ও নৌবাহিনীর সমর্থনে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী ইরানের গিলান প্রদেশে কমিউনিস্টরা বিদ্রোহ করে বসে। সরকার ফৌজ প্রেরণ করে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে, কিন্তু ইরানী সিপাইদের ছিলো না তেমন শৃংখলাবোধ আর তাদের অস্ত্রশস্ত্রও ছিলো খুব কম, যার ফলে তারা বারবার হারতে থাকে। যে ব্যাটেলিয়ানে যোদ্ধা ছিলেন তখন সার্জেন্ট রিজা—পঞ্চাশের মতো তাঁর বয়স—সেই ব্যাটেলিয়ানও একই ভাগ্যবরণ করে। কিন্তু একবার যখন দুর্ভাগ্যজনক হামলার পর তাঁর ইউনিটটি পলায়ন করতে উদ্যত, তখন রিজা নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। তিনি তাঁর ভাঙা দল থেকে বা'র হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠলেন, যাতে প্রত্যেকেই শুনতে পায় ঃ 'কেন তোমরা পালাচ্ছো, ইরানীরা, শোনো ইরানীরা, কেন তোমরা পালাচ্ছো?' তিনি তখন নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন তাঁর চেতনার গভীরে—সুইডেনের দ্বাদশ চার্লসের মতো—যখন তিনি জখম হয়ে পড়েছিলেন পোল্‌তাবা যুদ্ধক্ষেত্রে আর দেখছিলেন তাঁর সিপাইরা তাঁর পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে বধির, উদ্দেশ্যহীনভাবে এবং হতাশাব্যঞ্জক কণ্ঠে তাদের ডেকে বলেছিলেন চীৎকার করে, 'তোমরা কেন পালাচ্ছো সুইডিস্‌রা? ওহে সুইডিস্‌রা!' কিন্তু তফাত এই যে, রাজা চার্লস আঘাতে আঘাতে জর্জরিত ছিলেন বলে রক্ত বের হচ্ছিলো তাঁর সারা গা থেকে। কিন্তু সিপাই রিজা ছিলেন অক্ষত আর তাঁর হাতে ছিলো গুলি ভর্তি একটি মাউজার পিস্তল আর তাঁর গলার স্বর ছিলো দৃঢ় এবং ভীতিজনক যখন তিনি সতর্ক করছিলেন তাঁর সংগীদেরকে, 'যে-ই পালাবে, আমি তাকে গুলি করে

হত্যা করবো—সে যদি আমার ভাই হয়, তবুও।'

ইরানী সিপাইদের কাছে এ ধরনের একটি বিস্ফোরণ ছিলো নতুন জিনিস। তাদের দিশাহারা অবস্থা কেটে গিয়ে সৃষ্টি হলো বিস্ময়। তারা হয়ে উঠলো উৎসুক, জিগ্‌গাসু ঃ কী রয়েছে এই লোকটির মনে? কয়েকজন অফিসার প্রতিবাদ করে এবং তাদের অবস্থা যে একেবারেই নৈরাশ্যজনক সে কথা বলে এবং ওদের একজন ব্যংগ করে ওঠেঃ 'তাহলে 'তুমিই' আমাদের জন্য নিয়ে আসবে বিজয়!' সেই মুহূর্তে রিজা হয়তো তাঁর জীবনের আগেকার বছরগুলির সমস্ত হতাশা থেকে মুক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর সব নির্বাক আশা হয়তো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলো সহসা। তিনি তাঁর সামনে দেখতে পেলেন এক যাদু-রজ্জুর প্রান্তদেশ, তিনি তা ধরলেন হাতের মুঠায়। 'হ্যাঁ, দায়িত্ব নিলাম'—তিনি চীৎকার করে উঠলেন এবং সিপাইদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা কি আমাকে তোমাদের নেতা বলে মেনে নেবে?'

কোনো জাতির মধ্যেই বীরপূজার মনোবৃত্তি অমন গভীরভাবে প্রোথিত নয় যেমন দেখা যায় ইরানীদের মধ্যে; আর এই মুহূর্তে এই লোকটিকে মনে হলো একজন বীর বলে! সিপাইগুলি তাদের আতংক আর পলায়নের কথা ভুলে যায় আর সহর্ষে গর্জন করে ওঠে, 'তুমিই হবে আমাদের নেতা।' 'তা-ই হোক', বলেন রিজা, 'আমি নেতৃত্ব দেবো তোমাদের এবং যে কেউ পালাবার চেষ্টা করবে, আমি তাকে হত্যা করবো।' কিন্তু কেউই আর পালাবার কথা ভাবলো না। ভারী ন্যাপ্‌স্যাক্ ছুড়ে ফেলে দিয়ে ওরা ওদের রাইফেলে সংগীন ফিট করে। তারপর রিজার নেতৃত্বে গোটা ব্যাটেলিয়ানটি আবার ঘুরে দাঁড়ায় এবং হঠাৎ আক্রমণ করে একটি রুশ মোর্চা দখল করে আর তার সংগে অন্যান্য ইরানী ইউনিটগুলির সাহায্যে শত্রুকে পদদলিত করে, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইরানীদের পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়ে যায় এই যুদ্ধে।

কয়েকদিন পর তেহরান থেকে প্রেরিত একটি টেলিগ্রাম দ্বারা রিজাকে উন্নীত করা হয় ক্যাপ্টেন পদে। এখন তিনি তাঁর নামের সংগে যুক্ত করতে পারলেন। 'খান' পদবীটি।

রশির মাথা ধরে তিনি লাফ মেরে চড়েছেন রশির উপর। হঠাৎ তাঁর নাম হয়ে উঠলো মশহুর। পর্যায়ক্রমে অতি দ্রুত তিনি উন্নীত হলেন মেজর পদে, মেজর থেকে কর্নেল, কর্নেল থেকে ব্রিগেডিয়ার। ১৯২১ সনে তিনি তরুণ সাংবাদিক জিয়াউদ্দীন এবং আরো তিনজন অফিসারকে 'সংগে নিয়ে দখল করেন' ক্ষমতা, দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রীসভার সদস্যদের গ্রেপ্তার করেন এবং তাঁর বিশ্বস্ত ব্রিগেডের সাহায্যে দুর্বল এবং তুচ্ছ তরুণ শাহ আহমদকে বাধ্য করলেন একটি নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করতেঃ জিয়াউদ্দীন হলেন প্রধানমন্ত্রী এবং রিজা খান হলেন যুদ্ধমন্ত্রী। তিনি পড়তে জানতেন না, লিখতে জানতেন না, কিন্তু ক্ষমতা লাভের প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন অসুরের মতো এবং তিনি তাঁর সেনাবাহিনী ও লোকের কাছে হয়ে উঠলেন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র, যারা বহু যুগ পরে এই প্রথম তাদের সামনে দেখতে পেলো একটি মানুষঃ একজন নেতা!

ইরানের রাজনৈতিক ইতিহাসে দৃশ্য বদল হয় দ্রুত। জিয়াউদ্দীন অন্তর্হিত হলেন মঞ্চ থেকে এবং পুনরায় আবির্ভূত হলেন ইউরোপে, নির্বাসিতরূপে। রিজা খান রয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে। সেই দিনগুলিতে গুজব রটেছিলো তেহরানে ঃ রিজা খান, জিয়াউদ্দীন

এবং শাহের ছোট ভাই, যুবরাজ—এই তিনজন মিলে ষড়যন্ত্র করছেন শাহকে সিংহাসন থেকে অপসারণ করার জন্য এবং কানা-ঘুষা চলছিলো—আজ পর্যন্ত কেউই জানে না তা সত্য কিনা—শেষমুহূর্তে এ ধরনের অনিশ্চিত এক প্রয়াসে তাঁর নিজের ভবিষ্যত যাতে বিপন্ন হয়ে না পড়ে এজন্য রিজা খান তাঁর বন্ধুদের কথা শাহ্র কাছে ফাঁস করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সত্য-মিথ্যা যা-ই হোক, প্রধানমন্ত্রী রিজা খান শিগ্গির কিছুদিন পরেই তরুণ শাহ্ আহমদকে প্রমোদ ভ্রমণের জন্য ইউরোপ সফরের পরামর্শ দেন। রিজা খান সেই মোটর-সফরে অত্যন্ত জাঁকজমকের সংগে ইরাক সীমান্ত পর্যন্ত যান শাহ্র সাথে সাথে, এবং শোনা যায়, তিনি নাকি শাহ্কে বলেছিলেন, 'মহামান্য শাহ্ যদি কখনো ইরানে ফিরে আসেন, আপনি বলতে পারবেন রিজা খান এই দুনিয়ার কিছুই বোঝে না।'

কারো সংগে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার প্রয়োজন আর তাঁর ছিলো না; নামে না হলেও কাজে তিনি হয়ে উঠলেন ইরানের একচ্ছত্র প্রভু। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো তিনি লাফ মেরে পড়লেন কাজের উপর। গোটা ইরানের সংস্কার করতে হবে শির থেকে তল পর্যন্ত। এতোদিনকার শিথিল প্রশাসন ব্যবস্থা ছিলো এককেন্দ্রিক; সর্বোচ্চ নিলামদারের কাছে প্রদেশ-কে-প্রদেশ ইজারা দেওয়ার পুরানো প্রথা তিনি তুলে দিলেন; গভর্নরেরা আর প্রদেশপাল রইলেন না, এখন থেকে তাঁরা হলেন কর্মচারী। ডিক্টেটরের পোষ্য শিশু-সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠিত করা হলো পাশ্চাত্য প্যাটার্নে। পূর্বে যেসব অবাধ্য উপজাতীয় সর্দার নিজেদের ছোটোখাটো রাজরাজড়া বলে গণ্য করতো এবং প্রায়ই তেহরান সরকারকে মানতে চাইতো না, তাদের বিরুদ্ধে রিজা খান শুরু করলেন অভিযান; যে সব দস্যু-তস্কর যুগ যুগ ধরে গ্রামাঞ্চলে আতংক সৃষ্টি করে রেখেছিলো তদেরকে তিনি দমন করলেন কঠোরভাবে; একজন আমেরিকান উপদেষ্টার সাহায্যে তিনি দেশের অর্থ-ব্যবস্থায় কিছুটা শৃংখলা ফিরিয়ে আনলেন; কর এবং শুল্ক আসতে লাগলো নিয়মিত। বিশৃংখলা দূর করে আনা হলো শৃংখলা।

মনে হয়, যেনো তুর্কীর মোস্তফা কামালের আন্দোলনের প্রতিধ্বনি তুলেই প্রজাতন্ত্রের ধারণা জেগে উঠলো ইরানে, প্রথমে একটা গুজব হিসাবে, তারপর জনগণের মধ্যকার অধিকতরো প্রগতিশীল লোকদের দাবি হিসাবে এবং শেষ পর্যায়ে, খোদ ডিক্টেটরের জাহিরা লক্ষ্যরূপে। কিন্তু এখানে রিজা খান তাঁর বিচারে একটি ভুল করে বসেছিলেন বলে মনে হয় ঃ ইরানী জনতার মধ্য থেকে উঠলো প্রতিবাদের বলিষ্ঠ চীৎকার।

প্রজাতন্ত্রী প্রবণতার বিরুদ্ধে জনগণের এই যে আপত্তি তার কারণ এ নয় যে, তারা শাসক রাজ-পরিবারকে ভালবাসে, কারণ কাজার রাজবংশের প্রতি ইরানের কারোরই কোনো টান ছিলো না। এই পরিবারটি রক্তের দিক দিয়ে তুর্কোম্যান হওয়াতে সবসময়ই একে মনে করা হয়েছে বিদেশী; এর কারণ এও নয় যে, শাহ্ আহমদের গোলগাল, বাল-সুলভ মুখের জন্য ওদের কোনো আবেগাত্মক পূর্বানুরাগ ছিলো। এর কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ঃ জনগণের নিজেদের ধর্ম হারাবার ভয়ই এর মূলে কাজ করেছে, যেমন তুর্কীরা তাদের ধর্মকে হারিয়েছে আতাতুর্কের বিপ্লবের পর। অজ্ঞতার কারণে ইরানীরা ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝতে পারেনি যে, প্রজাতন্ত্রী ধরনের রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অনেক বেশি মিল রয়েছে ইসলামের জীবন

পরিকল্পনার সংগে—রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থার চাইতে। তাদের ধর্মীয় নেতাদের রক্ষণশীলতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে—এবং হয়তো সংগতভাবেই রিজা খান কর্তৃক কামাল আতাতুর্কের প্রকাশ্য প্রশংসায় আতংকিত হয়ে—ইরানীরা প্রস্তাবের মধ্যে তাঁর দেশে সবচেয়ে প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে ইসলামের একটি বিপদই কেবল দেখতে পায়।

এক ভীষণ উত্তেজনায় পেয়ে বসে শহুরে লোকদের, বিশেষ করে যারা তেহরানে বাস করতো তাদের। এক উন্মত্ত জনতা লাঠি আর ঢিল-পাটকেলে সজ্জিত হয়ে রিজা খানের অফিস ভবনের সামনে জমায়েত হয় এবং ঠিক আগের দিন যিনি ছিলেন প্রায় দেবতুল্য তাঁকে অভিশাপ দেয় ও ভয় দেখাতে শুরু করে। রিজা খানের দেহরক্ষীরা জোর দিয়ে তাঁকে বোঝালো, তিনি যেনো এই উত্তেজনা থেমে যাওয়ার আগে বাইরে না বা'র হন। কিন্তু তাদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে একটিমাত্র আর্দালীকে সংগে নিয়ে এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় তিনি অফিস প্রাংগণ ত্যাগ করেন একটি জানালা-ঢাকা ঘোড়ার গাড়ীতে। গাড়ীটি গেট থেকে যেই বা'র হলো অমনি উত্তেজিত জনতা ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়াগুলিকে থামিয়ে দেয়। ওদের মধ্যে কেউ কেউ গাড়ীর দরজা ভেংগে ফেলে আর চীৎকার করতে থাকেঃ 'ওকে টেনে বের করে নিয়ে আসো—ওকে টেনে বের করো রাস্তায়!' কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি নিজেই নেমে পড়ছিলেন গাড়ী থেকে, তাঁর মুখ তখন ক্রোধে জ্বলছে এবং তিনি চাবুক নিয়ে তাঁর আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিলো তাদের মাথায় এবং কাঁধে আঘাত করতে শুরু করলেনঃ 'কুত্তার বাচ্চারা, পালা, এখান থেকে পালা। কী হিম্মত তোদের! আমি হচ্ছি রিজা খান, তোরা তোদের মাগীদের কাছে ফিরে যা, ফিরে যা তোদের বিছানায়! এবং মাত্র কয়েক মিনিট আগে যে উন্মত্ত জনতা তাঁকে ভয় দেখাচ্ছিলো তারা পেছনে হটে যায়, একজন একজন করে সরে পড়ে এবং পাশের অলি-গলিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। একজন মহান নেতা আবার কথা বলেছেন তাঁর জাতির উদ্দেশ্যে; তিনি কথা বলেছেন ক্রোধের সংগে এবং তাতেই ওরা নত হয়ে পড়েছে। হতে পারে রিজা খান তাঁর জাতিকে যে ভালোবাসতেন সেই ভালোবাসা ভেদ করে সেই মুহূর্তে জন্ম নিয়েছিলো একটা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের অনুভূতি, এবং তাই হয়তো দেশবাসীর প্রতি তাঁর প্রেমকে চিরদিনের জন্য আচ্ছন্ন হয়ে রেখেছিলো।

কিন্তু রিজা খানের গৌরবজনক সাফল্য সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্র আর বাস্তবে রূপ নিলো না। এই পরিকল্পনার সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় এই-ই স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, জনগণের প্রতিরোধের মুকাবিলায় কেবলমাত্র সামরিক শক্তির পক্ষে একটি 'সংস্কার আন্দোলন' সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ব্যাপার এ নয় যে, ইরানীরা সংস্কার মাত্রেরই বিরোধী। কিন্তু তাদের এই সহজাত উপলব্ধি ঘটেছিলো যে, আমদানি করা পাশ্চাত্য রাজনৈতিক মতবাদের পরিণতিই হবে—নিজেদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পটভূমিকায় কোনো সময়ে একটি সুস্থ বিকাশ লাভের সকল আশার শেষ।

তখনো কিংবা কখনো রিজা খান তা বুঝতে পারেননি, যার ফলে তিনি তাঁর দেশের মানুষের সংগে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলেন। তাঁর প্রতি ওদের ভালোবাসা উবে যায় এবং ধীরে ধীরে তার স্থান দখল করে ভয়ংকর এক ঘৃণা ও বিদ্বেষ। ওরা জিগ্গাস করতে শুরু করলো:

নিজেদেরঃ বীর প্রবর তাঁর জাতির জন্য আসলে কী করতে পেরেছেন? ওরা রিজা খানের সাফল্যগুলি গুণে দেখলো এক এক করে ঃ সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন—কিন্তু তার জন্য দিতে হয়েছে ভয়ংকর মূল্যঃ যার জন্য পিঠ ভেংগে দেওয়া ট্যাক্সের বোঝা চাপানো হয়েছে এমনিতে জীবন্মৃত জাতির উপরে। উপজাতীয় বিদ্রোহগুলির দমন? কিন্তু তার সংগে দমন করা হয়েছে দেশপ্রেমিক অংশটিকেওঃ তেহরানে লোক দেখানোর মতো নির্মাণ তৎপরতা চলছে; কিন্তু পল্লী অঞ্চলে কৃষক সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্য কেবল বেড়েই চলেছে। লোকদের স্মরণে আসতে লাগলো মাত্র কয়েক বছর আগেই রিজা খান ছিলেন একজন দরিদ্র সিপাই, কিন্তু এখন তিনি ইরানের সবচেয়ে ধনী মানুষ এবং নিজের নামেই যে কতো একর জমি রয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। এইগুলিই কি সংস্কার যা নিয়ে ঢাকঢোল পেটানো হয়েছিলো? ডিক্টেটরের প্রভাবে তেহরানে যে অল্প কটি ঝকঝকে অফিস ভবন গড়ে উঠেছে এবং এখানে-ওখানে যে কটি বিলাস-বহুল হোটেল নির্মিত হয়েছে সেগুলি কি জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নের কোনো প্রমাণ বহন করে?

তাঁর জীবনের ঠিক এই পর্যায়ে আমি রিজা খানের পরিচয় জানতে পাই। তাঁর-ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ এবং তাঁর বিরুদ্ধে স্বার্থপরতার যে অভিযোগ আনা হয়ে থাকে, এ সম্পর্কে গুজব যাই রটুক না কেন, যে মুহূর্তে তিনি 'যুদ্ধ ওজারত'-এ তাঁর অফিসে আমাকে স্বাগত জানালেন, এই লোকটির মহত্ত্ব আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো না। হয়তো এই অফিসটি ছিলো সবচেয়ে সাদাসিধা অফিস, যা কোথাও কখনো ব্যবহার করেছেন একজন প্রধানমন্ত্রীঃ একটা ডেস্ক, কালো অয়েলক্লথে মোড়া একটি সোফা, একজোড়া চেয়ার, ছোট্ট একটি বুক-শেল্ফ এবং মেঝেতে বিছানো উজ্জ্বল অথচ কম দামের একটি গালিচা ছাড়া আর কিছু ছিলো না সেই কামরাটিতে। এবং পঞ্চাশ ও ষাটের মাঝামাঝি বয়সে, দীর্ঘদেহী ভারী গড়নের যে মানুষটি ডেস্কের পেছন থেকে ধীরে ধীরে দাঁড়ালেন তাঁর পরণে ছিলো সাদামাটা একটি খাকি উর্দী, যাতে ছিলো না পদ-মর্যাদাসূচক কোনো পদক, রিবন অথবা ব্যাজ।

আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন জার্মান রাষ্ট্রদূত কাউন্ট ফন ডার্ শুলেনবার্গ (কারণ আমি নিজে অস্ট্রীয় এবং একটা মশহুর জার্মান সংবাদপত্রের প্রতিনিধি)। সেই প্রথম আনুষ্ঠানিক কথাবার্তার মধ্যেও আমি রিজা খানের প্রকৃতির গুরুগম্ভীর গতিময়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি। ধূসর খোঁচা-খোঁচা ঘন ভ্রূর তল থেকে এক জোড়া তীক্ষ্ম বাদামী রঙের চোখ তাকাচ্ছিলো আমার দিকে—খাস পারসিকের চোখ, যা সাধারণত ঢাকা থাকে চোখের পুরু পাতার নীচেঃ বিষণ্নতা ও দৃঢ়তার অদ্ভুত এক মিশ্রণ! তাঁর নাক এবং মুখের আশপাশে গাঢ় রেখাগুলিতে তিক্ততার অভিব্যক্তি, কিন্তু মোটা হাড়ডির উপর তাঁর মুখাবয়ব থেকে ফুটে উঠছিলো এক অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি যার ফলে তাঁর ঠোঁটের উপর ঠোঁট বসেছে চেপে এবং চোয়ালে পড়েছে কঠিন চাপ। আপনি যখন মন দিয়ে শুনছেন তাঁর নীচু গলায় সুন্দর লেহানে কথাবার্তা, যা এমন একজন মানুষের কণ্ঠস্বর যিনি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে এবং কথাকে শব্দ হয়ে উঠতে দেয়ার আগেই প্রত্যেকটি কথাকে তাঁর জিবের উপর ওজন করে দেখতে অভ্যস্ত—আপনার মনে হবে, আপনি এমন এক লোকের সংগে কথা বলছেন যাঁর পেছনে রয়েছে ত্রিশ বছর দীর্ঘ স্টাফ অফিসার ও পদস্থ সামরিক কর্মর্তার জীবনঃ এবং আপনার বিশ্বাস

করা কঠিন হবে যে, মাত্র ছয় বছর আগে রিজা খান ছিলেন একজন সার্জেন্ট এবং মাত্র তিন বছর আগে তিনি লিখতে ও পড়তে শিখেছেন!

তাঁর প্রতি আসার ঔৎসুক্য এবং হয়তো তাঁর জাতির প্রতি আমার অনুরাগও তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কারণ তিনি প্রায় পীড়াপীড়ি করেই বললেন এই সাক্ষাৎ যেনো শেষ সাক্ষাৎ না হয় এবং আমাকে আর শুলেনবার্গকেও অনুরোধ করলেন—আমরা যেনো পরের হপ্তায় তেহরান থেকে কয়েক মাইর দূরে মনোরম মনোরম উদ্যান শেমরানে তাঁর গ্রীষ্মনিবাসে তাঁর সংগে চা খাই।

শুলেনবার্গের সংগে আমি ঠিক করলাম আমি প্রথম তাঁর কাছেই আসবো (বেশির- ভাগ বিদেশী দূতের মতোই তিনিও গ্রীষ্মকালটি কাটাচ্ছিলেন শেমরানে) এবং আমরা দু'জন একত্রে যাবো প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। কিন্তু কার্যত আমি পৌঁছুতে পারলাম না ঠিক সময়ে। কয়েকদিন আগে আমি শিকারের জন্য কিনেছি দুটি তাজী ঘোড়াসহ চার চাক্কার একটি ছোট্ট গাড়ি। ঘোড়াগুলি যে কী রকম তেজী ছিলো তা সম্পূর্ণ ধরা পড়লো তেহরানের বাইরে কয়েক মাইল দূরে, যখন কোনো একটা বদ্ প্রবৃত্তি বশে ওরা এমন একরোখা বেঁকে বসলো যে, কিছুতেই সামনে আগাবে না, বরং ঘরে ফিরে যাবার জন্য ওরা জেদ করতে লাগলো। প্রায় কুড়ি মিনিট আমি ওদের সাথে সংগ্রাম করি। আখেরে আমি ইবরাহীমকে ঘোড়া এবং গাড়ি ঘরে ফিরে নিয়ে যেতে বলে পয়দল রওয়ানা হই, অন্য কোনো যানবাহন পাওয়া যায় কি না তারই খোঁজে। দু'মাইল পায়ে হাঁটার পর আমি এসে পৌঁছুই একটি গ্রামে; সেখানে ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেলাম একটি 'দ্রসকী', নিচু চার চাক্কাওয়ালা খোলা ঘোড়ার গাড়ি। কিন্তু যখন আমি জার্মান দূতাবাসে পৌঁছলাম তখন নির্দিষ্ট সময় থেকে আমার প্রায় দেড় ঘণ্টা দেরী হয়ে গেছে। আমি দেখতে পেলাম শুলেনবার্গ ক্রুদ্ধ বাঘের মতো পায়চারী করছেন এদিক-ওদিক; তাঁর চেহারায় স্বাভাবিক নম্রতা একদম নেই; তাঁর প্রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত এবং তাঁর শৃংখলাবোধের বিচারে সময় রক্ষা না করার অপরাধ অধার্মিকতার চাইতে কম ছিলো না। আমাকে দেখেই তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেনঃ 'তুমি এ পারো না, একজন প্রধানমন্ত্রীর সংগে তুমি এ করতে পারো না! তুমি ভুলে গেছো যে, রিজা খান একজন ডিক্‌টেটর এবং আর সকল ডিক্‌টেটরের মতোই অতি মাত্রায় স্পর্শকাতর?'

—'কাউন্ট শুলেনবার্গ, আমার ঘোড়াগুলি এ সূক্ষ্ম পয়েন্টটি দেখতে পায়নি বলে মনে হয়'। —এছাড়া আমি কোনো জবাব খুঁজে পেলাম না, 'চীনের সম্রাট হলেও আমার পক্ষে এর আগে পৌঁছুনা সম্ভব হতো না।'

এতে কাউন্টের রসবোধ আবার ফিরে আসে এবং তিনি বিপুল হাস্যে ফেটে পড়লেন ঃ

—'আল্লাহ্‌র কসম! এ রকম ব্যাপার আমার জীবনে কখনো ঘটেনি। তাহলে চলো যাই—পদাতিক সান্ত্রী আমাদের মুখের উপর দরোজা বন্ধ না করে দিলেই হয়...।'

সে তা করেনি। আমরা রিজা খানের প্রাসাদে পৌঁছুনোর অনেক আগেই চায়ের মজলিস শেষ হয়ে গেছে এবং বাকি সব মেহমান বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু আমি যে প্রটোকল ভংগ করেছি, এজন্য রিজা খানকে মোটেই আহত মনে হলো না। আমাদের দেরীর কারণ শুনে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বললেন ঃ

—'চমৎকার, আমি তোমার এই ঘোড়াগুলিকে দেখতে চাই। আমি মনে করি, নিশ্চয়ই এগুলি বিরোধী দলের। আমি জানি না এদের পুলিশ হেফাজতে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি না!'

আমার এ অসময়ে আগমন, ইরানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রী এবং একজন তরুণ সাংবাদিকের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা বহির্ভূত একটি সহজ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথে বাধা না হয়ে সহায়কই হয়েছিলো। এর ফলে, পরবর্তীকালে আমি এমন স্বাধীনভাবে দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পেরেছি যা বেশির ভাগ বিদেশীকেই করতে দেয়া হয় না।

কিন্তু আলী আগার চিঠিতে সেই প্রথমদিকের দিনগুলির রিজা খান সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই, যিনি এমনিতরো সরলভাবে জীবন কাটাতেন যা প্রদর্শনী-প্রিয় ইরানীদের কাছে প্রায় অবিশ্বাস্যঃ এ চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে রিজা শাহ্ পাহ্লভীর, যিনি ১৯২৫ সনে আরোহণ করেন ময়ূর সিংহাসনে। এতে উল্লেখ রয়েছে রাজার কথা যিনি বিনয় নম্রতার সমস্ত ভানই ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন এবং এখন চাইছেন কামাল আতাতুর্কের অনুকরণে তাঁর প্রাচীন প্রাচ্য দেশে একটি সাড়ম্বর অহংকারী প্রতীচ্য মুখাবয়ব গড়ে তুলতে...

আমি এখন চিঠির শেষ কথাগুলিতে আসছি ঃ

—'প্রিয় দোস্ত, আপনি যদিও এখন পবিত্র মদীনাতুন্নবীতে আছেন, তবু আমি বিশ্বাস করি, আপনি আপনার এই নালায়েক দোস্ত এবং তার দেশকে তোলেননি এবং কখনো ভুলবেন না।'

হে আলী আগা, আমার তরুণ বয়সের দিনগুলির দোস্ত—'আমার হৃদয়ের আলো' এই বাক্‌ভংগীতেই আপনি নিজে হয়তো বলতেন, আপনার চিঠি আমাকে স্মৃতিতে মাতাল করেছে; কারণ আমি পারস্যমাতাল হয়ে পড়েছিলাম যখন আমি আপনার দেশকে জানতে শুরু করি, সেই পুরানো নিষ্প্রভ রত্ন, যা স্থাপিত হয়েছে পুরাকালের স্বর্ণ, চিড় খাওয়া মর্মর, ধূলাবালি এবং ছায়ায়, আপনার বিষণ্ন দেশের সকল দিন রাত্রির, আপনার কওমের গাঢ় কালো স্বপ্নিল চোখের ছায়াপটে..

কুর্দীস্তানের পাহাড়গুলি পেছনে ফেলে যাওয়ার পর আমি যে প্রথম ইরানী শহরটি দেখতে পাই সেই কিরমানশাহ্‌র কথা আমার মনে পড়ছে। এক অদ্ভুত নিষ্প্রভ অস্বচ্ছ আবহাওয়া ঘিরে আছে শহরটিকে, যেনো ঢাকা দেওয়া, অবনমিত—জীর্ণ, ছন্নছাড়া একথা না-ই বললাম। এতে সন্দেহ নেই—প্রতীচ্যের প্রত্যেকটি শহরেই দারিদ্র্য দৃশ্যমান সমতলের নিকটেই থাকে। ইউরোপের যে-কোনো শহর থেকে দারিদ্র্য এখানে অনেক বেশি চোখে পড়ে। কিন্তু এর সাথে ইতিমধ্যেই আমি ছিলাম অভ্যস্ত। অর্থনীতির অর্থে এ ঠিক দারিদ্র্য নয়, যা এতো প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে আমার নিকট; কারণ, বলা হয় কিরমানশাহ একটি সমৃদ্ধিশালী শহর। বরং এ হচ্ছে এমন এক ধরনের হতাশা যা প্রত্যক্ষভাবে আচ্ছন্ন করেছিলো ওদের, যার সংগে অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো যোগ ছিলো বলে মনে হয় না।

এখানকার সব লোকেরই চোখ বিশাল এবং কালো। নাকের সন্ধিস্থলের উপর এসে মিলে যাওয়া পুরু কালো ভ্রুর নিচে ভারী চোখের পাতায় পর্দার মতো ঢাকা এই চোখ।

ওদের বেশিরভাগই দেখতে চিকন-চাকন (আমি ইরানে কোনো মোটা লোক দেখেছি বলে মনে পড়ে না)। ওরা কখনো শব্দ করে হাসে না এবং ওদের নীরব স্মিত হাস্যে এমন একটা অস্পষ্ট ব্যংগাত্মক ভাব রয়েছে যা প্রকাশ করে যতোটুকু গোপন করে তার চাইতে অনেক বেশি। মুখাবয়বে কোনো গতিময়তা নেই, নেই আকার ইংগিতে কথা বলার প্রয়াস; কেবলি নিশ্চুপ পরিমিত গতি ও অংগভংগী—মনে হয় ওরা সবাই যেন মুখোশ পরে আছে।

প্রাচ্যের সকল নগরীর মতোই এখানকার শহুরে জীবনের কেন্দ্র হচ্ছে বাজার। একজন অপরিচিত লোকের কাছে বাজারটি ভেসে ওঠে বাদামী, সোনালী-বাদামী এবং গালিচা-লাল কোমলীকৃত মিশ্রণরূপে—যেখানে রয়েছে ইতস্তত ঝকঝকে তামার থালা ও গামলা এবং হয়তো বা কাফেলার সরাইখানার দরোজার উপরে চিত্রিত হালকা-নীল চীনা মাটির বাসনের রং, যাতে চিত্রিত রয়েছে কালো চক্ষু যোদ্ধা ও ডানাওয়ালা আজদাহার ছবি। আপনি যদি আরো একটু মনোযোগ দিয়ে তাকান, বাজারে আবিষ্কার করবেন দুনিয়ার সকল রং—কিন্তু এ বিচিত্র রংগুলির কোনোটিই সব কিছু একত্রে মিশিয়ে ফেলা ছাদের ছায়ায় কখনো নিজেকে প্রখরতরো করে তুলতে পারছে না—সেই সব ছাদ, যা বাজারটিকে ঢেকে রেখেছে এবং একটি ঘুমঘুম আলো—আঁধারীর মধ্যে সব কিছুকে টেনে নিচ্ছে এক সাথে। ছাদের ধনুকের মতো বাঁকানো তোরণগুলি ছেদা করা হয়েছে নির্দিষ্ট ব্যবধানে যাতে করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁক দিয়ে ভেতরে আসতে পারে দিনের আলো। এসব ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সূর্যের কিরণ এসে পড়ছে ভেতরে। কক্ষগুলির সুগন্ধি পরিবেশ এই সূর্য-রশ্মি যেনো জমাট পদার্থ হয়ে ওঠে এবং অস্বচ্ছ তীর্যক আলোক-স্তম্ভের মতো দেখায়; মানুষ যে ওসবের ভেতর দিয়ে চলছে তা মনে হয় না, বরং এইগুলি—এই উজ্জ্বল স্তম্ভগুলিই যেনো এইসব ছায়া মানুষের ভেতর দিয়ে আগিয়ে যাচ্ছে....

কারণ, এই বাজারের লোকগুলি ভদ্র এবং ছায়ার মত নীরব। যদি কোনো ব্যবসায়ী কোনো পথচারীকে নিচু গলায় ডাকে, কেউই তার জিনিসপত্রের গুণকীর্তনের জন্য চীৎকার করে না বা গান গায় না, যা করা হয়ে থাকে আরবের বাজারগুলিতে। এখানে জীবনের পায়চারী নিঃশব্দ, মোলায়েম। মানুষ এখানে কখনো অন্যকে কনুই মেরে বা ধাক্কা দিয়ে আগায় না। ওরা খুবই বিনীত এবং এমনি সে বিনয়, যা মনে হবে নম্রতায় নুয়ে আছে আপনার দিকে; কিন্তু আসলে তা আপনাকে রাখে এক হাত দূরে। পষ্টতই ওরা লোক হিসাবে খুবই চালাক এবং অপরিচিত লোকের সাথে কথা বলতে ওদের কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু কথা বলে কেবল ওদের ঠোঁট। ওদের অন্তর পশ্চাৎভূমিতে অন্যত্র কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, ওজন করে নিরাসক্তভাবে...

চায়ের দোকানে বসে আছে মজুর শ্রেণীর কিছু লোক, খড়ের মাদুরের উপর—হয়তো ওরা হস্তশিল্পী দিনমজুর, কাফেলার উট বা ঘোড়া-গাঁধার চালক—সবাই এক সংগে ঘেষাঘেষি করে বসে আছে জ্বলন্ত কয়লা ভর্তি লোহার কড়াইয়ের চারপাশে। লম্বা লম্বা দুটি পাইপ, আর তার সঙ্গে চীনামাটির কলকে পরিবেশন করা হচ্ছে তাদের নিকট; আফিমের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধে ঘরের বাতাস ভরে আছে। তারা কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে পাইপ টেনে চলে। প্রত্যেকে একবার কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে পাইপটি তুলে দিচ্ছে তার পাশের লোকটির হাতে; আর সেই সময়ে এমন একটি জিনিস আমি দেখতে পেলাম যা আগে আর

কখনো দেখিনি। অনেক, অনেক লোক আফিঙ খাচ্ছে, কেউ কেউ বেশ প্রকাশ্যে আর কেউ কেউ কিছুটা কম প্রকাশ্যে; দোকানী বসে থাকে তার গর্তের মতো দোকানটিতে; সরাইখানার তোরণওয়ালা প্রবেশদ্বারের নিচে বসে থাকে ভবঘুরে নিষ্কর্মা কোনো লোক; তাম্রকার মুহূর্তের অবকাশ যাপন করছে তার কারখানায়। ওরা সকলেই এখন পাইপ টানছে। একই রকম উদাস, কিছুটা ক্লান্ত মুখে, সীমাহীন, অবলম্বনহীন শূন্যতার দিকে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে...

পুরু ঝুড়িসমেত টাটকা সবুজ পোস্তদানা বাজারের সব জায়গায় বিক্রি করছে বিক্রেতারা এবং বাহ্যত একইভাবে তা খাচ্ছে লোকেরা। এ হচ্ছে আফিম খাওয়ার আরেকটি মৃদু রূপ। এমন কি, দরোজায়-দরোজায় কোণায়-কোণায় দাঁড়িয়ে বসে ছেলেরা পর্যন্ত খাচ্ছে পোস্তদানা। দুই বা তিনজনের মধ্যে ওরা নিজেরা ভাগ করে নিচ্ছে মজার বস্তুটি, পরস্পরের প্রতি সেই বয়স্ক মানুষের সহনশীলতা নিয়ে, শিশুসুলভ স্বার্থপরতা না দেখিয়ে—শিশুসুলভ আনন্দ বা উৎফুল্লতাও প্রদর্শন না ক'রে। কিন্তু এর চাইতে ভিন্নই বা ওরা কি ভাবে হতে পারতো? ওদের জীবনের একেবারে শুরুতে যখন ওরা কাঁদতো এবং ওদের মা-বাপকে বিরক্ত করতো তখন ওদের খাওয়ানো হতো পোস্তদানা থেকে তৈরি এক কড়া পানীয়। ওরা যখন বড় হয় এবং রাস্তায় ছোটাছুটি করতে শুরু করে তার আগেই ওদের মধ্যে প্রশান্তি, দুর্বলতা ও দয়ামায়ার সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এবং তখনই আমি বুঝতে পারলাম কী সেই জিনিস যা আমাকে এতো বিচলিত করেছিলো প্রবলভাবে, যখন আমি প্রথম দেখেছিলাম ইরানীদের ক্লান্ত বিষণ্ন চোখ। ওদের মধ্যে একটি করুণ নিয়তির লক্ষণ আমি টের পেলাম, মজলুম মানুষের মুখে যেমন লেগে থাকে দুঃখের করুণ হাসি তেমনি; একইভাবে ওদের সংগে জড়িত রয়েছে আফিম; এ ওদের নম্রতার সংগে, ওদের অন্তরের ক্লান্তির সংগে জড়িত; এমনকি ওদের বৃহৎ দারিদ্র্য ও মহৎ মিতব্যয়িতার সংগেও এর সম্পর্ক রয়েছে। সম্ভবত, ততো বেশি পাপ বলে তা মনে হলো না—যতোটা তা একটা অভিব্যক্তি এবং হয়তো সাহায্যও! সাহায্য কিসের বিরুদ্ধে? প্রশ্নের বিস্ময়কর এক জগত।

আমি প্রথম যে ইরানী নগরীর সংগে পরিচিত হই সেই কিরমান-শাহ্‌র স্মৃতি ও ছবির মধ্যে আমার মন বিচরণ করলো এতোক্ষণ। কারণ সে ছবিগুলি নানারূপ কিন্তু সব সময়েই মূলত অপরিবর্তিত অবস্থায়ই আমার সামনে ছিলো। আমি ইরানে যে দেড়টি বছর কাটাই তার শুরু থেকে শেষপর্যন্ত একটি মোলায়েম সর্বব্যাপী বিষণ্নতা ছিলো সর্বত্রই এর বৈশিষ্ট্য। গ্রামে শহরে, মানুষের রোজকার কাজে তাদের বিভিন্নধর্মী উৎসবে এ ব্যাপারটি চোখে পড়ে। বস্তুত আরবদের বিশ্বাসের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা ইরানীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় দুঃখ-শোকের একটি গাঢ় রং ঃ ১৩০০ বছর আগে যেসব মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিলো তার জন্য রোদন, নবীর জামাতা আলী এবং আলীর দুই পুত্র হাসান এবং হোসেনের মৃত্যুর জন্য মাতম ওদের কাছে ইসলামের লক্ষ্য কি এবং মানুষের জীবনকে ইসলাম কোন্ পথে পরিচালিত করতে চায় তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে...

বহু সন্ধ্যায় বহু শহরে আমি দেখেছি, নারী এবং পুরুষের বিভিন্ন দল কোনো রাস্তা

জমায়েত হয়েছে এক মুসাফির দরবেশের চারপাশে, যিনি একজন ধর্মীয় সাধু পুরুষ, তাঁর পরণে সাদা পোশাক, পিঠের উপর চিতাবাঘের ছাল, ডান হাতে লম্বা হাতলওয়ালা কুড়াল এবং বাঁ হাতে নারকেলের মালার ভিক্ষা-পাত্র। তিনি আবৃত্তি করে চলেছেন অর্ধেক গানের মাধ্যমে, অর্ধেক কথায় সপ্তম শতকে রসূলুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের পর খিলাফত নিয়ে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিলো তারই উপর একটি গাঁথা—ঈমান, রক্ত এবং মৃত্যুর এক শোকাবহ কাহিনী এবং সবসময়েই এর রূপ অনেকটা এই রকম ঃ

শোনো লোকসকল, আল্লাহ যাদের মনোনীত করেছিলেন তাঁদের ভাগ্যে কি ঘটেছিলো এবং নবী বংশের রক্ত কিভাবে পৃথিবীর উপর বইয়ে দেওয়া হয়েছিলো সে কাহিনী শোনোঃ

একসময় এক নবী ছিলেন যাঁকে আল্লাহ্‌ তুলনা করেছিলেন জ্ঞানের নগরীরূপে এবং সেই জ্ঞানের নগরীর প্রবেশদ্বার ছিলেন তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত সর্বশ্রেষ্ঠ বীর, তাঁর জামাতা আলী—পৃথিবীর জ্যোতি, নবীর পয়গামে অংশীদার, যাঁকে বলা হতো 'আল্লাহর সিংহ'।

যখন নবীজি ইন্তেকাল করলেন তখন আল্লাহ্‌র সিংহ ছিলেন তাঁর সত্যিকার উত্তরাধিকারী, কিন্তু দুষ্ট লোকেরা সেই সিংহের আল্লাহ্‌-নির্দেশিত অধিকার হরণ করে এবং অন্য একজনকে বানায় নবীর খলীফা ঃ এবং প্রথম বিনা-অধিকারে জবর দখলকারের মৃত্যুর পর তারই মতো দুষ্ট প্রকৃতির আরেকজন তার উত্তরাধিকারী হয় এবং পরে আরো একজন।

এবং কেবল এই তৃতীয় তস্‌রুফকারীর ধ্বংসের পর আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যক্ত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্‌র সিংহ তাঁর এই ন্যায্য স্থানে উপনীত হন আমীরুল মু'মিনীন হিসাবে।

কিন্তু আলী এবং আল্লাহ্‌র শত্রুরা ছিলো সংখ্যায় অনেক এবং একদিন যখন তিনি সালাতে সিজদায় গিয়েছেন প্রভুর সম্মুখে তখন এক ঘাতকের তরবারীর আঘাতে তিনি নিহত হন। এই ভয়াবহ পাপ-কর্মে পৃথিবী কেঁপে ওঠে বেদনায়, পাহাড় পর্বত ক্রন্দন করে এবং অশ্রু বিসর্জন করে শিলারাশিঃ

হে আল্লাহ্‌, তোমার লানত বর্ষিত হোক অন্যায়চারীদের উপর এবং চিরস্থায়ী আজাব ওদের গ্রাস করুক।

আবার এক পাষণ্ড জালিম দেখা দিলো এবং আল্লাহ্‌র সিংহের পুত্র হাসান এবং হোসেন, হযরত ফাতেমর দুই পুত্রকে সে বঞ্চিত করলো নবীর সিংহাসনে তাঁদের ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে। হাসানকে ষড়যন্ত্র করে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হলো এবং হোসাইন যখন ধর্ম রক্ষার্থে দাঁড়ালেন, তাঁর পরম সুন্দর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া হলো কারবালার প্রান্তরে যখন তিনি যুদ্ধের পর তৃষ্ণা মেটাবার জন্য হাঁটু গেঁড়ে বসেছিলেন একটি জলাশয়ের কাছে। ওহো, আল্লাহ্‌র লানত বর্ষিত হোক পাষণ্ডদের উপর আর ফেরেশতাদের অশ্রু যেনো চিরকাল সিক্ত করে কারবালার পবিত্র মাটিকে।

হোসাইনের শির—যে-শির একসময় চুম্বন করেছিলেন রসূলুল্লাহ্‌—নির্দয়ভাবে কেটে ফেলা হলো এবং তাঁর মস্তকহীন লাশ নিয়ে আসা হলো তাঁর রোরুদ্যমান সন্তানদের

নিকট, যাঁরা অপেক্ষায় ছিলেন তাঁদের পিতার প্রত্যাবর্তনের।

এবং তখন থেকে বিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌র লানত কামনা করে আসছেন জালিমদের উপর এবং আলী, হাসান এবং হোসাইনের মৃত্যুর জন্য মাতম করে চলেছেন। আর হে বিশ্বাসীরা, তাঁদের মৃত্যুর জন্য তোমরা উচ্চৈঃস্বরে আহাজারী করো, কারণ যারা নবীর বংশধরদের জন্য কাঁদে আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্ মাফ করে দেন....

আর এভাবে গাওয়া গাঁথা যে–সব রমণী শুনছে তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে আকুল কান্না, আর শ্মশ্রুমণ্ডিত মানুষের মুখের উপর দিয়ে নীরবে গড়াতে থাকে অশ্রুধারা...

আসলে, ইসলামী বিশ্বের যে–ক্ষত কখনো শুকায়নি সে ক্ষত সেই প্রথমদিকে যেসব ঘটনা সৃষ্টি করেছিলো সে–সবের সত্যিকার ঐতিহাসিক চিত্রের সাথে এই বাড়াবাড়ি 'শোকে'র মোটেই সম্পর্ক নেই। সেই ক্ষতটি কী? মুসলিম সম্প্রদায়ের দু'ভাগে বিভক্তি—সুন্নী এবং শিয়া দুই মাজহাবে—সুন্নীরা, যাদের নিয়ে মুসলিম জাতিগুলির বেশিরভাগই গঠিত, যারা খলীফার পদের জন্য নির্বাচনের নীতিতে সুদৃঢ়; শিয়ারা, যারা দাবি করে রসূলুল্লাহ্ তাঁর জামাতা হযরত আলীকে তাঁর ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী এবং খলীফা মনোনীত করেছিলেন। আসলে কিন্তু রসূলুল্লাহ্ তাঁর কোনো খলীফা মনোনীত না করেই ইন্তেকাল করেন, যে–কারণে মুসলিম উম্মাহ্‌র বিপুল সংখ্যাগুরু কর্তৃক তাঁর সবচেয়ে বয়স্ক এবং বিশ্বস্ত সহচর আবু বকর 'খলিফা' নির্বাচিত হন। আবু বকরের পর খলীফা হন উমর এবং উমরের পর উসমান। উসমানের মৃত্যুর পরই কেবল আলী খলীফা নির্বাচিত হন। আলীর পূর্ববর্তী তিন খলীফা সম্পর্কে মন্দ কিম্বা খারাপ কিছু আমি আমার ইরানের সেই দিনগুলিতেও কখনো খুঁজে পাইনি। ওঁরা রসূলুল্লাহ্‌র পরে ইসলামের ইতিহাসে মহত্তম মানুষ ছিলেন সন্দেহাতীতভাবেই এবং বহু বছর ধরে ওঁরা ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহচর। ইসলাম মানুষকে যে–অধিকার দিয়েছে স্বাধীনভাবে সে অধিকার প্রয়োগ করেই মুসলিম 'উম্মাহ্' নির্বাচন করেছিলেন তাঁদের। তাঁরা 'জবর দখলকার' ছিলেন না। এই তিন খলীফা কর্তৃক ক্ষমতা লাভ নয়, বরং জনগণের এ সব নির্বাচনের ফল আলী এবং তাঁর অনুসারীরা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে রাজী না হওয়ার ফলেই শুরু হয় পরবর্তী ক্ষমতার লড়াই, আলী নিহত হন এবং পঞ্চম খলীফা মাবিয়ার নেতৃত্বে মূল প্রজাতন্ত্রী ধরনের ইসলামী রাষ্ট্রের রূপান্তর ঘটলো বংশগত রাজতন্ত্রে—চূড়ান্ত পর্যায়ে যার পরিণতি ঘটলো কারবালা ময়দানে হোসাইনের শাহাদতে।

হ্যাঁ, এ সবই আমি জানতাম ইরানে আসার আগেই, কিন্তু আলী, হাসান এবং হোসাইনের নাম উচ্চারণের সংগে সংগেই ইরানীদের মধ্যে ১৩০০ বছর আগের সেই পুরানা মর্মন্তুদ কাহিনী আজো যে অপরিসীম ভাবাবেগ সৃষ্টি করে তাতে আমি বিস্মিত হই। বিস্ময়ের সংগে আমি নিজেকে জিগ্‌গাস করতে থাকি : ওরা যে 'শিয়া' মতবাদকে এভাবে আপন মনে করে আলিঙ্গন করছে তার কারণ কি ইরানীদের স্বভাবজাত বিষাদ এবং ওদের নাটকীয়তাবোধ? না কি শিয়া মতবাদের উদ্ভবে যে ট্র্যাজিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা–ই ইরানীদের এই গভীর বিষাদের জন্ম দিয়েছে?

ক্রমে দীর্ঘ কয়েকটি মাস ধরে আমার মনে এর একটি চমকপ্রদ জবাব স্পষ্ট আকার নেয়।

সপ্তম শতকের মাঝামাঝি উমরের সৈন্যবাহিনী যখন প্রাচীন সাসানীয় সাম্রাজ্য দখল করে ইসলামী জীবনাদর্শকে সংগে নিয়ে, তার অনেক পূর্বেই ইরানের জরথুস্ত্রীয় মতবাদ পরিণত হয়েছে একটি অনড় অনুষ্ঠান- সর্বস্বতায়, আর এ কারণে, আরব থেকে যে বেগমান নতুন ভাব-বন্যা এলো তাকে কার্যকরভাবে তা বাধা দিতে পারলো না। কিন্তু ইরানের বুকে আরব বিজয়ের বিস্ফোরণ যখন ঘটেছে সেই মুহূর্তে ইরান অতিক্রম করছিলো সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক চাঞ্চল্যের যুগ, যে-চাঞ্চল্যের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছিলো জাতীয় পুনর্জাগরণের এক প্রতিশ্রুতির আভাস। আরব অভিযানের ফলে একটি মানসিক, সাংগঠনিক পুনর্জাগনের এই আশা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং ইরানীরা তাদের বিকাশের নিজস্ব ঐতিহাসিক ধারাটি পরিত্যাগ করে, বাইরে থেকে আনীত তামদ্দুনিক ও নৈতিক ধ্যান-ধারণার সাথে তখন থেকেই নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নেয়।

অন্য আরো বহু দেশের মতোই ইরানে ইসলামের আবির্ভাব বিস্ময়কর সামাজিক অগ্রগতির পরিচায়ক। এর আঘাতে ইরানের সনাতন বর্ণপ্রথা ভেংগে চুরমার হয়ে যায়। এর স্থলে ইসলাম জন্ম দিলো স্বাধীন সমান মানুষের এই নতুন জনগোষ্ঠীর। সাংস্কৃতিক যে-সব শক্তি দীর্ঘকাল ধরে ছিলো সুপ্ত, অনুচ্চারিত ইসলাম সেগুলির জন্য উন্মুক্ত করে দিলো নব নব প্রণালী। কিন্তু তা সত্তেও দারায়ুস ও জারেক্সেসের গর্বিত বংশধরেরা কখনো ভুলতে পারলো না যে, তাদের জাতীয় জীবনে ঐতিহাসিক নিরবচ্ছিন্নতা, তাদের গতকাল এবং আজকের মধ্যে মৌলিক সম্বন্ধ হঠাৎ টুটে গেছে। জেন্দাবেস্তীয় ধর্মের অদ্ভুত দ্বৈতাবাদে এবং আব-আতশ-খাক-বাদ্ এই চারটি উপাদানের প্রায় সর্বেশ্বরবাদী পূজায় যে জাতীর অন্তরংগতম চরিত্র খুঁজে পেয়েছিলো তার অভিব্যক্তি, সেই জাতিই আজ সম্মুখীন হলো ইসলামের কঠোর আপসহীন তওহীদের এবং পরম সত্যের জন্য তার উন্মাদনার। ইরানীয়দের পক্ষে ইসলামের জাতিচেতনা অতিক্রম করে যাওয়া ধারণার নিকট তাদের গভীরমূল জাতীয় চেতনা সমর্পণ এ উত্তরণ ছিলো অতিমাত্রায় আকস্মিক এবং যন্ত্রণাদায়ক। এই নতুন ধর্মকে তারা খুব দ্রুত এবং জাহিরা স্বেচ্ছায় কবুল করলেও ওরা ওদের অবচেতন মনে ইসলামী ভাবাদর্শের এই বিজয়কে জাতি হিসাবে ইরানের পরাজয় বলে গণ্য করতে থাকে, এবং ওরা পরাজিত হয়েছে আর ওদের প্রাচীন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পটভূমি থেকে চিরকালের জন্য ওদের উপড়ে ফেলা হয়েছে এই উপলব্ধি— সকল অস্পষ্টতা সত্ত্বেও সুগভীর এই উপলব্ধি-পরবর্তী শতকগুলিকে ওদের জাতীয় আত্মবিশ্বাস বিনাশের কারণ হয়ে ওঠে। অন্য বহু জাতির জন্য ইসলাম গ্রহণের আশু ফল হলো সাংস্কৃতিক বিকাশের পক্ষে একটি অতিশয় ইতিমূলক উদ্দীপনা। কিন্তু ইরানীদের বেলায় এর প্রথম—এবং একদিক দিয়ে বলা যায় সবচেয়ে স্থায়ী প্রতিক্রিয়া হলো, গভীর অবমাননাবোধ ও অবদমিত বিক্ষোভ।

এই বিক্ষোভকে অবচেতনের অন্ধকার ভাঁজের মধ্যে চাপা দিয়ে ঢেকে রাখতে হলো; কারণ এরই মধ্যে ইসলাম হয়ে উঠেছে ইরানের নিজের ধর্ম। কিন্তু আরব- বিজয়ের প্রতি ঘৃণাবশে ইরানীরা সহজাতভাবে তারই আশ্রয় নেয়, মনস্তত্ত্ব যাকে বর্ণনা করে 'অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ' বলে ঃ ওরা মনে করতে লাগলো, ওদের আরব-বিজয়ীরা ওদের নিকট যে ধর্ম এনেছে তা একান্তভাবে আরবদেরই নিজস্ব ধর্ম। এ উদ্দেশ্য ওরা খুব সূক্ষ্মভাবে আরবদের

যুক্তিভিত্তিক, মরমী রহস্য-বর্জিত আল্লাহ্-উপলব্ধিকে দিলো এর সম্পূর্ণ বিপরীত এক রূপ ঃ মরমী গোঁড়ামী এবং বিষণ্ন ভাববেগে। যে ধর্ম ছিলো আরবদের নিকট বর্তমান, বাস্তব এবং স্থৈর্য ও স্বাধীনতার উৎস, ইরানীদের মনে তা'ই রূপ নিলো অতিপ্রাকৃত এবং প্রতীকের গুঢ় আর্তিতে। আল্লাহ্ যে সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে এবং তাঁর এই সমস্ত কিছু ছাড়িয়ে যাওয়া বিরাটত্ব যে মানুষের ধারণার অতীত, ইসলামের এ নীতিটিকে রূপান্তরিত করা হলো বিশেষভাবে নির্বাচিত মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ নিজেকে দৈহিকভাবে ব্যক্ত করেন, এই মরমী মতবাদে (ইসলাম-পূর্ব ইরানে এ ধরনের অনেকগুলো মতবাদের অস্তিত্ব ছিলো)। এ মতবাদ অনুসারে নির্বাচিত মানুষদের মাধ্যমে আল্লাহ্ নিজেকে এ উদ্দেশ্যে প্রকাশ করেন যে, এ সব ব্যক্তি তাঁদের বংশধরের নিকট এই ঐশী সত্যের সার দিয়ে যাবেন। এ ধরনের একটা প্রবণতা যেখানে ছিলো সেখানে 'শিয়া' মতবাদের সমর্থন খুবই একটা গ্রহণযোগ্য পন্থা হিসাবে গৃহীত হয়। কারণ, আলী এবং তাঁর বংশধরগণকে শিয়ারা যেভাবে ভক্তি করে, বলা যায় তাঁদের প্রতি প্রায় বেদত্ব আরোপ করে থাকে, তার মধ্যে যে মানুষরূপে আল্লাহ্র দেহ ধারণের এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর বারবার অবতরণের ধারণার বীজ গোপন রয়েছে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই; আর এটি এমনি একটি ধারণা যা ইসলামের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অথচ ইরানী হৃদয়ের নিকট খুবই অন্তরংগ জিনিস।

নবী মুহাম্মদ যে কাউকে তাঁর স্থলবর্তী মনোনীত না ক'রে ইন্তেকাল করেন, এমন কি, তাঁর মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে কোনো একজনকে মনোনীত করে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলে তিনি যে মনোনয়ন দান করতে অস্বীকার করেছিলেন, এ কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। তিনি তাঁর মনোভাব দ্বারা প্রথমে এ কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, নবুয়তের রূহানী দিকটি এমনি একটি জিনিস যা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় না, দ্বিতীয়ত উম্মাহ্র ভাবী নেতৃত্ব হবে জনসাধারণ কর্তৃক অবাধ নির্বাচনের ফল এবং নবীর কোনো নির্দেশের ফল নয়। (তিনি স্থলবর্তী নিয়োগ করলে স্বাভাবিকভাবে তার অর্থ তা'ই মনে হতো)। আর এভাবেই তিনি উম্মাহ্র নেতৃত্ব কখনো সেকুলার ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে কিংবা আল্লাহ্ কর্তৃক 'রসূলের স্থলবর্তী প্রেরণের মতো কিছু' হতে পারে—সুচিন্তিতভাবে এ ধারণাকে বাতিল করে দেন। অথচ 'শিয়া' মতবাদের আসল লক্ষ্য হচ্ছে এই। ইসলামের মূল শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভংগি নিয়ে এই মতবাদ যে-কেবল রসূলের স্থলবর্তিতার উপরেই জোর দিলো তাই নয়, বরং তাঁর স্থলবর্তী হওয়ার অধিকার কেবলমাত্র 'নবী বংশে'রই আছে অর্থাৎ তাঁর চাচাতো ভাই এবং জামাতা আলী এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিরাই কেবল তাঁর স্থলবর্তী হতে পারবেন, এ অধিকারও তারা সংরক্ষিত রাখলো নবী-বংশের জন্য।

ইরানীদের মরমী প্রবণতার সংগে এর সংগতি রয়েছে ষোল আনা। কিন্তু রসূলুল্লাহ্র রূহানী সত্তা আলী এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বেঁচে আছে এই দাবি যারা করলো, ইরানীরা তাদের দলে অত্যুৎসাহের সংগে যোগ দিয়ে কেবল যে একটি মরমী বাসনা পূরণ করলো তা নয়, তাদের এই সিদ্ধান্তের পেছনে আরো একটি অবচেতন মতলবও কাজ করেছে। আলী যদি রসূলুল্লাহ্র আইন-সংগত উত্তরাধিকারী এবং স্থলবর্তীই হয়ে থাকেন, তাহলে অন্য তিনজন খলীফাই ছিলেন নিঃসন্দেহে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলকারী এবং

তাঁদের মধ্যে ছিলেন উমর—সেই উমর যিনি ইরান বিজয় করেছিলেন। সাসানী সাম্রাজ্যকে যে বিজেতা জয় করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয় ঘৃণার এখন ধর্মীয় অর্থে, ব্যাখ্যা করা সম্ভব যে-ধর্ম হয়ে উঠেছে ইরানের ধর্ম। আলী এবং তাঁর পুত্র হাসান ও হোসাইনকে ইসলামের খলীফা হওয়ার ইলাহী-নির্দেশিত অধিকার থেকে উমর 'বঞ্চিত' করেছেন এবং এভাবে বিরোধিতা করেছেন আল্লাহ্‌রই ইচ্ছার—কাজেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি আনুগত্যস্বরূপ সমর্থন করতে হবে আলীর দলকে। এভাবে জাতীয় বিরোধিতা থেকে জন্ম নিলো একটি ধর্মীয় মতবাদ।

ইরানীরা যে এভাবে 'শিয়া' মতবাদকে তাদের মনের সিংহাসনে বরণ করে নিয়েছে এর মধ্যে আমি আরবদের ইরান বিজয়ের বিরুদ্ধে ইরানীদের একটি নিঃশব্দ প্রতিবাদ দেখতে পেলাম। এখন আমি বুঝতে পারলাম কেন ইরানীরা অন্য দুই 'ক্ষমতা অপহরণকারী' আবু বকর এবং উসমানের চেয়ে উমরকে এত বেশি ঘৃণার সাথে লানত দিয়ে থাকে। মতবাদের বিচারে প্রথম খলীফা আবু বকরকেই গণ্য করা উচিত ছিলো প্রধান সীমালংঘনকারী—কিন্তু উমর যে ইরান জয় করেছিলেন...

তা'হলে, ইরানে আলী পরিবারকে বিস্ময়কর গভীরতার সাথে যে ভক্তি করা হয় তার কারণ এই! ইরানের এই কাল্ট আরবের ইসলামের উপর ইরানী প্রতিশোধ গ্রহণের একটি প্রতীক (যে ইসলাম মুহাম্মদসহ যে-কোনো মানুষের প্রতি দেবত্ব আরোপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে অমন আপোসহীনভাবে)। এটা সত্য যে, শিয়া মতবাদের জন্ম ইরানে হয়নি; অন্যান্য মুসলিম দেশেও শিয়া মতাবলম্বী বিভিন্ন দল রয়েছে। কিন্তু সকল মানুষের আবেগ ও কল্পনার উপর এমন পরিপূর্ণ প্রভাব আর কোথাও বিস্তার করতে পারেনি এ মতবাদ।

ইরানীরা যখন আলী, হাসান এবং হোসাইনের মৃত্যুর জন্য মাতম করে তখন তারা কেবল আলী পরিবারের ধ্বংসের জন্য কাঁদে না—তারা নিজেদের জন্য এবং তাদের অতীত গৌরব হারানোর জন্যও কাঁদে...

এই ইরানীরা—ওরা এক বিষাদগ্রস্ত কওম। ওদের এই বিষণ্ণতা ইরানী ল্যাণ্ডস্কেপ তথা ভূদৃশ্যে প্রতিফলিত—প্রতিফলিত পোড়ো যমির অনন্ত বিস্তারে, নির্জন পাহাড়ী রাস্তা এবং রাজপথগুলিতে, মাটির তৈরি বাড়ির দূরে দূরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গ্রামসমূহে, ভেড়ার পালগুলিতে, যাদের সন্ধ্যার দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হয় কুয়ার দিকে, ধূসর তামাটে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো। শহর বন্দরে কোনো রকম চেষ্টা উচ্ছলতা ছাড়াই জীবন বিন্দু বিন্দু ঝরছে মন্থর গতিতে, নিরবচ্ছিন্ন ফোঁটায় ফোঁটায়—মনে হয়, সবকিছুই যেনো একটি স্বপ্নের নেকাব দিয়ে ঢাকা এবং প্রত্যেকের মুখে ফুটে রয়েছে এক অলস প্রতীক্ষার চাহনি। রাস্তায় কখনো শোনা যেতো না সংগীত। যদি সন্ধ্যায় কোনো তাতার সহিস কোনো সরাইখানায় হঠাৎ গলা ছেড়ে গেয়ে উঠতো শ্রোতা যেনো তার অজান্তেই বিস্ময়ে উৎকর্ণ হতো। প্রকাশ্যে কেবল বহু দরবেশই গাইতো গান ঃ এবং ওরা সবসময়ই আলী, হাসান এবং হোসাইন সম্পর্কে সেই একই পুরানো মর্মান্তিক গাঁথা গাইতো সুর করে। এই গানগুলিকে ঘিরে জাল বনুতো মৃত্যু এবং অশ্রু আর শ্রোতাদের মগজে তা প্রবেশ করতো খুব কড়া শরাবের মতো। মনে হতো দুঃখ সম্পর্কে একটা ভীতি—যে- দুঃখ স্বেচ্ছায়, পায় লোভাতুরতার সাথেই

গৃহীত—ঘিরে আছে এই লোকগুলিকে।

ইরানে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় দেখা যেতো নারী এবং পুরুষেরা স্থির হয়ে বসে আছে যমীনের উপর। রাস্তার দু'পাশ বরাবর বিশাল এল্‌ম গাছের ছায়ার নিচ দিয়ে যে খালগুলি চলে গেছে সেগুলির তীরে ওরা বসতো আর তন্ময় হয়ে চেয়ে থাকতো প্রবহমান পানির দিকে। ওরা একে অপরের সাথে কথা বলতো না। ওরা কেবল পানির কুলুকুলু ধ্বনি শুনতো আর ওদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে যেতো পাতার মর্মর ধ্বনি। যখনই আমি ওদের দেখতাম আমার মনে পড়তো দাউদের স্তোস্ত্রের কথাঃ

ব্যবিলনের নদীগুলির তীরে, আমরা বসেছিলাম সেখানে আর রোদন করেছিলাম...

ওরা নহরগুলির কিনারে বসতো বিশাল বোবা অন্ধকার পাখির মতো, যেনো ওরা হারিয়ে গেছে প্রবহমান পানির নীরব ধ্যানে। ওরা কি ভাবতো কোনো দীর্ঘ বহুকাল লালিত ধারণার কথা, যে-ধারণা তাদেরই, কেবলই তাদের ? ওরা কি প্রতীক্ষায় ছিলো?...কিসের ?

এবং দাউদ গেয়েছিলেন, আমরা আমাদের বাণীগুলিকে ঝুলিয়ে রাখলাম উইলো বনের মধ্যে, উইলো শাখায়...।

তিন

—'চলো জায়েদ, আমরা যাই।' এ কথা বলে আমি আলী আগার চিঠিখানা আমার পকেটে রাখি এবং আয-যুগাইবীকে বিদায় জানানোর জন্য উঠে দাঁড়াই।

কিন্তু তিনি মাথা নাড়িয়ে বলেন, 'না ভাই, জায়েদকে এখানে কিছুক্ষণের জন্য আমার সাথে থাকতে দাও। ফেলে আসা এই মাসগুলিতে তোমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে, তুমি যদি তা বলতে খুব বখিলি করে থাকো, তোমার বদলে জায়েদই সে কাহিনী বলুক না। তুমি কি মনে করো যে, তোমার জীবনে যা ঘটছে, তোমার বন্ধুরা সে বিষয়ে উৎসুক নয় ?'

দজ্জাল

এক

আমি মদীনার সবচেয়ে প্রাচীন অঞ্চলের সর্পিল গতিপথে প্রবেশ করি। ছায়াতে শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের দেয়াল, পাথরে তৈরি; গলির উপর ঝুলে আছে ঘুলঘুলি দেয়া জানালা এবং ব্যালকনি...গলিগুলি দেখতে গিরিসংকটের মতোই এবং কোনো কোনো জায়গা এতো চিপা যে, দু'জন মানুষের পক্ষেও একে অন্যের পাশ দিয়ে বিপরীতদিকে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। এক সময় আমি নিজেকে দেখতে পেলাম, প্রায় একশ' বছর আগে একজন তুর্কী পণ্ডিত কর্তৃক স্থাপিত ধূসর পাথরের তৈরি কুতুবখানার সম্মুখভাগের সামনে। এরই প্রাংগণে, গেটের পেটানো ব্রোঞ্জের গ্রিলের পশ্চাতে রয়েছে এমন একটি নীরবতা—যেনো একটি আমন্ত্রণ! আমি পাথর বিছানো প্রাংগণ পার হয়ে প্রাংগণের মাঝখানে যে একাকী গাছটি নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে তা পেছনে ফেলে প্রবেশ করি গম্বুজওয়ালা হল্‌ঘরটিতে যাতে রয়েছে সারি সারি কাঁচ-ঢাকা বুক-কেস—হাজার হাজার হাতে লেখা বই—আর সে-সবের মধ্যে আছে ইসলামী বিশ্বের জানা কিছু-কিছু দুর্লভ পাণ্ডুলিপি। এ ধরনের বই-পুস্তকই গৌরব দান করেছে ইসলামী তমদ্দুনকে, যা হারিয়ে গেছে গত কালকের হওয়ার মতো!

আমি যখন যত্নের সাহায্যে কাজ-করা চামড়ার মলাটে ঢাকা এই পুস্তকগুলির দিকে তাকাই, তখন মুসলিমের অতীত ও মুসলিমের বর্তমানের অসংগতি আমাকে আঘাত করে এক যন্ত্রণাদায়ক ঘুষির মতো...

—'তোমাকে কি যেনো পীড়া দিচ্ছে বেটা? মুখে এই তিক্ততার ছাপ কেন বলো তো?'

আমি এই কণ্ঠস্বরের দিকে ঘুরে দাঁড়াই এবং দেখি একটি ঘুলঘুলি দেয়া জানালার মাঝখানে, হাঁটুর উপর একটি ফলিও ভলিউম নিয়ে কার্পেটের উপর বসে আছেন আমার পুরানো বন্ধু ছোট্ট অবয়বের শায়খ আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে বুলাইহিদ। তাঁর তীক্ষ্ম কৌতুকভরা চোখ দুটি একটি অন্তরংগ ঝিলিকের সংগে আমাকে অভিনন্দন জানালো, যখন আমি তাঁর কপালে চুমু খাই এবং তাঁর পাশেই বসে পড়ি। তিনি নযদের সর্বশ্রেষ্ঠ 'আলীম' এবং ওয়াহাবী-দৃষ্টিভংগির সাথে মতবাদঘটিত এক ধরনের যে-সংকীর্ণতা জড়িত রয়েছে তা সত্ত্বেও মুসলিম দেশগুলিতে আজ পর্যন্ত যে-সব পরম তীক্ষ্মধী মানুষের সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি তিনি তাঁদেরই অন্যতম। আমার প্রতি তাঁর বন্ধুত্ব আরবে আমার জীবনকে সহজ এবং আনন্দময় করে তোলার জন্য অনেকখানি দায়ী। কারণ, ইব্‌নে সউদের রাজত্বে খোদ্ রাজা ছাড়া আর যে-কোনো মানুষের কথার চাইতে তাঁর কথারই মূল্য বেশি। তিনি চট করে তাঁর বইটি বন্ধ করে ফেলেন এবং আমাকে তার কাছে টেনে নেন জিগ্‌গাসু দৃষ্টিতে, আমার দিকে তাকিয়ে।

—'হে শায়খ, আমি ভাবছিলাম, আমরা মুসলমানরা কতো দূরে চলে গেছি এ থেকে'—এবং তাকে রাখা বইগুলির দিকে আমি ইশারা করি—আমাদের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা আর অধঃপতনের দিকে!'

—'বেটা', জবাব দেন বৃদ্ধ, 'আমরা যা বুনেছি তা'ই তুলছি। একদিন আমরা মহান ছিলাম। ইসলামই আমাদেরকে বড়ো করেছিলো। আমরা ছিলাম একটি পয়গামের বাহক। যতোদিন আমরা সেই পয়গামের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলাম ততোদিন আমাদের হৃদয় ছিলো উদ্দীপিত, অনুপ্রাণিত আর আমাদের মন ছিলো আলোকিত, উদ্ভাসিত। কিন্তু যেই আমরা ভুলে গেলাম, কী উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ মনোনীত করেছিলেন আমাদের, তখনই ঘটলো আমাদের পতন। আমরা অনেক দূর চলে গেছি এ থেকে'—এবং বইগুলির দিকে আমি যেভাবে ইশারা করছিলাম 'শায়খ' তারই পুনরাবৃত্তি করেন—'কারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ১৩০০ বছর আগে যা শিখিয়েছিলেন আমরা তা থেকে চলে গেছি অনেক—অনেক দূরে...'

—'আর হ্যাঁ, তোমার কাজ কেমন চলছে?' একটু থেমে তিনি জিগ্‌গাস করেন, কারণ তিনি জানেন, আমি ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দিকের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অধ্যয়নে মগ্ন আছি।

—'আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, শায়খ, কাজ খুব ভালো আগাচ্ছে না। আমি আমার অন্তরে স্বস্তি পাচ্ছি না এবং জানি না এর কারণ কী। আর এজন্যই আবার আমি ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছি মরু প্রান্তরে।'

ইব্‌নে বুলাইহিদ আমার দিকে তাকান স্মিত হাস্যস্ফূরিত তীর্যক চোখে—বুদ্ধি-দীপ্ত মর্মভেদী সেই চোখে—এবং তাঁর মেহেদী-রাঙা দাড়ি আঙুল দিয়ে পাকাতে পাকাতে বলেন ঃ মনের যা পাওনা তা পাবে মন আর দেহের যা পাওনা তা পাবে দেহ...তোমার এখন শাদি করা উচিত...'

অবশ্য আমি জানি যে, নযদে প্রায় সকল রকম পেরেশানিরই সমাধান বিবেচিত হয় 'শাদি।' আমি আমার হাসি চেপে রাখতে পারলাম না।

—'কিন্তু শায়খ, আপনি ভালো করেই জানেন, আমি মাত্র দু'বছর আগে আবার শাদি করেছি এবং এ বছর আমার একটি ছেলেও হয়েছে।'

বৃদ্ধ তাঁর কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন ঃ 'কোনো পুরুষ যদি স্বস্তি পায় তার স্ত্রীতে সে তার সাধ্যমতো বেশি সময় ঘরেই থাকে। তুমি ঘরেও তো সময় কাটাও না...আর তা ছাড়া দোস্‌রা শাদি করে আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।' (বর্তমানে তাঁর নিজেরও তিন স্ত্রী রয়েছেন যদিও তাঁর বয়স সত্তর এবং আমি শুনেছি তাঁর কনিষ্ঠা স্ত্রী, যাকে তিনি শাদি করেছেন মাত্র মাস দুয়েক আগে, তার বড় জোর ষোলো বছর হয়েছে।)

—'তা হতে পারে,' আমি পাল্টা জবাব দিই, 'হতে পারে দোস্‌রা স্ত্রী গ্রহণ করলে তাতে পুরুষ কষ্ট পায় না, কিন্তু প্রথম জরুর ব্যাপারে কী? তার কষ্ট কি বিবেচনার অপেক্ষা রাখে না?'

—'বেটা, কোনো রমণী যদি তার স্বামীর পুরা হৃদয়টাই দখল করে থাকে, সে ফের

শাদি করার কথা চিন্তা করবে না, তার আর শাদির প্রয়োজনও হবে না। কিন্তু স্বামীর হৃদয় যদি সম্পূর্ণভাবে তার স্ত্রীর সংগে না থাকে, সেই স্ত্রীর কি কোনো লাভ হবে তার প্রতি উদাসীন খসমকে কেবল তার নিজের জন্য আটকে রেখে?'

নিশ্চয়ই এর কোনো উত্তর নেই। এটা নিশ্চিত যে, ইসলাম এক বিয়ের পরামর্শ দেয়, কিন্তু বিশেষ অবস্থায় পুরুষকে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি দেয়। যে কেউ জিগ্‌গাস করতে পারে, এই অধিকার নারীকেও কেন দেওয়া হলো না। জবাবটি সহজ। মানুষের বিকাশ ও অগ্রগতির ধারায় মানুষের জীবনে প্রেমের যে আত্মিক বিষয়টি অনুপ্রবেশ করেছে, তা সত্ত্বেও, নারী-পুরুষ উভয়ের বেলায় যৌন কামনার অন্তর্নিহিত 'জীবতাত্ত্বিক' যুক্তি হচ্ছে প্রজনন; এবং যেখানে একজন স্ত্রীলোক একবারে কেবল একজন পুরুষের কাছ থেকেই একটি সন্তান ধারণ করতে পারে এবং নয়টি মাস তাকে গর্ভে ধারণ করতে হয় আরেকবার গর্ভধারণ করতে সক্ষম হওয়ার পূর্বে, সেখানে এভাবেই পুরুষকে তৈরি করা হয়েছে যে, যতোবার একটি নারীকে সে আলিংগন করবে ততবারই সে একটি সন্তানের জন্ম দিতে পারে। কাজেই, যেখানে নারীর মধ্যে বহুপতিক হওয়ার সহজাত প্রবৃত্তি হতো প্রকৃতির জন্য কেবলই অপচয়, সেখানে পুরুষের বহু নারী সম্ভোগের সন্দেহাতীত প্রবণতা প্রকৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেই জীবতত্ত্বের দিক দিয়ে যুক্তিসংগত। অবশ্য, একথা খুব স্পষ্ট যে, জৈবতাত্ত্বিক ব্যাপারটি হচ্ছে ভালোবাসার অনেকগুলি দিকের একটি দিক মাত্র এবং তা'ও কোনোক্রমেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক নয়। তা সত্ত্বেও এটি হচ্ছে একটি মৌলিক উপাদান, আর এ কারণে, বিবাহরূপ সামাজিক বিধানের ক্ষেত্রে ভালোবাসা হচ্ছে চূড়ান্ত নিয়ামক। মানব প্রকৃতিকে ইসলামে যে প্রজ্ঞার সংগে সবসময়ে বিচার করা হয় সেই প্রজ্ঞাবশত ইসলামী আইন বিয়ের সামাজিক-জৈবতাত্ত্বিক ক্রিয়াটিকেই হিফাজত করে—এর বেশি কিছু করে না (এর মধ্যে অবশ্য সন্তানের যত্নও পড়ে)। আর এ কারণেই, পুরুষকে দেয় একাধিক বিয়ে করার অনুমতি এবং একই সংগে রমণীকে একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি দিতে করে অস্বীকার। বিয়ের আত্মিক দিকটি যেহেতু অচিন্তনীয় এবং আইনের ইখতিয়ার-বহির্ভূত, সেজন্য তা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর বিবেচনার উপর। প্রেম যখন পূর্ণ এবং চূড়ান্ত তখন দু'জনের কারো ক্ষেত্রেই আবার বিয়ে করার প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে না। যখনি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে সমুদয় হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে না, অথচ তার স্ত্রীকে হারাতে ইচ্ছুক নয়—অতোটুকু ঔদার্য তখনো তার মধ্যে টিকে আছে, তখন সে আরেকটি বিয়ে করতে পারে, যদিও তার প্রথম স্ত্রী তার স্বামীর এই ভালোবাসায় অন্যকে অংশ দিতে রাজী নয় এবং স্ত্রী যদি এতে রাজী না হয় সে তালাক দিতে পারে এবং স্বাধীনভাবে পারে আবার বিয়ে করতে। যে কোনো অবস্থায়, ইসলামী বিয়ে যেহেতু একটা পবিত্র ব্যাপার নয় বরং একটা সামাজিক চুক্তি, সেজন্য স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই তালাকের আশ্রয় নিতে পারে। এর বিশেষ কারণ আছে। অন্যত্র কম-বেশি যে কলংক জড়িত রয়েছে তালাকের সাথে, মুসলিম সমাজে তার অস্তিত্ব নেই (একমাত্র সম্ভাব্য ব্যতিক্রম হচ্ছে ভারতীয় মুসলমানেরা, যারা হিন্দু সমাজের সাথে শত শত বছরের সম্পর্কের ফলে এ বিষয়ে প্রভাবিত হয়েছে, কারণ হিন্দু সমাজে তালাক একেবারেই নিষিদ্ধ)।

বিয়ে করা এবং বিয়ের সম্বন্ধ ছিন্ন করার ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়কে ইসলামী আইন যে স্বাধীনতা দিয়েছে, তাতেই ব্যাখ্যা মিলবে কেন ইসলামে ব্যভিচারকে জঘন্যতম অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। কারণ এ ধরনের স্বাধীনতা যেখানে রয়েছে সেখানে আবেগাত্মক বা ইন্দ্রিয়জ যোগাযোগ ওজর হিসাবে গৃহীত হতে পারে না। এটা সত্য যে, মুসলমানদের অবনতির কয়েক শতকে সামাজিক রীতিনীতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, আইন-প্রদাতা যেমনটি ইচ্ছা করেছিলেন সেরূপ স্বাধীনভাবে তালাক দেবার অধিকার প্রয়োগ স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রায় কঠিন হয়ে পড়েছে। অবশ্যই এর জন্য দায়ী ইসলাম নয়, দায়ী হচ্ছে প্রথা— ঠিক যেমন, স্ত্রীলোককে এতোকাল ধরে বহু মুসলিম দেশে অবরোধের অন্তরালে বন্দী রাখার জন্য দায়ী হচ্ছে প্রথা, ইসলামী আইন নয়; কারণ কুরআনে কিংবা নবীর সুন্নাহতে এই প্রথার সমর্থনে কিছুই পাওয়া যায় না, যা মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে বাইজান্টিয়ানদের কাছ থেকে।

শায়খ ইব্‌নে বুলাইহিদ আমার আত্মগত চিন্তায় বাধা দেন আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে, যেনো তিনি সব জানেন। 'তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দরকার নেই, বেটা। সিদ্ধান্ত যখন আসার সময় হবে, তখন তা তোমার কাছে অমনি আসবে!'

দুই

কুতুবখানাটি নীরব নিস্তব্ধ; বৃদ্ধ শায়খ এবং আমি—কেবল এই দু'জনই রয়েছি গম্বুজওয়ালা কক্ষটিতে। কাছাকাছি ছোট্ট একটি মসজিদ থেকে আসে মাগরিবের আযান এবং পরমুহূর্তেই একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয় মসজিদে নববীর পাঁচটি মীনার থেকে। নবীর মসজিদটি এই মুহূর্তে আমাদের কাছে অদৃশ্য এবং বিপুল গাম্ভীর্য আর মাধুর্যময় গর্বের সংগে যেনো তা তাকিয়ে আছে সবুজ গম্বুজটির উপর। মীনারগুলির একটি থেকে 'মুয়াজ্জিন' বলছে ঃ 'আল্লাহু আকবর'...গভীর, গাঢ়, নিম্নগ্রামে, ধীরে ধীরে সুর ওঠা-নামা করছে ধ্বনির দীর্ঘ বলয়ের আকারের মতোই। 'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ...আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ'..সে তার বাক্যাংশটি শেষ করার আগেই আমাদের সবচেয়ে নিকটে যে মীনার রয়েছে সে মীনার থেকে কিছুটা উচ্চগ্রামে শুরু করে আরেক 'মুয়াজ্জিন' 'সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ' এবং তৃতীয় মীনারে যখন একই সংগীত উচ্চতরো গ্রামে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে, ততোক্ষণে প্রথম 'মুয়াজ্জিন' প্রথম বাক্যটি শেষ করে দ্বিতীয় শ্লোকটি শুরু করেছে...চতুর্থ এবং পঞ্চম মীনার থেকে ওঠা প্রথম বাক্যটির ধ্বনিগুলির একটা সুদূর স্বর-সংগতির সাথে মিলিত হয়ে ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই,'—যখন প্রথম, দ্বিতীয় এবং পরে তৃতীয় মীনার থেকে কণ্ঠস্বর নেমে আসে মোলায়েম পাখনায় ভর ক'রে...'এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল।' এভাবে প্রত্যেক শ্লোকই দু'বার করে আবৃত্তি করে পাঁচজন মুয়াজ্জিনের প্রত্যেকে আর আযান চলে আগিয়ে—'সালাতে আসো, সালাতে আসো, চিরস্থায়ী সুখের দিকে ছুটে আসো।' প্রত্যেকটি কণ্ঠস্বর যেনো জাগিয়ে দেয় অন্যদের এবং সবকটি স্বরকে নিয়ে এসে মিলিত করে এক জায়গায়, যেনো তার একমাত্র উদ্দেশ্য, স্থান ছেড়ে দিয়ে সরে পড়া এবং অন্য এক বিন্দুতে গিয়ে আবার সুরটিকে কণ্ঠে

ধারণ করা, আর এভাবে একে নিয়ে যাওয়া শেষ শ্লোক পর্যন্ত 'আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।'

. মানুষের কণ্ঠস্বরের এই যে বুলন্দ, গভীর আলিংগন, পরস্পর থেকে দূরে সরে পড়া, এক হয়ে যাওয়া এবং এবং আলাদা হয়ে যাওয়া, মানুষের আর কোনো সুরের সংগে এর মিল নেই। এই নগরী এবং এর স্বরধ্বনির প্রতি উন্মাদ ভালোবাসায় যখন আমার হৃদ্‌পিণ্ড আছাড়-পিছাড় খাচ্ছে আমার কণ্ঠ পর্যন্ত, তখন আমি অনুভব করতে শুরু করি—আমার এই সব সফর আর বাউণ্ডুলেপনার একটি মাত্র অর্থই ছিলো সব- সময়—এই আহ্বানের অর্থ উপলব্ধি করা...

—'আসো', শায়খ ইব্‌নে বুলাইহিদ আমাকে বলেন, 'চলো, আমরা মসজিদে গিয়ে মাগরিবে'র সালাত আদায় করি...'

হারম বা মদীনার পবিত্র মসজিদকে তার বর্তমান রূপ দেওয়া হয়েছে গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে। কিন্তু এর কোনো কোনো অংশ অনেক প্রাচীন—কোনো কোনোটি নির্মিত হয়েছে মিসরের মামলুক বংশের আমলে এবং কোনো কোনোটি তারও আগে। কেন্দ্রের যে হল্ ঘরটিতে নবীর মাযার রয়েছে তা ঠিক সেই জায়গাটির উপরে নির্মিত যেখানে সপ্তম শতকে তৃতীয় খলীফা উসমান তৈরি করেছিলেন ইমারতটি। এর মাথায় রয়েছে একটি বৃহৎ সবুজ গম্বুজ যার ভেতর দিকটা নানা রংয়ের কারুকার্যময় চিত্রে অপরূপ। ছাদটি দাঁড়িয়ে আছে অনেক-ক'টি পুরু সারি সারি মার্বেল স্তম্ভের উপর, যে স্তম্ভগুলি পারস্পরিক সামঞ্জস্য বজায় রেখে অনেকগুলি ভাগে ভাগ করেছে ভেতরটাকে। মর্মরের মেঝের উপর বিছানো রয়েছে দামী গালিচা। তিনটি 'মেহ্‌রাবে'র প্রত্যেকটির দু'পাশে ঝুলছে অতি নিপুণভাবে কাজ করা ব্রোঞ্জের ঝাড়-বাতি। মেহ্‌রাবগুলি অর্ধবৃত্তাকার কুঠরীর মতো, যার মুখ রয়েছে মক্কা অভিমুখে; নীল সাদা চীনামাটির টালি দিয়ে খচিত এই মেহ্‌রাবগুলি—এর একটি সবসময়ই 'ইমামের' জন্য নির্ধারিত, যিনি পরিচালনা করেন জামাতের সালাত। দীর্ঘ তামার শিকলে ঝুলছে শত শত স্বচ্ছ কাঁচের গোলক; রাতের বেলা এদের ভেতরে জ্বালানো হয় ছোট ছোট বাতি, জায়তুনের তেলে এবং এগুলি সালাতরত সারি সারি মানুষের উপর ছড়িয়ে দেয় একটি মৃদু মোলায়েম ঝিকিমিকি আলো। দিনের বেলা একটা সবুজাভ আলো-আঁধারী ভরে রাখে মসজিদটিকে এবং তাতে মনে হয়, এ যেনো একটি হ্রদের তলা, যেনো পানির ভেতর দিয়ে মানুষের মূর্তি সব সাঁতার কেটে চলেছে নগ্ন পায়ে, গালিচা এবং বিছানা মার্বেলের উপর দিয়ে; যেনো পানির দেয়াল দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে সালাতের সময় বৃহৎ হল্ ঘরের প্রান্ত থেকে 'ইমামে'র কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে চাপা গলায়, কোনো প্রতিধ্বনি না তুলে।

রসূলের কবরটি দেখা যায় না, কারণ কবরটি ঝুলন্ত পুরু ব্রকেড দিয়ে ঢাকা এবং ব্রোঞ্জের গ্রীল দিয়ে ঘেরা দেওয়া। মিসরের মামলুক সুলতান কায়েত বে পঞ্চদশ শতকে এ গ্রীলটি তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। আসলে কবরের মতো কোনো কাঠামো এখানে নেই, কারণ নবীজী যে ছোট্ট কক্ষটিতে বাস করতেন এবং যেখানে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন তারই মেটে মেঝের নিচে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিলো। পরবর্তীকালে এই বাড়িটিকে

ঘিরে একটি দরোজা-শূন্য দেয়াল তৈরি করা হয় আর এভাবেই কবরটি সম্পূর্ণ আড়াল করে দেয়া হয় বাইরের দৃষ্টি থেকে। রসূলের আমলে তাঁর ঘরের একেবরে সংগেই লাগানো ছিলো মসজিদটি। কয়েক শতাব্দীর পরিক্রমার পরে, কবরটির উপরে এবং কবরটিকে ছাড়িয়ে মসজিদটিকে সম্প্রসারিত করা হয়।

মসজিদের ভেতরে খোলা চতুষ্কোণ পাথর-বিছানো মেঝের উপর ছড়ানো রয়েছে সারি সারি কম্বল, লম্বা ক'রে। সারি সারি মানুষ তার উপর বসেছে জানু গেঁড়ে, কুরআন পাঠ করছে, একে অপরের সাথে কথা বলছে, ধ্যান করছে অথবা কেবল আলসেমী করে সময় কাটাচ্ছে মাগরিবের সালাতের প্রতীক্ষায়। ইব্‌নে মুলাইহিদ যেনো হারিয়ে গেছেন এক নিঃশব্দ প্রার্থনায়।

সবসময় যেমন হয়ে থাকে, মাগরিবের আগে, দূর থেকে ভেসে আসছে একটি কণ্ঠস্বর, কুরআনের একটি অংশ তিলাওয়াতের ধ্বনি। আজকে আবৃত্তি করা হচ্ছে ৯৬তম 'সূরা'—মুহাম্মদের কাছে যা নাযিল হয়েছিলো সর্বপ্রথম—যা শুরু হয়েছে এ শব্দগুলি দিয়ে 'পাঠ করো তোমার রবের নামে—প্রতিপালকের নামে'...এই শব্দগুলির মাধ্যমেই মক্কার নিকটে হিরা গুহায় মুহাম্মদের নিকট প্রথম এসেছিলো আল্লাহ্‌র আহ্‌বান।

প্রায়ই যেমন করেছেন তেমনি তিনি প্রার্থনা করছিলেন নির্জনে, ধ্যান করছিলেন আলো ও সত্যের সন্ধানে, যখন অকস্মাৎ তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন ফেরেশ্‌তা এবং তাঁকে আদেশ করলেন, 'পাঠ করো', এবং মুহাম্মদ—যিনি তাঁর আশপাশের প্রায় সকল লোকের মতোই কখনো পড়তে শিখেননি—আর সবার উপরে তিনি জানতেন না কী পড়তে হবে—তাঁকে জবাব দিলেন, 'আমি পড়তে পারি না।' এ কথা শোনার পর ফেরেশতা তাঁকে ধরেন এবং তাঁকে এতো জোরে আলিংগন করেন যে, মুহাম্মদের মনে হলো তাঁর গায়ের সমস্ত শক্তি যেনো নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখন ফেরেশতা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর আদেশের পুনরাবৃত্তি করলেন, 'পড়ো, পাঠ করো।' আবার মুহাম্মদ উত্তর করলেন, 'আমি পড়তে জানি না।' তখন ফেরেশ্‌তা আবার তাঁকে সজোরে চেপে ধরলেন নিজের সংগে যার ফলে একসময় তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর মনে হলো তাঁর মৃত্যু আসন্ন। আবার বজ্র গম্ভীর স্বরে আওয়াজ হলো, 'পাঠ করো' এবং তৃতীয়বারের মতো মুহাম্মদ যখন যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললেনঃ 'আমি তো পড়তে জানি না...', তখন ফেরেশ্‌তা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ

পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে—
যিনি সৃষ্টি করেছেন—
সৃষ্টি করেছেন মানুষকে শুক্রবিন্দু থেকে
পাঠ করো, তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত
তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে কলমের সাহায্যে
শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না...,

আর এইভাবে মানুষের চৈতন্য, মেধা এবং জ্ঞানের প্রতি ইশারা করে নাযিল হতে শুরু করলো কুরআন, যে প্রক্রিয়া চলতে থাকে দীর্ঘ তেইশটি বছর ধরে, তেষট্টি বছর বয়সে

মদীনায় রসূলের ওফাত পর্যন্ত।

তাঁর ঐশী প্রত্যাদেশের এই প্রথম অভিজ্ঞতার কাহিনী আমাদের একদিক দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয় বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব খণ্ডে ইয়াকুবের সাথে ফেরেশতার ধস্তাধস্তির কথা। কিন্তু ইয়াকুব যেখানে বাধা দিয়েছিলেন, সেখানে মুহাম্মদ ভীতি-মিশ্রিত শ্রদ্ধা ও যন্ত্রণায় নিজেকে সমর্পণ করেন ফেরেশতার আলিংগনে, যার ফলে একসময়ে তাঁর সমস্ত শক্তিই চলে গেলো এবং তাঁর মধ্যে আর কিছুই রইলো না একটি কণ্ঠস্বর শোনার সামর্থ্য ছাড়া—সে স্বর সম্পর্কে এ প্রশ্ন তোলা আর বলা আর সম্ভব ছিলো না ঃ স্বরটি কি ভেতর থেকে এলো, না এসেছে বাইরে থেকে! তখন পর্যন্ত তিনি জানেন না যে, এর-পর থেকে তাঁকে একই সময়ে হতে হবে পূর্ণ এবং শূন্য এমন একজন মানুষ যার মধ্যে পুরাপুরি রয়েছে মানবসুলভ কামনা-বাসনা আর নিজের জীবন সম্পর্কে চেতনা, আর একই সংগে যিনি একটা পয়গাম গ্রহণ করার জন্য একটি নিষ্ক্রিয় যন্ত্রস্বরূপ। তাঁর হৃদয়ের কাছে মেলে ধরা হচ্ছিল চিরন্তন সত্যের অদৃশ্য গ্রন্থণা—যে সত্যই কেবল অনুভবযোগ্য সকল বস্তু ও ঘটনাকে দেয় তাৎপর্য—এই প্রত্যাশায় যে, তিনি সে-সবের মর্ম বুঝবেন—এবং তাঁকে বলা হলো সে কিতাব থেকে 'পাঠ' করে দুনিয়াকে শোনাতে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে কী তারা জানে না এবং কার্যত কেবলমাত্র নিজের শক্তিতে তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয় কী।

দিব্যদৃষ্টির বিস্ময়কর তাৎপর্য মুহাম্মদকে অভিভূত করে। জ্বলন্ত ঝোপের সামনে মূসার মতো তিনিও নিজেকে নবুয়তের সুউচ্চ মর্যাদার অনুপযুক্ত মনে করলেন এবং আল্লাহ্ সম্ভবত তাঁকে মনোনীত করেছেন একথা ভেবে কাঁপতে শুরু করলেন। আমরা শুনেছি, এরপর তিনি নিজের শহরে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রী খাদিজাকে বললেন ঃ 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢাকো'। কারণ তিনি ঝড়ের মুখে গাছের ডালের মতো কাঁপছিলেন। খাদিজা তাঁকে একটি কম্বল দিয়ে ঢেকে দেন এবং ধীরে ধীরে একসময় তাঁর কাঁপুনি থেমে যায়। এরপর তিনি খাদিজার নিকট বর্ণনা করলেন তাঁর কী হয়েছে এবং বললেন ঃ 'সত্যি আমার সম্পর্কে আমার ভয় হচ্ছে।'

কিন্তু কেবলমাত্র প্রেমই যে-স্বচ্ছ দৃষ্টি দান করতে পারে খাদিজা সেই দৃষ্টি দিয়ে তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন, মুহাম্মদের সামনে যে দায়িত্ব রয়েছে তাঁর বিরাটত্বে তিনি ভীত এবং তিনি উত্তর করলেন ঃ 'না আল্লাহ্‌র কসম! তিনি কখনো আপনার উপর এমন ভার চাপাবেন না যা আপনি বহন করতে অক্ষম এবং কখনো তিনি আপনাকে অপমানিত করবেন না; কারণ সবাই জানে, আপনি মানুষ হিসাবে উত্তম, আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন, দুর্বলকে সাহায্য করেন, অসহায়ের উপকার করেন এবং মেহমানদের প্রতি আপনি মহানুভব, উদার, আর যারা সত্যি সত্যি বিপন্ন, তাদেরকে আপনি সাহায্য করে থাকেন।' তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য খাদিজা তাঁকে নিয়ে গেলেন তাঁর এক সুশিক্ষিত চাচাতো ভাই ওয়ারাকার কাছে। ওয়ারাকা বহু বছর ধরে খৃষ্টধর্ম পালন করেছেন; আর জনশ্রুতি এই যে, তিনি বাইবেল পাঠ করতে পারতেন হিব্রু ভাষায়। সে সময়ে ওয়ারাকা বৃদ্ধ হয়েছেন এবং তিনি অন্ধ। খাদিজা তাঁকে বললেন, 'হে আমার পিতৃব্য পুত্র, আপনার এই স্বজনের প্রতি মনোযোগী হোন।' এবং মুহাম্মদ যখন তাঁর অভিজ্ঞতার

কথা আবার বললেন, তখন ওয়ারাকা ভয়-মেশানো শ্রদ্ধার সংগে হাত তুললেন উপরে আর বলরেন, 'ইনিই তো ওহীর সেই ফেরেশতা, যাঁকে আল্লাহ্ পাঠিয়েছিলেন পূর্বেকার নবীদের নিকট। আহা, আমি যদি বয়সে তরুণ হতাম! আমি যদি তখন বেঁচে থাকতাম এবং আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম যখন আপনার জাতি আপনাকে তাড়িয়ে দেবে আপনার দেশ থেকে!' একথা শুনে বিস্ময়প্লুত মুহাম্মদ জিগ্‌গাস করেনঃ 'কেন, কেন ওরা আমাকে তাড়িয়ে দেবে দেশ থেকে?' এবং জ্ঞানী ওয়ারাকা জবাবে বললেন, হ্যাঁ, ওরা আপনাকে তাড়িয়ে দেবে। আজ পর্যন্ত আপনার মতো এমন কোনো মানুষ তার জাতির কাছে আসে নি যে আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা-ই নিয়ে এসেছিলো, অথচ উৎপীড়িত হয়নি!'

হ্যাঁ, দীর্ঘ তের বছর ধরে ওরা তাঁর উপর চালায় জুলুম, যার ফলে একদিন তিনি বাধ্য হয়ে মক্কা ছেড়ে চলে গেলেন এবং পৌছুলেন গিয়ে মদীনায়। কারণ মক্কার লোকেরা চিরকালই ছিলো কঠিন-হৃদয়।...

কিন্তু মক্কার বেশির ভাগ লোক মুহাম্মদের প্রথম দাওয়াতের পর হৃদয়ের যে কাঠিন্য দেখিয়েছিলো তা বোঝা কি সত্যই ততো কঠিন? ওদের মধ্যে কোনো রূহানী তৃষ্ণা ছিলো না; ওরা জানতো কেবল বাস্তব ব্যবহারিক উদ্যোগ। কারণ, ওরা বিশ্বাস করতো জীবনের পরিধি সম্প্রসারিত করা যেতে পারে কেবলমাত্র সেই উপায়গুলিকে প্রশস্ততরো করে যার সাহায্যে বাহ্য আরাম-আয়াস বাড়ানো সম্ভব। এই সব লোকের পক্ষে একটা নৈতিক দাবির কাছে আপোসহীনভাবে নিজেদের সমর্পণ করার চিন্তা সত্যি হয়তো অসহনীয় মনে হয়েছিলো—কারণ, ইসলাম শব্দটির মানেই তো শাব্দিক অর্থে 'আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ'। তা'ছাড়া মক্কার লোকদের কাছে তাদের প্রতিষ্ঠিত নিয়মশৃংখলা এবং গোত্রগত রীতি-প্রথা ছিলো অতি মাত্রায় প্রিয়; মুহাম্মদের শিক্ষায় এসবই বিপন্ন হয়ে পড়লো। যখন তিনি আল্লাহ্‌র একত্বের কথা প্রচার করতে শুরু করলেন এবং প্রতিমা পূজাকে সবচেয়ে বড় পাপ বলে প্রকাশ্যে নিন্দা করতে আরম্ভ করলেন তখন ওরা তার মধ্যে ওদের চিরাচরিত বিশ্বাসের উপরই কেবল আক্রমণ দেখলো না, বরং ওরা এও দেখতে পেলো যে, এতে করে ওদের জীবনের সামাজিক প্যাটার্নটিকেই ধ্বংস করে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশেষ করে, যে-সব বিষয়কে ওরা ধর্মের এখতিয়ারের বাইরে নেহাতই 'জাগতিক' ব্যাপার বলে মনে করতো— যেমন অর্থনীতি, সামাজিক সাম্য ও সুবিচরের প্রশ্ন এবং সাধারণভাবে জনসাধারণের আচরণ প্রভৃতি বিষয়ে ইসলামের হস্তক্ষেপ ওদের ভাল লাগলো না, কারণ ওদের ব্যবসাগত অভ্যাস, ওদের অবাধ যৌনাচার ও গোত্রের মংগল সম্পর্কে ওদের দৃষ্টিভংগির সংগে এ হস্তক্ষেপ খুব খাপ খাচ্ছিলো না। ওদের কাছে ধর্ম ছিলো একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার—একটা মনোগত ভংগির বিষয়, আচরণের বিষয় নয়।

আর এ ছিলো তারই সম্পূর্ণ বিপরীত যার কথা আরবের নবী যখন ধর্মের কথা বলতেন তখন তাঁর মনে ছিলো। তাঁর বিচারে সামাজিক আচার-আচরণ এবং অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মের গণ্ডির মধ্যে পড়ে নিশ্চয়ই এবং তিনি নিশ্চয়ই বিস্মিত হতেন যদি কেউ তাঁকে বলতো—ধর্ম হচ্ছে একেবারেই ব্যক্তিগত বিবেকের বিষয় এবং সামাজিক আচরণের সংগে এর কোনো সম্পর্ক নেই। অন্য সবকিছুর চাইতে বেশি করে তাঁর পয়গামের এই

দিকটাই তাঁর পয়গামকে মক্কার কাফিরদের নিকট অতোটা অরুচিকর করে তুলেছিলো। তিনি যদি সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করতেন নবীকে নিয়ে তাদের অসন্তোষ হয়তো আরো কম তীব্র হতো। এতে সন্দেহ নেই যে, ইসলাম তাদের বিরক্তি উৎপাদন করতো, কারণ ইসলামের ধর্মতত্ত্ব সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছিলো তাদের নিজেদের ধর্মীয় দৃষ্টিভংগীর সংগে। কিন্তু খুব সম্ভব প্রথমদিকে কিছুটা আপত্তির পরও তারা এর সংগে মানিয়ে নিতো—কিছুকাল আগে যেমন তারা মানিয়ে নিয়েছিলো খৃষ্ট- ধর্মের খণ্ড বিচ্ছিন্ন প্রচারের সংগে—যদি রসূলুল্লাহ কেবল খৃস্টান পাদ্রীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন এবং নিজের প্রচারকে সীমিত রাখতেন কয়েকটি বিষয়ে ঃ আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য মানুষকে তাগিদ দেওয়া, নাজাতের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা এবং নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয়ে সুন্দর আচরণ করা। কিন্তু তিনি খৃষ্টান দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেননি এবং নিজেকে বিশ্বাস, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ও ব্যক্তিগত নৈতিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। কী করেই বা তাঁর পক্ষে তা সম্ভব ছিলো? তাঁর আল্লাহ্ কি তাঁকে আদেশ করেননি এই প্রার্থনা করতে ঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদেরকে দাও এ জগতের কল্যাণ এবং ভাবী জগতের কল্যাণ।'

কুরআনের এই বাক্যটির কাঠামোর ভেতরে 'এই জগতের কল্যাণ'কে স্থান দেওয়া হয়েছে 'ভাবী জগতের কল্যাণে'র আগে—প্রথমত এ কারণে যে, বর্তমানের স্থান ভবিষ্যতের আগে, বর্তমান ভবিষ্যতের অগ্রগামী এবং দ্বিতীয়ত এ কারণেও যে, মানুষকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যার ফলে আত্মার ডাকে সাড়া দিতে হলে এবং পরবর্তী জীবনের কল্যাণ চাইতে হলে পূর্বে তাকে অবশ্যি তার দৈহিক এবং পার্থিব প্রয়োজনগুলি মেটানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে। মুহাম্মদের পয়গামে এমন কোনো আধ্যাত্মিকতার ধারণা নেই যা দৈহিক জীবনের সাথে সম্পর্কহীন বা তার বিরোধী। এ পয়গাম সম্পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে আছে এই ধারণার উপর যে, দেহ এবং আত্মা হচ্ছে একই সত্যের ভিন্ন দু'টি দিক; কী সেই বাস্তব সত্যঃ মনুষ্য-জীবন। তাই, স্বভাবতই তিনি ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র একটা নৈতিক মনোভংগি লালন করেই তুষ্ট হতে পারেন নি, বরং তিনি চেয়েছিলেন এই মনোভংগিটিকে এমন একটি নির্দিষ্ট সামাজিক স্কীমে রূপান্তরিত করতে যা, সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য সম্ভাব্য বৃহত্তম পরিমাণ দৈহিক এবং বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করবে আর এভাবেই আত্মিক বিকাশেরও বৃহত্তম সুযোগের নিশ্চয়তা দেবে।

তিনি তাঁর প্রচার শুরু করলেন মানুষকে এই কথা বলেঃ 'আমল বা কর্ম হচ্ছে ঈমানের অংগ'ঃ কারণ আল্লাহ্ কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ধার ধারেন না; তিনি নারী- পুরুষ প্রত্যেকের কর্মও দেখেন, বিশেষ করে সেই সব কর্ম যার প্রভাব পড়ে ব্যক্তির জীবনের গণ্ডির বাইরে অন্য মানুষের উপর। তিনি দুর্বলের উপর প্রবলের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রচার করেন অগ্নি-গর্ভ শব্দালংকারের সাহায্যে, যা আল্লাহ্ তাঁকে দিয়েছিলেন। তিনি অশ্রুতপূর্ব এই যুক্তি-বক্তব্য পেশ করলেন যে, আল্লাহ্র কাছে নারী এবং পুরুষ হচ্ছে সমান এবং সকল ধর্মীয় কর্তব্য ও আশা-আকাংখা দু'য়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সমানভাবে; মক্কার সকল

---

১. একচেটিয়া ব্যবসা।

২. ইচ্ছামতো চড়া দামে আবার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য সমুদয় ক্রয় করে ফেলা।

সরলমনা পৌত্তলিকের আতংকের সীমা থাকলো না যখন তিনি একথা পর্যন্ত ঘোষণা করে বসলেন যে, নারী তার নিজস্ব অধিকার বলেই একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, পুরুষের সংগে মা, বোন, স্ত্রী অথবা কন্যা হিসাবে তার সম্পর্কের কারণেই কেবল সে আলাদা ব্যক্তি নয়; আর এ কারণে, নারীর অধিকার আছে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হওয়ার, নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করার এবং বিয়েতে স্বাধীনভাবে তার নিজেকে অন্যের হাতে তুলে দেবার! তিনি সকল রকমের জুয়া খেলা ও সকল প্রকার শরাব দূষণীয় বলে ঘোষণা করলেন, কারণ, আল-কুরআনের ভাষায়, 'এ সবের মধ্যে মন্দ অনেক বেশি এবং সামান্য উপকারিতা আছে। কিন্তু উপকারিতার চাইতে ক্ষতিকর দিকটাই বেশি।' সর্বোপরি তিনি দাঁড়ালেন, মানুষ মানুষের উপর পুরুষানুক্রমিক যে জুলুম করে আসছে তার বিরুদ্ধে, দাঁড়ালেন সুদভিত্তিক কর্জের লাভের বিরুদ্ধে, সুদের হার যা-ই-হোক, দাঁড়ালেন ব্যক্তির মনোপলি[১] এবং 'কর্ণারে'র[২] বিরুদ্ধে, অন্য মানুষের সম্ভাব্য প্রয়োজন নিয়ে জুয়া খেলার বিরুদ্ধে—যাকে আমরা আজকাল বলে থাকি 'স্পেকুলেশন'-দাঁড়ালেন গোত্রগত গ্রুপ সেন্টিমেন্টের দৃষ্টিতে 'ভালো' অথবা মন্দ নিরূপণের বিরুদ্ধে, আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'জাতীয়তাবাদ'। বস্তুত গোত্রগত মনোভাব এবং বিচার-বিবেচনার কোনো নৈতিক বৈধতা আছে বলে তিনি স্বীকার করলেন না। তাঁর দৃষ্টিতে, সম্প্রদায়ভিত্তিক দলের জন্য একমাত্র বৈধ, অর্থাৎ নৈতিকতার বিচারে গ্রাহ্য, প্রেরণা হচ্ছে মানুষের জীবন সম্পর্কে একটি সাধারণ দৃষ্টিভংগির এবং নৈতিক মূল্যবোধের একটা সাধারণ মানদণ্ডের স্বাধীন সচেতন স্বীকৃতি—একই বংশ থেকে উৎপত্তির আকস্মিক ব্যাপারটাই নয়।

কার্যত, যেসব সামাজিক ধ্যান-ধারণা তখন পর্যন্ত অলংঘনীয় বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে তিনি তার প্রত্যেকটির ব্যাপক সংশোধনের জন্য জোর দিলেন এবং এ ভাবে,—বর্তমানকালের লোক যেমন বলে থাকে—তিনি ধর্মকে নিয়ে এলেন 'রাজনীতিতে'। বলাবাহুল্য, সে সময়ের জন্য এ ছিলো রীতিমতো বৈপ্লবিক এক প্রবর্তন।

সকল কালের প্রায় সকল জাতির মতোই মক্কার পৌত্তলিক শাসকদের এই বিশ্বাস ছিলো যে, তারা যেসব সামাজিক রীতিনীতি, চিন্তা-ভাবনা ও প্রথা-পদ্ধতির অভ্যাসের মধ্যে লালিত হয়ে এসেছে সেগুলি হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম এবং তার চেয়ে ভালো আর কিছু ধারণাই করা যায় না। তাই, রাজনীতিতে ধর্ম আমদানী অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তনের জন্য আল্লাহ্‌র উপলব্ধিকে আরম্ভ বিন্দু করে তোলার জন্য নবীর এ প্রয়াসে স্বভাবতই ওরা বিক্ষুব্ধ হয় এবং একে নীতি-বিগর্হিত, রাজদ্রোহমূলক এবং 'উচিত-অনুচিতের সকল ধারণার খেলাফ' বলে নিন্দা করে। এবং যখন ওদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো মুহাম্মদ কেবল একজন স্বপ্নচারী নন, বরং তিনি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারেন কর্মের উদ্দীপনা তখন প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থার রক্ষকেরা গ্রহণ করে এক জবরদস্ত পাল্টা ব্যবস্থা এবং তাঁকে এবং তাঁর সহচরগণকে নিপীড়ন শুরু করে দেয়...।

আসলে, একভাবে না একভাবে সকল নবীই তাঁদের নিজ-নিজ কালের প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। কাজেই, এ কি খুবই আশ্চর্যজনক যে, তাঁদের প্রায় সকলেই

তাঁদের জাতি-গোষ্ঠীর দ্বারা উৎপীড়িত এবং উপহাসিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে যিনি সকলের পরে এসেছেন সেই মুহাম্মদ আজো উপহাসিত হচ্ছেন পাশ্চাত্য জগতে ?

তিন

'মাগরিবে'র সালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে শায়খ ইব্‌নে বুলাইহিদ নয্‌দি বেদুঈন এবং শহরবাসীদের এক উৎসুক চক্রের কেন্দ্র হয়ে উঠেন, কারণ, এরা তাঁর পাণ্ডিত্য এবং জাগতিক প্রজ্ঞা থেকে ফায়দা নিতে ইচ্ছুক। তিনি নিজেও ওদের অভিজ্ঞতা এবং দূর-দেশে ওদের সফর সম্পর্কে ওরা তাঁকে কী বলতে পারে তা শুনতে আগ্রহী। নযদিদের মধ্যে দীর্ঘ সফর মোটেই বিরল নয়; ওরা নিজেদের বলে 'আহলে আশ্‌শিদাদ'—'উটের জীনের উপর সওয়ার লোক'—এবং ওদের অনেকের নিকট বাড়ির শয্যার চেয়ে উটের জীন অনেক বেশি পরিচিত। হার্বের যে তরুণ বেদুঈন ইরাকে তার সাম্প্রতিক সফর কালের অভিজ্ঞতার কথা এই মাত্র 'শায়খে'র নিকট বর্ণনা করলো তার নিকট নিশ্চয়ই তা বেশি পরিচিত। এই সফরকালেই সে তার জীবনে প্রথম 'ফিরিংগী' অর্থাৎ ইউরোপীয়কে দেখতে পায় (ইউরোপীয়দের এই নামে তখনি আখ্যায়িত করে আরবরা যখন ওরা ক্রুসেডের যুদ্ধের সময় ফ্রাংকদের সম্পর্কে আসে)।

—'আমাকে বলুন শায়খ, ফিরিংগীরা সবসময় মাথায় কেন হ্যাট পরে যা ওদের চোখ ঢেকে রাখে? ওরা আকাশ কী করে দেখতে পায়?'

—'ওরা এ জিনিসটিকে দেখতে চায় না',—শায়খ জবাব দিলেন, আমার দিকে চেয়ে চোখের পলক নেড়ে—'হয়তো ওরা এই ভয় করে যে, আকাশের দৃশ্য ওদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারে আল্লাহ্‌র কথা; ওরা চায় না যে, হপ্তার দিনগুলিতে কেউ ওদের আল্লাহ্‌র কথা মনে করিয়ে দেয়...'

আমরা সবাই হেসে উঠি। কিন্তু তরুণ বেদুঈনটি তার জ্ঞানের সন্ধানে রীতিমতো জেদী।—'তাহলে আল্লাহ্ কেন ওদের প্রতি এতো দয়ালু এবং ওদের দিচ্ছেন ঐশ্বর্য, যা তিনি মুমিনদের দিচ্ছেন না ?'

—'ওহো, এতো খুবই সোজা কথা বেটা, ওরা সোনা-রূপার পূজা করে। তাই ওদের দেবতা ওদের পকেটে...কিন্তু আমার এই যে দোস্ত', তিনি তাঁর হাত রাখেন আমার হাঁটুর উপর, 'ইনি ফিরিংগীদের সম্পর্কে আমার থেকে অনেক বেশি জানেন, কারণ তিনি ওদের মধ্য থেকে এসেছেন,—আল্লাহ্-মহিমান্বিত হোক তাঁর নাম—তিনিই তাঁকে অন্ধকার থেকে নিয়ে এসেছেন ইসলামের আলোকে।'

—'ব্যাপার কি তাই, ভাইয়া?' জিগ্‌গাস করে উৎসুক বেদুঈন, 'এ কি সত্য যে, আপনি নিজেই একজন 'ফিরিংগী' ছিলেন?'—যখন আমি মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিই, সে ফিস ফিস করে বলে, 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি যাকে ইচ্ছা পরিচালিত করেন সুপথে—আমাকে বলুন ভাইয়া, 'ফিরিংগীরা' যে আল্লাহ্ সম্পর্কে এত উদাসীন তার কারণ কী ?'

—'এ এক লম্বা কাহিনী', আমি জবাব দিই, 'কয়েক কথায় এর ব্যাখ্যা করা যাবে না। আমি এই মুহূর্তে তোমাকে যা বলতে পারি তা এই যে, 'ফিরিংগীদের' দুনিয়া হয়ে

উঠেছে 'দজ্জালে'র দুনিয়া—চোখ ঝলসানো প্রবঞ্চকের দুনিয়া। তুমি কি আমাদের নবীর এই ভবিষ্যতবাণীর কথা কখনো শোনোনি যে, আখেরী জামানায় দুনিয়ার বেশি ভাগ লোকই এই বিশ্বাসে 'দজ্জালে'র অনুসারী হয়ে উঠবে যে, সে-ই আল্লাহ্!'

এবং ও যখন জিগ্গাসু চোখে আমার দিকে তাকালো, আমি তখন শায়খ ইব্নে বুলাইহিদের সম্মতি নিয়ে বর্ণনা করি বাইবেলের সর্বশেষ গ্রন্থে উল্লিখিত 'দজ্জালে'র আবির্ভাব সম্পর্কিত ভবিষ্যতবাণী—যার একটি চোখ হবে অন্ধ কিন্তু তার থাকবে আল্লাহ্র দেয়া রহস্যময় ক্ষমতা। পৃথিবীর দূরতম অঞ্চলে যা বলা হচ্ছে তা-ও সে শুনতে পাবে তার কান দিয়ে এবং অসীম দূরত্বে যা কিছু ঘটছে তার এক চোখ দিয়ে দেখতে পাবে; সে উড়ে কয়েকদিনের মধ্যে ঘুরে আসবে পৃথিবী; মাটির নিচে থেকে হঠাৎ করে নিয়ে আসবে সোনা-রূপার ভাণ্ডার; তার হুকুমে বর্ষণ হবে, তরুলতা উৎপন্ন হবে, সে হত্যা করবে এবং নতুন জীবন দান করবে। যার ফলে, ঈমান যাদের দুর্বল তারা তাকে বিশ্বাস করবে খোদ্ আল্লাহ্ বলে এবং ভক্তিতে তার সামনে সিজদায় যাবে—কিন্তু যাদের ঈমান মজবুত তারা আগুনের হরফে তার কপালে যা লেখা আছে তা পড়তে পাবেঃ 'আল্লাহ্কে অস্বীকারকারী' এই কথা—এবং এভাবে তারা জানতে পারবে যে, মানুষের বিশ্বাস পরীক্ষা করার জন্য দজ্জাল একটা ছলনা ছাড়া কিছু নয়...'

এবং যখন আমার বেদুঈন বন্ধুটি দু'চোখ বিস্ফারিত করে আমার দিকে তাকায় এবং গুনগুন করে বলে, 'আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় মাগি', আমি তখন ইব্নে বুলাইহিদের দিকে ঘুরে বলিঃ

—'হে শায়খ, এই রূপক কাহিনীটি কি আধুনিক কারিগরী সভ্যতার একটি যথোচিত বর্ণনা নয়? এ সভ্যতা হচ্ছে 'এক-চক্ষু'ঃ অর্থাৎ এ কেবল জীবনের একটি দিক, তার বৈষয়িক উন্নতির দিকে তাকায় এবং জীবনের রূহানী দিক সম্পর্কে এ বে-খবর। এর কারিগরী তেলেসমাতির সাহায্যে মানুষকে দিয়েছে তার স্বাভাবিক সামর্থ্যের বাইরে অনেক দূরের বস্তু দেখার ও দূরের শব্দ শোনার ক্ষমতা, দিয়েছে ধারণাতীত গতিতে অসীম দূরত্ব অতিক্রম করার সামর্থ্য। এই সভ্যতার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দ্বারা 'বর্ষানো হয় বৃষ্টি এবং জন্মানো হয় তরুলতা' এবং মাটির নিচে থেকে উদ্ঘাটিত করা হয় অপ্রত্যাশিত ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার। এই বিজ্ঞানের ওষুধ জীবন দেয় তাকে যার মৃত্যু মনে হয় অবশ্যম্ভাবী, অন্যদিকে এর যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং বৈজ্ঞানিক ধ্বংসলীলা ধ্বংস করে জীবনকে আর এর বৈষয়িক অগ্রগতি এতোই প্রচণ্ড এবং এতোই চোখ ঝলসানো যে, দুর্বল ঈমানের লোকেরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, নিজের অধিকারেই এ হচ্ছে একজন 'খোদা', কিন্তু যারা তাদের স্রষ্টা সম্পর্কে সচেতন রয়েছে তারা স্পষ্টই বুঝতে পারে যে, 'দজ্জালে'র পূজা করা মানে আল্লাহ্কে অস্বীকার করা....।'

—'তুমি ঠিক বলেছো মুহাম্মদ, তুমি ঠিক বলেছো', উত্তেজিতভাবে আমার হাঁটুর উপর থাবা মারতে মারতে চীৎকার করে উঠেন বুলাইহিদ,—'দজ্জাল' সম্পর্কিত ভবিষ্যত বাণীটির প্রতি এভাবে তাকানোর কথা কখনো আমার মনে হয়নি, কিন্তু তুমি ঠিক বলেছো! মানুষের অগ্রগতি এবং বিজ্ঞানের উন্নতি যে আমাদের আল্লাহ্রই একটা রহমত, এটা উপলব্ধি না করে অজ্ঞাতবশত মানুষ ক্রমেই বেশি-বেশি সংখ্যায় ভাবতে শুরু করেছে যে,

এ খোদাই একটা লক্ষ্য এবং পূজা পাওয়ার যোগ্য।'

হ্যাঁ, আমি নিজে নিজে ভাবি—পশ্চিমের লোক সত্যই নিজেদের সঁপে দিয়েছে 'দজ্জালে'র পূজায়। অনেককাল আগেই পশ্চিমের মানুষ হারিয়েছে তার সকল নিষ্কলুষতা এবং প্রকৃতির সংগে তার সকল অভ্যন্তরীণ সংহতি। তার কাছে জীবন হয়ে উঠেছে একটা হয়রানী। সে সন্দেহবাদী এবং সে কারণে সে তার ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নিজের অন্তরে নিঃসংগ। এই নিঃসংগতার মধ্যে যাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে না হয় সেজন্য বাহ্য উপায়ে জীবনের উপর প্রভুত্ব করার জন্য অবশ্যি চেষ্টা করতে হবে তাকে—'বেঁচে আছি' কেবলমাত্র এই অনুভূতি তাকে আর দিতে পারছে না অন্তরের নিরাপত্তা; যন্ত্রণার সংগে মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে তাকে অবশ্যই হামেশা কুস্তি লড়তে হবে জীবনের সাথে, যেহেতু সে সকল প্রকার অতীন্দ্রিয় জিগ্‌গাসা হারিয়ে বসেছে এবং স্থির করেছে যে, তাকে বাদ দিয়েই সে চলবে, তাই তাকে ক্রমাগত উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করতে হবে তার নিজের জন্য যান্ত্রিক মিত্র। আর এভাবেই শুরু হয়েছে কারিগরি ক্ষেত্রে তার উন্মত্ত বেপরোয়া প্রয়াস। সে প্রত্যেকদিন নতুন নতুন মেশিন আবিষ্কার করছে এবং তার প্রত্যেকটিকে দিচ্ছে তার আত্মার কিছু না কিছু যেনো সেগুলিই তার অস্তিত্বের জন্যে লড়াই করে। মেশিনগুলি তা অবশ্যই করে কিন্তু একই সংগে সেগুলিই তার জন্য দৃষ্টি করে নিত্য-নতুন অভাব, নতুন নতুন বিপদ, নতুন নতুন ভয় এবং নতুনতরো আরো কৃত্রিম মিত্রের জন্য এক অতৃপ্ত তৃষ্ণা। তার আত্মা নিজেকে হারিয়ে ফেলে উৎপাদনশীল মেশিনের নিয়ত প্রবলতরো, নিয়ত উদ্ভটতরো, নিত্য প্রচণ্ডতরো চাকার ঘূর্ণনে; এবং মেশিনটিও হারিয়ে ফেলে তার নিজের সত্যিকার উদ্দেশ্য—মানব জীবনকে রক্ষা এবং ঐশ্বর্য্যশালী করাই যার মানে—এবং নিজেই হয়ে ওঠে একটি দেবতা, ইস্পাতের সর্বগ্রাসী রাক্ষস। এই অতৃপ্ত দেবতার পুরুত প্রচারকেরা এ বিষয়ে সচেতন বলে মনে হয় না যে, আধুনিক কালের কারিগরি উন্নতির দ্রুততা কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিশ্চিত বিকাশেরই ফল নয়, আত্মিক হতাশারও ফল, এবং পশ্চিমের মানুষ যে-চমকপ্রদ বৈষয়িক উন্নতির আলোকে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করবে বলে আপন ইচ্ছার কথা ঘোষণা করে, সেগুলি কিন্তু তাদের অন্তরতম তাৎপর্যের দিক দিয়ে আত্মরক্ষামূলক ধরনের ঃ ওদের উজ্জ্বল মুখাবয়বের পেছনে ওঁত পেতে আছে অজানার আতংক।

পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষ ও সমাজের প্রয়োজন ও তার আত্মার চাহিদার মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। এ সভ্যতা তার কিছুকাল আগের ধর্মীয় নীতিশাস্ত্র বর্জন করেছে, কিন্তু নিজের মধ্য থেকে অন্য কোনো নৈতিক পদ্ধতি সৃষ্টি করতে পারেনি যা, যতো তত্ত্বমূলকই হোক, যুক্তিগ্রাহ্য হবে। শিক্ষায় এর অতো অগ্রগতি সত্ত্বেও লোক-মাতানো চতুর বক্তারা যেসব শ্লোগান উদ্ভাবন করা প্রয়োজন মনে করে, উদ্ভট হলেও সে-সবের শিকার হওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে যে নির্বোধ প্রস্তুতি রয়েছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা তা জয় করতে পারেনি। এ সভ্যতা 'সংগঠনের কৌশল'কে একটি চারুকলায় উন্নীত করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা যেসব শক্তির জন্ম দিয়েছে সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পাশ্চাত্য জাতিগুলি রোজই তাদের চূড়ান্ত অক্ষমতার প্রমাণ দিচ্ছে, এবং এই মুহূর্তে তা এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যখন বাহ্যত অপরিসীম বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা আর বিশ্বব্যাপী বিশৃংখলা পাশাপাশি

আগাচ্ছে, হারত ধরাধরি করে। তার বিজ্ঞান জ্ঞানের যে আলো ছড়াচ্ছে—যে-আলো নিঃসন্দেহেই মহৎ—তা থেকে সর্বপ্রকার ধর্মমুখিনতা বঞ্চিত পাশ্চাত্যবাসী আজ আর নৈতিক কোনো ফায়দাই লাভই করতে পারছে না। তার-ক্ষেত্রে কুরআনের এ কথাগুলি প্রযোজ্য ঃ

ওদের উপমা হচ্ছে অমন একটি জাতের উপমা যারা প্রজ্বলিত করেছে আগুন, কিন্তু যখন তা তাদের চারদিকে আলো ছড়ালো তখন আল্লাহ্ তাদের আলো নিয়ে গেলেন এবং তাদের রেখে দিলেন অন্ধকারে যার মধ্যে ওরা দেখতে পায় না— বোবা, বধির এবং অন্ধঃ এবং তবু ওরা ফিরে আসে না।

এবং, তবু ওদের অন্ধত্বের অহমিকায় পাশ্চাত্যের লোকেরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, অন্য কিছু নয়, 'ওদের' সভ্যতাই পৃথিবীতে আনবে আলো আর সুখ-শান্তি...আঠারো এবং উনিশ শতকে ওরা সারা পৃথিবীতে খৃস্টধর্মের সত্য বিস্তার করতে চেয়েছিলো; কিন্তু এখন যেহেতু ওদের ধর্মীয় উদ্দীপনা এতোটা ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছে যে, ধর্মকে ওরা নেপথ্য সংগীতের বেশি কিছু মনে করে না— যাকে 'বাস্তবে' জীবনের সহচর হিসাবে থাকতে দেওয়া হয়, কিন্তু তার উপর প্রভাব খাটাতে দেওয়া হয় না—তখন তারা খৃস্টধর্মের পরিবর্তে 'পাশ্চাত্য জীবন পদ্ধতির' জড়বাদী তত্ত্ব প্রচার করতে শুরু করেছেঃ তত্ত্বকথাটি কী?—এ বিশ্বাস যে কারখানায়, গবেষণাগারে এবং পরিসংখ্যান-বিদদের টেবিলের উপরই মানুষের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব।

এবং এভাবে 'দজ্জাল' আবির্ভূত হয়েছে স্বরূপে...।

চার

নীরবতা জেঁকে থাকে অনেকক্ষণ। এরপর 'শায়খ' আবার বলেনঃ 'বেটা, 'দজ্জাল' বলতে কী বোঝায় এই উপলব্ধিই কি তোমাকে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য করেছে ?'

—'একদিক দিয়ে, আমার মনে হয়, তা'ই হয়েছে, কিন্তু এ ছিলো কেবল শেষ পদক্ষেপ।'

—'শেষ পদক্ষেপ...হ্যাঁ, তুমি কী করে ইসলামের পথ ধরেছো যে কাহিনী একবার আমাকে বলেছিলে। কিন্তু ঠিক কখন এবং কেমন করে তোমার মনে একথা প্রথম উদয় হলো যে, তোমার অভীষ্ট লক্ষ্য হতে পারে ইসলাম ?'

—'কখন? একটু ভাবতে দিন আমাকে...আমার মনে হয়; ব্যাপারটি ঘটেছিলো আফগানিস্তানে, শীতকালের একদিনে, যখন আমার ঘোড়ার একটি নাল হারিয়ে গিয়েছিলো, আর সে কারণে, এক গ্রামে এক কামারকে খুঁজতে হচ্ছিলো আমার। গ্রামটি ছিলো আমার পথ থেকে বেশ দূরে। সেখানেই একজন লোক আমাকে বলেছিলো, 'কিন্তু আপনি তো একজন মুসলমান, কেবল আপনি নিজে তা জানেন না এই যা...এ হচ্ছে আমার ইসলাম গ্রহণের আট মাস আগের কথা..আমি হিরাত থেকে যাচ্ছিলাম কাবুল..'

হিরাত থেকে কাবুলের পথ ধরে আমি চলছি সওয়ারীর পিঠে। আমার সংগে রয়েছে ইবরাহীম এবং একজন আফগান সৈনিক। মধ্য আফগানিস্তানের বরফ-ঢাকা পার্বত্য উপত্যকা আর হিন্দুকুশের গিরি-পথগুলি ধরে আমরা চলছিলাম—সওয়ারী হাঁকিয়ে। ভীষণ

ঠাণ্ডা পড়েছে তখন, বরফ চকচক করছে এবং আমাদের সকল দিকেই দাঁড়িয়ে আছে সাদা–কালো খাড়া উঁচু পাহাড়।

সেদিন আমার মনের মধ্যে ছিলো একটা দুঃখ, আর একই সংগে আমি অনুভব করছিলাম আশ্চর্যজনক এক সুখ। আমি দুঃখ বোধ করছিলাম এজন্য যে, যে–লোকগুলির সংগে আমি গত ক'টি মাস এক সাথে বাস করেছি ওদের ঈমান যে–আলো, যে–শক্তি, যে–বুদ্ধি ওদের দিতে পারতো, মনে হলো তা থেকে ওদের আড়াল করে রেখেছে একটি পুরু অস্বচ্ছ পর্দাঃ আর আমি সুখ বোধ করছিলাম এ কারণে যে, সেই ঈমানের আলো, শক্তি এবং বুদ্ধি রয়েছে আমারই সাথে সম্মুখে, সাদা–কালো পাহাড়গুলির নিকটে, এতো নিকট যেনো হাত দিয়ে আমি স্পর্শ করতে পারছি।

আমার ঘোড়া খোঁড়াতে শুরু করলো এবং কিছু একটা যেনো তার খুরের মধ্যে ক্লিং করে শব্দ করে উঠলোঃ একটি নাল ঢিলা হয়ে পড়েছে এবং কেবলমাত্র দুটি পেরেকের উপর ভর করে ঝুলে আছে।

—'ধারে কাছে কি এমন কোনো গাঁ আছে যেখানে একজন কামার পেতে পারি?' আমি আমাদের আফগান সংগীদের জিগ্‌গাস করি।

—'এখান থেকে এক লীগেরও কিছু কম দূরে দেহ্–জাংগি নামে একটি গাঁ রয়েছে। ওখানে একজন কামার আছে, আর আছে হাজারাজাতের 'হাকিমে'র একটি কিল্লা।'

সুতরাং চকচকে বরফের উপর দিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে আমরা চললাম দেহ্–জংগি, একটু মন্থর গতিতে, যাতে আমার ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে না পড়ে।

'হাকিম' বা জেলা শাসকটি ছিলেন বেঁটে–খাটো হাসি–খুশি এক তরুণ। বন্ধুভাবাপন্ন এই লোকটি তাঁর ছোটো–খাটো নির্জনতায় একজন বিদেশী মেহমান পেয়ে খুশী হলেন। তখন পর্যন্ত যে সব আফগানের সংগে আমার দেখা হয়েছে এবং পরেও আমি যে–সব আফগানকে দেখেছি তাদের মধ্যে এই তরুণই ছিলেন সবচেয়ে সাদাসিধা নিরহংকার, যদিও তিনি ছিলেন বাদশাহ্ আমান উল্লাহ্‌র খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তিনি ওখানে আমাকে দুদিন অবস্থান করতে বাধ্য করেন।

দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় আমরা বসেছি রোজকার মতো ভুরি ভোজনে। এরপর একজন গেঁয়ো লোক সেতারের সংগে একটি গাঁথা গেয়ে আমাদের আপ্যায়িত করে। সে গান গাইছিলো পশ্‌তুতে—যে ভাষা আমি বুঝি না—কিন্তু তার গানের কয়েকটি ফার্সী শব্দ স্পষ্ট যেনো লাফ দিয়ে উঠলো মৃদুষ্ণ গালিচা–ঢাকা গরম পক্ষ এবং জানালার ফাঁক দিয়ে বরফের যে ঠাণ্ডা দীপ্তি এসেছে তারই পটভূমিতে। আমার মনে আছে, সে গাইছিলো গোলিয়াতের সংগে দাউদের যুদ্ধের কথা—ঈমানের সংগে পশু–শক্তির সংগ্রামের কথা—যদিও আমি গানের শব্দগুলি খুব অনুসরণ করতে পারছিলাম না, তবু গানের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠলো আমার কাছে যখন তা শুরু হলো নরম মোলায়েম সুরে এবং তারপর তা উর্ধ্বাভিসারী হলো আবেগের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে, একটা চূড়ান্ত বিজয়ের সহর্ষ চিৎকারে!

গানটি যখন থামলো, 'হাকিম' মন্তব্য করেন ঃ 'দাউদ ছিলেন ক্ষুদ্র কিন্তু তাঁর ঈমান ছিলো বড় ...।'

আমি তাঁর সংগে এই কথাগুলি যোগ না করে পারলাম না, 'এবং আপনারা সংখ্যায় অনেক কিন্তু আপনাদের ঈমান কম।'

আমার মেজবান আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকান এবং আমি প্রায় অনিচ্ছাকৃতভাবে যা বলে ফেলেছি তাতে অপ্রতিভ হয়ে তড়িঘড়ি আমার কথার ব্যাখ্যা শুরু করে দিই। আমার ব্যাখ্যা রূপ নেয় প্রশ্নের তীব্র স্রোতের।

—'এ কেমন করে হলো যে, আপনারা মুসলমানেরা, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন, যার ফলে একদিন আপনাদের পূর্বপুরুষেরা একশ' বছরেরও কম সময়ের মধ্যে আপনাদের ধর্মকে বিস্তৃত করেছিলেন আরব দেশ থেকে পশ্চিমে সুদূর আটলান্টিক পর্যন্ত এবং পূবদিকে মহাচীনের অভ্যন্তরে, আর এখন নিজেদের এতো সহজে এতো দুর্বলের মতো সমর্পণ করছেন পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা ও রীতিনীতির নিকট। কেন! আপনারা,—যাঁদের পূর্বপুরুষেরা একদিন এমন একসময়ে পৃথিবীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন যখন ইউরোপ নিমজ্জিত ছিলো চরম বর্বরতা ও অজ্ঞতার মধ্যে; এখন সাহস সঞ্চয় করতে পারছেন না আপনাদের আপন প্রগতিশীল উজ্জ্বল ধর্মাদর্শের দিকে ফিরে যাওয়ার? এ কি করে সম্ভব হলো যে, আতাতুর্ক, সেই নগণ্য মুখোশধারী ব্যক্তিটি, যে ইসলামের কোনো মূল্য আছে বলেই স্বীকার করে না, আপনারা—মুসলমানদের কাছে সে হয়ে উঠেছে 'মুসলিম পুনর্জাগরণের প্রতীক?'

আমার মেজবান স্তব্ধ, নির্বাক। বাইরে তখন বরফ পড়ছে। দেহ্-জার্ণগি পৌঁছোনোর আগে আগে আমি বেদনা ও আনন্দ-মিশানো যে তরংগ অনুভব করছিলাম আবার তা অনুভব করি। আমি উপলব্ধি করলাম—অতীতের সেই গৌরব যা একদিন ছিলো বাস্তব এবং সেই লজ্জা যা একটি মহৎ সভ্যতার এই পরবর্তীকালের সন্তানদের অপমানে ঢেকে দিচ্ছিলো!

—'আমাকে বলুন—এ কেমন করে হলো যে, আপনাদের নবীর ধর্ম এবং এর সকল সরলতা ও স্বচ্ছতা আপনাদের আলিমদের বন্ধ্যা ধ্যান-ধারণা ও কূটতর্কের জঞ্জালের নীচে চাপা পড়ে গেলো? এ কেমন করে হলো যে, আপনাদের রাজা-বাদশাহ্ এবং বড় বড় জমিদারেরা ধন-ঐশ্বর্য এবং বিলাসিতার মধ্যে ফূর্তিতে মাতলামী করছে যখন তাদের বিপুল সংখ্যক মুসলিম ভাইয়েরা কোনো রকমে জীবন ধারণ করছে অনির্বচনীয় দারিদ্র্য ও নোংরা পরিবেশে—যদিও আপনাদের নবী শিখিয়েছিলেন 'কোনো মানুষই দাবি করতে পারে না সে মুমিন যদি সে নিজে পেট বোঝাই করে খায় যখন তার প্রতিবেশী থাকে ক্ষুধার্ত?' আপনি কি আমাকে বোঝাতে পারেন, আপনারা কেন স্ত্রীলোকদের ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন জীবনের পশ্চাদ্‌ভূমিতে যদিও নবী এবং তাঁর সহচরদের চারপাশে যে-সব মহিলা ছিলেন তাঁরা তাঁদের পুরুষদের জীবনে অংশগ্রহণ করেছিলেন ব্যাপকভাবে? এ কেমন করে হলো যে, আপনারা—মুসলমানদের মধ্যে অতো বেশি লোক অজ্ঞ এবং অতি সামান্য সংখ্যক মানুষই কেবল লিখতে ও পড়তে পারে—যদিও আপনাদের নবী ঘোষণা করেছিলেন, 'জ্ঞানের অনুসন্ধান করা প্রত্যেক মুসলিম নর এবং নারীর জন্য বাধ্যতামূলক পবিত্রতম কর্তব্য,' যদিও তিনি বলেছিলেন 'কেবলই যে ব্যক্তি ধার্মিক তার উপর জ্ঞানী মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব অন্য সকল তারার উপর পূর্ণিমার চাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের মতো?'

তখনো কোনো কথা না বলে পলকহীন দৃষ্টিতে আমার মেজবান আমার দিকে তাকিয়ে আছেন এবং আমি ভাবতে শুরু করি, আমার এই বিস্ফোরণে তিনি হয়ত আহত হয়েছেন, তাঁর অন্তরের গভীরে। বীণাবাদক লোকটি আমাকে অনুসরণ করার মতো ফার্সী বোঝে না বলে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে বিদেশী লোকটির দিকে—যে এতো আবেগের সংগে কথা বলেছে 'হাকিমে'র সাথে। শেষ পর্যন্ত 'হাকিম' তাঁর চওড়া হলদে ভেড়ার চাদরটি গায়ে জড়ালেন, যেন তাঁর ঠাণ্ডা লেগেছে। তারপর ফিসফিস করে বললেনঃ

'কিন্তু.....আপনি তো একজন মুসলমান।...'

আমি সশব্দ হাসিতে উচ্চকিত হই এবং বলিঃ 'না, আমি মুসলিম নই। কিন্তু আমি ইসলামের মধ্যে এতো সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছি যে, মাঝে মাঝে আমি রেগে যাই যখন দেখি আপনারা এর অপচয় করছেন।...আমি যদি খুব রূঢ় কথা বলে থাকি আমাকে মাফ করবেন। আমি দুশমন হিসাবে কথা বলিনি।'

আমার মেজবান মাথা নাড়লেন, 'না, আমি যা বলেছি তা সত্যঃ

আপনি একজন মুসলমান; কেবল আপনি নিজে জানেন না, এই যা...।' কেন আপনি এখানে, এই মুহূর্তে বলছেন না "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্—আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রাসূল?" এবং কেন কার্যত একজন মুসলমান হচ্ছে না, যেমন আপনি ইতিমধ্যেই আছেন আপনার অন্তরে? বলুন ভাই, এখনি একথা উচ্চারণ করুন, আগামীকাল আমি আপনার সাথে যাবো কাবুল এবং আপনাকে নিয়ে যাবো 'আমীরে'র কাছে, আর তিনি দু'বাহু বাড়িয়ে আপনাকে জানাবেন অভ্যর্থনা। তিনি আপনাকে দেবেন ঘরবাড়ি, বাগান এবং গরু-বাছুর, আর আমরা সবাই আপনাকে ভালোবাসবো । বলুন ভাইজান...'

—'আমি যদি কখনো একথা উচ্চারণ করি তা করবো এ কারণে যে, আমার মন শান্তিতে স্থিতি লাভ করেছে—'আমীরে'র ঘরবাড়ি এবং বাগিচার জন্য নয়।'

কিন্তু তিনি জেদ করতে থাকেন, 'আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই ইসলাম সম্পর্কে যা জানি আপনি তো এখনি তার চাইতে অনেক বেশি জানেন। কী সেই জিনিসটি যা আপনি এখনো বুঝতে পারেননি?'

—'প্রশ্নটি বোঝার নয়, বরং সন্দেহমুক্ত হয়ে এই বিশ্বাস করার প্রশ্নঃ এ প্রত্যয় যে, কুরআন প্রকৃতই আল্লাহ্র বাণী এবং একজন মহামানবের বিস্ময়কর সৃষ্টি কেবল নয়....'

কিন্তু পরবর্তী ক'টি মাস আমার সে আফগান বন্ধুর কথাগুলি মন থেকে আমি কখনো সরিয়ে রাখতে পারলাম না।

কাবুল থেকে আমি দক্ষিণ আফগানিস্তানের ভেতর দিয়ে প্রাচীন নগরী গজনী হয়ে কয়েক হপ্তা ঘোড়ায় চড়ে সফর করি। গজনী থেকেই প্রায় এক হাজার বছর আগে মহাবীর মাহমুদ বার হয়েছিলেন ভারত বিজয়ে। আমি চলি বিদেশী শহরের মতো দেখতে কান্দাহারের ভেতর দিয়ে, যেখানে আপনি সাক্ষাত পাবেন পৃথিবীর দুর্ধর্ষতম যোদ্ধা উপজাতিগুলির। আমি পাড়ি দিই আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের মরুভূমি এবং আবার ফিরে আসি হিরাতে, যেখান থেকে শুরু হয়েছিলো আমার আফগানিস্তান পায়ে চলার রাস্তা।

সে ছিলো ১৯২৬ ইংরেজি। শীতকালের শেষ দিকে আমি হিরাত ত্যাগ করি—আমার স্বদেশমুখী দীর্ঘ সফরের প্রথম পর্যায়ে আমি ট্রেনে করে যাই আফগান সীমান্ত থেকে রুশ তুর্কিস্তানের মার্ভে, সেখান থেকে সমরখন্দে—সমরখন্দ থেকে বোখারায় এবং তাসখন্দে, আর সেখান থেকে তুর্কমান স্তেপ অঞ্চল পাড়ি দিয়ে যাই উরাল আর মস্কোতে।

সোভিয়েত রাশিয়ার যে ছাপ আমার মনে প্রথম এবং সবচেয়ে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে তা হচ্ছে মার্ভের রেল স্টেশনে একটা মস্ত বড়ো, অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত পোস্টার—যাতে দেখানো হয়েছিলোঃ নীল রংয়ের ঢিলা জামা পরা এক তরুণ প্রলেতারিয়া বুট জুতা দিয়ে লাথি মেরে মেঘ-ভরা আকাশ থেকে ফেলছে এক হাস্যকর সাদা দাড়িওয়ালা জোব্বা পরা ভদ্রলোককে। পোস্টারের নীচে এই রুশ উপকথাটি ছিলো লিখিতঃ এভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকেরা খোদাকে লাথি মেরে তাড়িয়েছে আকাশ থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকের 'বেজবোজনিকি' (নাস্তিক) এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত।'

যেখানেই যাই, প্রত্যেক জায়গায়ই, এ ধরনের সরকার অনুমোদিত ধর্ম-বিরোধী প্রচারণা হুমড়ি খেয়ে পড়ে চোখের উপরঃ সরকারী দালান-কোঠায়, সড়কে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে যে-কোনো ইবাদত খানার আশেপাশে। তুর্কিস্তানে স্বভাবতই এসব ইবাদতখানার বেশির ভাগ ছিলো মসজিদ। প্রকাশ্য সালাতের জামাত নিষিদ্ধ ঘোষিত না হলেও মানুষ যাতে জামাতে শরিক হতে না পারে তার জন্য কর্তৃপক্ষ সকল চেষ্টাই করতো। আমি প্রায়ই শুনতাম, বিশেষ করে বোখারা এবং তাসখন্দে ঃ যে মানুষই মসজিদে ঢোকে পুলিশ গোয়েন্দারা তার নাম টুকে রাখছে ঃ কুরআনের কপিগুলি এক জায়গায় জমা করে ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে। আর তরুণ 'বেজবোজনিকি'দের একটি মজার খেলা ছিলো মসজিদের ভেতরে শূকরের মাথা নিক্ষেপ করা। সত্যি একটি চমৎকার রীতি বলতে হয়।

এশীয় এবং ইউরোপীয় রাশিয়ার ভেতর দিয়ে কয়েক হপ্তা ভ্রমণের পর আমি যখন পোলাণ্ডের সীমান্ত অতিক্রম করি, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমি সোজা চলে যাই ফ্রাংকফুর্ট এবং হাযির হই গিয়ে আমার সংবাদপত্রের এতোদিনের পরিচিত এলাকার মধ্যে। একথা বুঝতে আমার খুব দেরী হলো না যে, আমার অনুপস্থিতিকালে আমার নাম খুবই মশহুর হয়ে পড়েছে এবং মধ্য ইউরোপের বৈদেশিক সংবাদদাতাদের মধ্যে সবচেয়ে যারা বেশি পরিচিত আমাকে এখন তাঁদেরই অন্যতম বলে মনে করা হচ্ছে। আমার কয়েকটি প্রবন্ধ—বিশেষ করে ইরানীদের জটিল ধর্মীয় মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলাম সেগুলি—বিখ্যাত প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো এবং সেগুলি যে স্বীকৃত লাভ করেছে তা মামুলি নয়। এই কৃতিত্বের বদৌলতে বার্লিনের একাডেমী অব জিওপলিটিক্স-এ কয়েকটি ভাষণ দেওয়ার জন্য আমি আমন্ত্রিত হই। সেখানেই আমাকে বলা হলো—আমার বয়সের একজন মানুষকে (তখনো ছাব্বিশ হয়নি আমার বয়স) এ ধরনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যা এর আগে আর কখনো ঘটেনি। সর্বসাধারণের অধিকতরো উপযোগী প্রবন্ধগুলি 'ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙের' অনুমতি নিয়ে পুনর্মুদ্রণ করেছে অন্য অনেক সংবাদপত্র। আমি জানতে পারলাম, আমার একটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে প্রায় ত্রিশ বার। সবদিক দিয়েই

আমার ইরান সফর হয়েছিলো খুবই ফলপ্রসূ।

... ...

এ সময়েই আমি এল্‌সাকে বিয়ে করি। যে দু'বছর আমি ইউরোপ থেকে দূরে ছিলাম তা আমাদের ভালবাসাকে দুর্বলতরো না করে বরং আরো মজবুতই করেছিলো; আর এমন একটা খুশী আর আনন্দের সাথে আমি আমাদের দু'জনের বয়সের বৃহৎ ব্যবধান সম্পর্কে তার আশংকা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলাম জীবনে যা এর আগে আর কখনো আমি অনুভব করিনি।

—'কিন্তু তুমি কেমন করে আমাকে বিয়ে করবে? এল্‌সা যুক্তি পেশ করে, 'তোমার বয়স এখন ছাব্বিশও নয়, আর আমি এখন চল্লিশের উপরে। একটু ভেবে দেখোঃ তোমার বয়স যখন ত্রিশ হবে আমার বয়স হবে তখন পঁয়তাল্লিশ, আর তুমি যখন চল্লিশে পৌঁছুবে আমি তো তখন বুড়ি...।'

আমি উচ্চৈস্বরে হেসে উঠিঃ 'তাতে কি হয়েছে? তোমাকে ছাড়া আমি আমার ভবিষ্যৎ কল্পনাও করতে পারি না।'

এবং শেষপর্যন্ত এল্‌সা হার মানে।

আমি অতিশয়োক্তি করিনি যখন আমি বললাম, এল্‌সাকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যতের কল্পনা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। সৌন্দর্য আর তার সহজাত মাধুর্য এল্‌সাকে আমার নিকট এমন পরম আকর্ষণীয়া করে তুলেছিলো যে, অন্য কোনো স্ত্রীলোকের দিকে আমি তাকাতেও পারতাম না। আর জীবন থেকে আমি কী চাই এ বিষয়ে তার সুগ্রাহী বোধ আমার আশা ও আকাংখাকে করে আলোকিত এবং এগুলিকে করে তোলে আরো বেশি কংক্রীট, আরো বেশি ধার্য—আমার নিজের চিন্তা-ভাবনা যা কখনো করতে পারতো, তা থেকে এগুলিকে আরো কংক্রীট, আরো ধার্য করে তোলে।

একবার—খুব সম্ভব আমাদের বিয়ের এক হপ্তা পরে—এল্‌সা মন্তব্য করেঃ কী আশ্চর্য যে সকল মানুষের মধ্যে তুমিই ধর্মে মিষ্টি-সিজমকে অবজ্ঞা করছো...তুমি নিজেই তো একজন মিস্টিক-ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে এক ধরনের মিস্টিক, তোমার চারপাশের জীবনের দিকে তুমি আগাচ্ছো তোমার আঙুলের ডগায় পরশ করে করে, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই একটা সূক্ষ্ম জটিল মিস্টিক নক্‌শা দেখে দেখে—অনেক কিছুর মধ্যেই—যা অন্য মানুষের কাছে মনে হয় অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ...অথচ যে মুহূর্তে তুমি ধর্মের দিকে তাকাও তুমি তখন একেবারেই মগজসর্বস্ব। অন্য প্রায় সকল লোকের ক্ষেত্রেই তো এর বিপরীতটিই বরং হতো...'

কিন্তু এল্‌সা সত্যিই হতবুদ্ধি হয়নি। আমি যখন ইসলামের কথা তাকে বলতাম তখন আমি যে কিসের সন্ধানে রয়েছি তা সে জানতো, যদিও সে হয়তো আমার মতো এতো তীব্র তাগিদ অনুভব করেনি, তবু আমার প্রতি তার ভালোবাসাই তাকে আমার এ অনুসন্ধানে আমার অংশী করে তোলে।

প্রায়ই আমরা দু'জন এক সংগে কুরআন পাঠ করি এবং কুরআনের বিভিন্ন ভাবধারা নিয়ে দু'জনে আলোচনা করি; আর এল্‌সাও আমার মতোই এর নৈতিক শিক্ষা আর এর

বাস্তব ব্যবহারিক নির্দেশের মধ্যে যে আন্তরিক সংযোগ রয়েছে তাতে ক্রমেই অধিকতরো প্রভাবিত হয়ে উঠতে থাকে। আল্-কুরআনের মতে, মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ্ অন্ধ আনুগত্য চান না, বরং আবেদন জানান তার বুদ্ধির প্রতি; তিনি মানুষের নিয়তি থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন না, বরং তিনি 'তোমার ঘাড়ের রগের চাইতেও তোমার নিকটতরো।' তিনি ধর্ম এবং সামাজিক আচরণের মধ্যে টেনে দেননি কোনো ভেদরেখা ঃ আর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্ভবত এই যে, আল্লাহ্ এই স্বতঃসিদ্ধ থেকে শুরু করেননি যে, জীবন মাত্রই জড় ও আত্মার দ্বন্দ্বে ভারাক্রান্ত এবং আলোর দিকে পথ পেতে হলে আত্মাকে মুক্ত করতে হবে দেহের বন্ধন থেকে। জীবনের অস্বীকৃতি এবং আত্মা-নিগ্রহ, তা যে ধরনেরই হোক না কেন, রসূল তাঁর নিন্দা করেছেন তাঁর এই ধরনের উক্তিতে,'জেনে রোখো, কৃচ্ছ্রসাধন আমাদের জন্য নয়' এবং 'ইসলামে সন্ন্যাসবাদের স্থান নেই।' মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে কেবল যে একটি ইতিবাচক ফলপ্রসূ প্রবৃত্তি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তা নয়, তাকে একটি নৈতিক স্বতঃসিদ্ধের পবিত্রতায়ও মণ্ডিত করা হয়েছে। কার্যত মানুষকে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছেঃ তুমি যে কেবল তোমার জীবনের পুরাপুরি ব্যবহারই 'করতে পারো' তা নয়, তুমি তা করতে 'বাধ্যও' বটে।

ইসলামের একটি সুসংহত রূপ এমন এক চূড়ান্ততা ও নিশ্চয়তা নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো যে, মাঝে মাঝে আমি বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে পড়তাম। এমন প্রক্রিয়ায় এটি আকার নিচ্ছিলো যাকে এক ধরনের মানসিক ওস্‌মস্‌িস বলেই বর্ণনা করা যেতে পারে, অর্থাৎ গত চার বছর ধরে জীবন পথে আমার টুকরা টুকরা যে জ্ঞান হয়েছে আমার পক্ষে সজ্ঞানে সেগুলিকে একত্রে গেঁথে তোলা এবং 'বিধিবদ্ধ' করার কোনো চেষ্টা ছাড়াই ধীরে ধীরে তা আকার নিচ্ছিলো। আমি আমার সামনে এমন একটা কিছু দেখতে পেলাম, যা এক নিখুঁত স্থাপত্য-শিল্পেরই অনুরূপ, যার সব ক'টি উপাদান-উপকরণকেই এরূপ সংগতি রেখে ধারণা করা হয়েছে, যেনো প্রত্যেকটিই অপরের পরিপূরক ও সহায়ক হয়, যাতে বাহুল্য কিছুই নেই এবং অভাবও কিছুরই নেই—এমন একটি সমতা ও সমাহিত ভাব, যা মানুষের মধ্যে এ ধারণার জন্ম দেয় যে, ইসলামের দৃষ্টিভংগি এবং স্বতঃসিদ্ধের মধ্যেই রয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়ের অবস্থান 'তার যথাযথ স্থানে।'

তের-শ' বছর আগে একটি মানুষ দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা করেছিলেন ঃ আমি একজন মরণশীল মানুষ মাত্র; কিন্তু যিনি এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাকে আদেশ করেছেন তাঁর বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তোমরা যাতে তাঁর দৃষ্টি-পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে জীবন-যাপন করতে পারো, সেজন্য তিনি আমাকে আদেশ করেছেন, তাঁর অস্তিত্ব, সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বদর্শিতার বিষয় তোমাদের 'স্মরণ করিয়ে দিতে এবং তোমাদের সামনে আচরণের একটি কর্মসূচী পেশ করতে। তোমরা যদি আমার এই তাগিদ ও এই কর্মসূচী গ্রহণ করো, তাহলে আমাকে অনুসরণ করো।' এই ছিলো মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের সারকথা।

তিনি যে সামাজিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন সে হচ্ছে এক সরল জীবনের পরিকল্পনা, যা কেবল প্রকৃত মহত্তের সংগেই হাত ধরাধরি করে চলে। এর সূচনা এই সূত্র থেকে যে,

মানুষ এক জৈব সত্তা, যার রয়েছে জৈব চাহিদা এবং মানুষের স্রষ্টা কর্তৃক মানুষের প্রকৃতি এমনভাবেই সৃষ্ট যে, তাদের দৈহিক–মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজন পুরাপুরি মিটানোর জন্য তাদের অবশ্যি দলবদ্ধভাবে জীবন যাপন করতে হবেঃ সংক্ষেপে, মানুষ একে অন্যের উপর 'নির্ভরশীল'। কোনো ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উচ্চতা (সকল ধর্মেরই মূল লক্ষ্য) লাভে ধারাবাহিকতা নির্ভর করে সে তার চতুষ্পার্শ্বের লোকদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে কি না, তাদের দ্বারা উৎসাহিত ও রক্ষিত হয়েছে কি না, তার উপরঃ অবশ্য তার চারপাশের লোকেরাও তার কাছ থেকে আশা করে একই রূপ সহযোগিতা। মানুষের এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই হচ্ছে সেই কারণ যার জন্য ইসলামে ধর্মকে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি থেকে আলাদা করা যায়নি। মানুষের বাস্তব সম্পর্কগুলিকে এভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে করে প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে বাধা পায় ন্যূনতম সংখ্যক এবং উৎসাহ পায় যতো বেশি সম্ভব মনে হয়। এই–ই—আর কিছুই নয়—সমাজের সত্যিকার কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামের ধারণা! আর এ কারণেই এটা খুবই স্বাভাবিক ছিলো যে, নবী মুহাম্মদ তাঁর রিসালতের তেইশ বছরে যে–ব্যবস্থাকে রূপ দিয়েছিলেন তার সম্পর্ক কেবল রূহানী ব্যাপারের সংগেই ছিলো না, সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাজকর্মের একটা কাঠামোও তাতে দেওয়া হয়েছিলো। এ ব্যবস্থায় কেবল ব্যক্তিগত সদাচরণের ধারণাকেই উচ্চে তুলে ধরা হয়নি, এই সদাচরণের ফলস্বরূপ যে সুষম সমাজের উদ্ভব হওয়া উচিত সে ধারণাকেও দিয়েছে সম্যক গুরুত্ব। একটি রাষ্ট্রনৈতিক সম্প্রদায়ের রূপরেখা মাত্র এতে দেওয়া হয়েছে—কেবল রূপরেখাই, কারণ মানুষের রাজনৈতিক প্রয়োজনের খুঁটিনাটি কালের দ্বারা সীমিত এবং সে কারণে পরিবর্তনশীল— আরো রয়েছে ব্যক্তিগত অধিকার ও সামাজিক দায়িত্বের স্কীম, যাতে ঐতিহাসিক বিবর্তনের বাস্তবতাকে আগাম ধরে নেওয়া হয়েছে সঠিকভাবে। ইসলামী জীবনপদ্ধতির আওতায় পড়ে জীবনের সকল দিক—নৈতিক এবং দৈহিক, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক। রাসূলের শিক্ষায় দেহ এবং মনের সমস্যাকে, যৌন ও অর্থনৈতিক প্রশ্নকে তাদের ন্যায্য স্থান দেওয়া হয়েছে ধর্মতত্ত্ব ও ইবাদতের সমস্যার পাশাপাশি এবং জীবনের সংগে যা–কিছু সম্পর্কিত কখনো তা এতোটা তুচ্ছ বিবেচিত হয়নি যে, ধর্মীয় চিন্তার বৃত্তের মধ্যে তাকে আনা যাবে না— এমন কি, ব্যবসা–বাণিজ্য, উত্তরাধিকার, সম্পত্তির অধিকার অথবা ভূমি স্বত্বের মতো নেহাৎ জাগতিক সমস্যাকেও অতোটা তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়নি!

ইসলামী আইনের সবকটি ধারাই পরিকল্পিত হয়েছে জন্ম, জাতি, লিংগর পার্থক্য না করে অথবা সামাজিক আনুগত্য নির্বিশেষে, সমাজের সকল সদস্যের জন্য সমান সুযোগ–সুবিধা ও কল্যাণ বিধান হিসাবে। এ সমাজের প্রতিষ্ঠতা বা তাঁর বংশধরদের জন্য কোন সুযোগ–সুবিধা ও সংরক্ষিত ছিলো না। এবং অস্তিত্ব ছিলো না শ্রেণীর ধারণার। যারা ইসলামে বিশ্বাস করে তাদের সকলের জন্য একইভাবে প্রযোজ্য সকল অধিকার, কর্তব্য সুযোগ–সুবিধা। আল্লাহ্ এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন নেই, কারণ 'তিনি জানেন যা তাদের হাতে আছে তাদের সম্মুখে এবং যা ওরা গোপন করে ওদের পশ্চাৎদেশে। আনুগত্য কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি, নিজের

মা-বাপের প্রতি, এবং যে সমাজের লক্ষ্য পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র রাজ্য স্থাপন সেই সমাজের প্রতি। এছাড়া আর কারো প্রতি কোনো আনুগত্যকে ইসলাম স্বীকার করে না, এবং এতে ঐ জাতীয় আনুগত্যের কোনো অবকাশ নেই যাতে বলা হয়, 'ভালো হোক মন্দ হোক আমার দেশ', অথবা 'আমার জাতিই ঠিক।' এই নীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহানবী অত্যন্ত স্পষ্টভাবে একাধিকবার বলেছেনঃ 'সে আমার উম্মত নয় যে গোত্রগত দলীয় লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করে; সে আমার উম্মত নয় যে গোত্রগত দলীয় স্বার্থের জন্য লড়াই করে এবং সে আমার উম্মত নয় যে গোত্রগত দলপ্রীতির জন্য মারা যায়।'

ইসলামের পূর্বে সকল রাজনৈতিক সংগঠন-এমনকি ধর্মতান্ত্রিক অথবা আধা-ধর্মতান্ত্রিক ভিত্তির সংগঠনগুলিও—সীমাবদ্ধ ছিলো গোত্র এবং গোত্রগত সমরূপতার সংকীর্ণ ধারণার দ্বারা। তাই প্রাচীন মিসরের দেবতা-রাজারা নীল উপত্যকা এবং তার অধিবাসীদের সীমান্তের ওপারে কোনো কিছুর চিন্তা করতো না এবং হিব্রুদের প্রথম-দিকের ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন আল্লাহ্‌ই রাজ্য শাসন করেন বলে মনে করা হতো তখনো অনিবার্যভাবেই আল্লাহ্‌ ছিলেন বনি-ইসরাইলের আল্লাহ্‌! পক্ষান্তরে, কুরআনী চিন্তাধারার কাঠামোর মধ্যে জন্ম অথবা গোত্রের প্রতি আনুগত্যের কোন স্থান নেই। ইসলামে এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় সমাজের ধারণা করা হয়েছে যা গোত্র ও জাতের গতানুগতিক বিভাগকে অস্বীকার করে। এদিক দিয়ে ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের লক্ষ্য অভিন্ন; একথা বলা যেতে পারেঃ উভয়েই একটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গঠন করতে চায়, যা গড়ে উঠবে সাধারণ একটি আদর্শের প্রতি তাদের আনুগত্যের ভিত্তিতে। কিন্তু খৃষ্টধর্মে যেখানে এই নীতির কেবল নৈতিক ওকালতি করেই সন্তুষ্ট থেকেছে এবং সীজারকে তার প্রাপ্য দেবার জন্য খৃষ্টধর্মের অনুসারীদের পরামর্শ দিয়ে এ ধর্মের বিশ্বজনীন আবেদনকে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রেখেছে, সেখানে ইসলাম দুনিয়ার সামনে এমন একটি রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের স্বপ্ন মেলে ধরেছে যেখানে ঐশী চেতনাই হবে মানুষের ব্যবহারিক আচরণের প্রধান চাবিকাঠি এবং সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের একমাত্র ভিত্তি।

এভাবে, খৃষ্টধর্ম যা অপূর্ণ রেখে দিয়েছিলো তা পূর্ণ করে ইসলাম মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় যোগ করেঃ আর এ হচ্ছে, একটি মুক্ত আদর্শভিত্তিক সমাজের প্রথম দৃষ্টান্ত যা অতীতের রুদ্ধ, জাত অথবা ভৌগোলিক দিক দিয়ে সীমাবদ্ধ, সমাজগুলির বিপরীত।

ইসলাম এমন একটি সভ্যতা কল্পনা করে এবং জন্ম দেয় যাতে জাতীয়তাবাদের অবকাশ নেই, নেই কোন কায়েমী স্বার্থ, কোন শ্রেণী-বিভাগ, কোন চার্চ পুরোহিত প্রথা জন্মগত আভিজাত্য। আসলে জন্মগত কোনো বৃত্তিই ইসলামে নেই। লক্ষ্য ছিলো আল্লাহ্‌র দিকে লক্ষ্য রেখে ধর্মতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এবং মানুষে মানুষে গণতন্ত্র স্থাপনের। এই নতুন সভ্যতার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য—যা ইসলামকে মানব-ইতিহাসে আর সকল আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছে— এই বাস্তব বিষয় যে, এ সভ্যতা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বেচ্ছা-সম্মতির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে বলে কল্পনা করা হয়েছিলো এবং কার্যত স্বেচ্ছা-সম্মতির ফলেই তার জন্ম হয়েছিলো। ইতিহাসে পরিচিত অন্য সকল সম্প্রদায়ে এবং সভ্যতায়ই পরস্পর বিরোধী স্বার্থের চাপ এবং পাল্টা চাপের ফল হচ্ছে সামাজিক প্রগতি— ইসলামে কিন্তু না নয়। এখানে

সমাজের প্রগতি হচ্ছে একটি মৌলিক সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ অন্য কথায়, মূলেই বিদ্যমান রয়েছে একটি প্রকৃত সামাজিক চুক্তিঃ পরবর্তী কালের ক্ষমতাধিকারীরা তাদের সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করার জন্য যে বাক্যালংকারের আশ্রয় নিয়েছিলো সে বিচারে নয়—ইসলামী সভ্যতার বাস্তব ঐতিহাসিক উৎস হিসাবেই। আল-কুরআন বলে ঃ

> দেখো, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের নিকট থেকে তাদের দেহ-প্রাণ এবং ধন-সম্পদ খরিদ করে নিয়েছেন, পরিবর্তে তাদের দিয়েছেন জান্নাতের ওয়াদা... তাহলে তোমরা যা খরিদ করেছো তার জন্য আনন্দ করো, কারণ এ তো এক মহাসাফল্য।

আমি জানতাম, এই মহাসাফল্য— ইতিহাসে লিপিবদ্ধ সত্যিকার সামাজিক চুক্তির একমাত্র দৃষ্টান্ত মাত্র কিছু কালের জন্য রূপায়িত হয়েছিলো বাস্তবে। অথবা এ-ও বলা যায়, মাত্র কিছুকালের জন্যই একে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ব্যাপক আকারে চেষ্টা করা হয়েছিলো। রাসূলের মৃত্যুর পর একশ বছরের কম সময়ের মধ্যে ইসলামের আদি-রাষ্ট্রীয় রূপটি দূষিত হতে শুরু করে এবং পরবর্তী শতকগুলিতে মূল কর্মসূচীটিকে ধীরে ধীরে পশ্চাতভূমিতে ঠেলে দেওয়া হয়। স্বাধীন নরনারীর স্বাধীন সম্মতির স্থান গ্রহণ করে ক্ষমতার জন্য বংশগত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ। বংশগত রাজতন্ত্র যা ইসলামের ধর্মীয় চিন্তাধারার ঘোর বিরোধী যেমন বহু ঈশ্বরবাদ তেমনি বিরোধী ইসলামের রাষ্ট্রনৈতিক ধ্যান-ধারণার শিগ্‌গিরই মঞ্চ দখল করে বসলো এবং তার সংগে এলো বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে সংঘর্ষ ও ষড়যন্ত্র, গোত্রগত আনুগত্য ও ভালোমন্দের ধারণা, জোর-জুলুম এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার সেবাদাসী স্তরে ধর্মের সাধারণ অধঃপতন। সংক্ষেপে, ইতিহাসে সুপরিচিত 'কায়েমী স্বার্থবাদী'দের সমগ্র দলটিই এসে হাজির হলো। কিছুকাল মহান ইসলামী চিন্তাবিদেরা ইসলামের সত্যিকার আদর্শকে বিকৃতির হাত থেকে বাঁচিয়ে উচ্চে তুলে ধরার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁদের পরে যাঁরা ছিলেন প্রতিভার দিক দিয়ে নিম্নতরো পর্যায়ের; তাঁরা দুই কিম্বা তিন শতাব্দী পরে হারিয়ে গেলেন বুদ্ধিবৃত্তিক মামুলী রীতি-প্রথার বদ্ধ জলায়। তাঁরা নিজেরা চিন্তা করার দায়িত্ব ত্যাগ করলেন এবং পূর্ববর্তী যুগগুলির মৃত বাগধারাগুলির পুনরাবৃত্তি করেই তাঁরা তুষ্ট থাকলেন, তাঁরা ভুলে গেলেন যে, প্রত্যেকটি মানবিক 'মতই 'সময়ের দ্বারা সীমিত এবং তাতে ভ্রান্তির অবকাশ আছে আর এ কারণে চিরকাল তার নতুন রূপদানের প্রয়োজন আছে। ইসলামের মূল প্রবর্তনা শুরুতে যা ছিলো এতো প্রবল এবং প্রচন্ড— কিছুকালের জন্য মুসলিম কমনওয়েলথকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশাল উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ছিলো যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক এবং শৈল্পিক কৃতিত্বের সেই উজ্জ্বল স্বপ্নের জগতে, যাকে ইতিহাসবিদেরা বর্ণনা করেন ইসলামের সোনালী যুগ বলে। কিন্তু আর কয়েক শতকের মধ্যেই এই উদ্যম ও প্রবর্তনাও মরে গেলো আত্মিক পুষ্টির অভাবে এবং মুসলিম সভ্যতা ক্রমেই হয়ে উঠলো অধিকতরো মাত্রায় স্রোতোহীন এবং সৃজনী-শক্তিবর্জিত।

... ...

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমার ধারণায় কোনো অস্পষ্টতা ছিলো না। যে-চার বছর আমি ঐসব দেশে কাটিয়েছি তা থেকেই আমি দেখেছি যদিও ইসলাম

এখনো জীবন্ত, যা ইসলামের অনুসারীদের বিশ্বকে দেখার বিশিষ্ট ভংগিতে এবং ইসলামের নৈতিক কর্তব্য বিষয়ক সূত্রগুলির নীরব স্বীকৃতিকে দৃশ্যমান, তবু তারা নিজেরা সেই সব লোকের মতোই পক্ষঘাতগ্রস্ত যারা নিজেদের বিশ্বাগুলিকে ফলপ্রসূ রূপ দিতে অসমর্থ। কিন্তু ইসলামের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে আজকের মুসলমানদের ব্যর্থতার চাইতেও, ঐ স্কীমের মধ্যেই যে–শক্তি ও সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে তার প্রতিই আমি ছিলাম বেশি আকৃষ্ট। আমার জন্য এটুকু জ্ঞানই যথেষ্ট ছিলো যে, ইসলামের ইতিহাসের একেবারে শুরুতে স্বল্পকালের জন্য হলেও ঐ স্কীমটিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য একটি সফল চেষ্টা 'করা হয়েছিলো'। এবং যা এক সময়ে সম্ভব মনে হয়েছিলো তা অন্য সময়েও হয়তো সত্যি সম্ভব হতে পারে। আমি নিজেকে বলি— মুসলমানেরা যদি মূল শিক্ষা থেকে সরে গিয়ে আলস্য এবং অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হয়েই থাকে, তাতে কী হয়েছে? আরবের নবী তেরোশো বছর আগে তাদের সামনে যে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন তারা যদি সে আদর্শ মোতাবিক জীবন যাপন না করে তাতেই বা কি হলো— যদি সেই আদর্শটিই, যারা এর বাণী শুনবার জন্য আন্তরিকভাবেই ইচ্ছুক তাদের সকলের জন্য আজো উন্মুক্ত থেকে থাকে?

এবং এ–ও হতে পারে, আমি মনে মনে ভাবি, পরে যারা এসেছে তাদের জন্য এ বাণীর প্রয়োজন আরো অনিবার্যভাবেই বেশি—মুহম্মদের কালের লোকদের চাইতেও। তারা এমন একটা পরিবেশে বাস করতো যা আমাদের পরিবেশ থেকে ছিলো অনেক বেশি সরল, আর এজন্য তাদের সমস্যা এবং অসুবিধাদির সমাধান ছিলো অনেক বেশি সহজ। আমি যে জগতে বাস করছি তার সমগ্রটাই টলটলায়মান; কারণ আত্মিক দিক দিয়ে এবং সে কারণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়েও ভাল কি এবং মন্দ কি সে সম্পর্কে কোনো ঐকমত্য নেই। আমি বিশ্বাস করতাম না যে, ব্যক্তি মানুষের 'পরিত্রাণে'র প্রয়োজন আছেঃ কিন্তু এ আমার বিশ্বাস যে, আধুনিক সমাজের পরিত্রাণ আবশ্যক রয়েছে। আগের যে কোন সময়ের চাইতে ক্রমবর্ধমান নিশ্চয়তার সংগে আমি অনুভব করি, আমাদের এই কাল নতুন এক সমাজচুক্তির জন্য একটি দার্শনিক ভিত্তির মুখাপেক্ষীঃ এ কালের জন্য দরকার এমন একটি বিশ্বাসের, যা কেবল প্রগতির জন্য বৈষয়িক–প্রগতির শূন্যতা আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করে দেবে এবং তা সত্ত্বেও এই পৃথিবীর জীবনকে দেবে তার ন্যায্য পাওনা, আমাদের তা শেখাবে কী করে রূহানী এবং দৈহিক প্রয়োজনের মধ্যে স্থাপন করতে হবে তারসাম্য; আর এভাবেই আমাদের বাঁচাবে সেই বিপর্যয় থেকে যার মধ্যে আমরা ধেয়ে চলেছি হঠকারিতার সংগে।

...   .

একথা অত্যুক্তি হবে না যে, আমার জীবনের এই সময়টিতে, মনকে দখল করেছিলো ইসলামের সমস্যা—এটা তখন সমস্যাই ছিলো আমার নিকট—অন্য সবকিছুকে আড়াল করে। সেই মুহূর্তে আমার একান্ত সমাহিত ভাব উঠেছিলো তার প্রাথমিক পর্যায়গুলিকে—যখন তা একটি অপরিচিত হয়তো বা আকর্ষণীয় আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রতি এক বুদ্ধিবৃত্তিক আকর্ষনই কেবল ছিলো। কিন্তু তখন তা সত্যের জন্য এক তীব্র আবেগময় অনুসন্ধান হয়ে উঠেছে। এই অনুসন্ধানের সাথে তুলনায় গত দু'বছরের সফরের দুঃসাহসিক অভিযানের চাঞ্চল্য পর্যন্ত তুচ্ছ হয়ে গেলোঃ পরিণাম হলো এই ফ্রাঙ্কফুর্টার

শাইটুঙ-এর সম্পাদক আমার কাছ থেকে যে নতুন বইটি ন্যায়সংগতভাবেই আশা করছিলেন তা লেখার জন্য মনোযোগ দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লো।

ডাঃ সাইমন বইটি রচনার ব্যাপারে আমার স্পষ্ট গড়িমসি পহেলা প্রশ্রয়ের নযরেই দেখেছিলেন। আর যা-ই হোক আমি একটা দীর্ঘ সফর শেষে এইমাত্র ফিরে এসেছি এবং কোনো-না-কোনো রকমের ছুটি আমার পাওনা হয়েছে। আমার সাম্প্রতিক বিয়েও লেখার রুটিন থেকে কিছুটা অবকাশের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক করে তুললো। কিন্তু এ ছুটি আর অবকাশ যখন, ডাঃ সাইমন যা যুক্তিসংগত মনে করেন তা ছাড়িয়ে, দীর্ঘতর হতে লাগলো তখন তিনি বললেন, আমার এখন মর্ত্যলোকে ফিরে আসা উচিত। পেছনের দিকে তাকালে মনে হয় তিনি ছিলেন খুবই বিবেচক; কিন্তু এ সময়ে তাকে ভিন্ন রকম মনে হলো। 'বইটি' সম্পর্কে তাঁর ঘন ঘন এবং জরুরী জিগ্‌গাসার ফল তাঁর আশার বিপরীত হলো ঃ আমার মনে হলো, যেনো একটা বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে, আমি বইটির কথা মনে হলেই বিরক্ত বোধ করতে শুরু করলাম। আমি এখন পর্যন্ত যা দেখেছি তা বর্ণনা করার চাইতে এখানো আমাকে যা আবিষ্কার করতে হবে তা-ই নিয়ে ছিলাম অধিকতর ব্যস্ত।

শেষপর্যন্ত ডঃ সাইমন ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে এই কর্কশ মন্তব্য করে বসলেনঃ 'আমি মনে করি না যে, কখনো তোমার দ্বারা এই বইটি লেখা হবে। তুমি তো 'হরর লিব্রি'তে ভুগছো।

কিছুটা যেনো হুলবিদ্ধ নিয়েই আমি জবাব দিইঃ আমার অসুখ এর চেয়ে আরো মারাত্মক কিছুও হতে পারে। সম্ভবত আমি ভুগছি 'হরর ক্রিভেন্ডিতে।'

—'ভালো, তোমার যদি ঐ পীড়াই হয়ে থাকে', তিনি তৎক্ষণাৎ মুখের উপর জবাব দেন— 'তুমি কি মনে করো,' 'ফ্রাংকফুটার শাইটুঙ' তোমার উপযুক্ত স্থান?' কথার পিঠে কথা বেড়ে চলে এবং আমাদের মতানৈক্য ক্রমে রূপ নেয় বিবাদে। সেদিনই আমি 'ফ্রাঙ্কফুটার শাইটুঙ' থেকে ইস্তফা দিই এবং এক হপ্তা পর এল্‌সাকে নিয়ে বার্লিনের পথে রওয়ানা করি।

অবশ্য সাংবাদিকতা ত্যাগ করার ইচ্ছা আমার ছিলো না। কারণ, লেখা আমাকে যে স্বচ্ছন্দ জীবিকা এবং আনন্দ যুগিয়েছিলো (যা সাময়িকভাবে নষ্ট করে দিয়েছিলো ওই 'বইটি') তা বাদ দিলেও মুসলিম জাহানে আবার আমার ফিরে যাওয়ার একমাত্র উপায় এই-ই ছিলো। আর মুসলিম জাহানে আমি ফিরে যেতে চাইছিলাম যে কোনো মূল্যে। কিন্তু গত চার বছরে আমি যে খ্যাতি লাভ করেছি, তাতে আমার জন্য খবরের কাগজের সংগে নতুন সংযোগ স্থাপন কঠিন ছিলো না। ফ্রাংকফুর্টারের সংগে আমার সম্পর্ক কেটে যাওয়ার পরে পরেই আমি খুবই সন্তোষজনক চুক্তি করি অন্য তিনটি সংবাদপত্রের সংগে ঃ পত্রিকাগুলি হচ্ছে— জুরিখের 'নিউজুরখা শাইটুঙ', আমস্টার্ডামের 'টেলিগ্রাফ' এবং কোলনের 'কোলনিশে শাইটুঙ'। এখন থেকে এই তিনটি পত্রিকায় একযোগে মুদ্রিত হবে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কিত আমার প্রবন্ধগুলি। ফ্রাংকফুর্টার শাইটুঙ-এর সাথে এই সংবাদপত্রগুলি তুলনীয় না হলেও ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাসমূহের অন্তর্গত ছিলো এগুলি।

সাময়িকভাবে আমি আর এল্‌সা বার্লিনে ঠিকানা গাড়ি। ওখানে আমি 'একাডেমী অব্‌

জিও-পলিটিক্স'-এ আমার ধারাবাহিক ভাষণগুলি সম্পূর্ণ করবো এবং ইসলাম বিষয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাবো, এই ছিলো আমার ইরাদা।

আমাকে আবার দেখতে পেয়ে আমার সাবেক সাহিত্যিক বন্ধুরা খুশী হলো। কিন্তু আমি যখন মধ্যপ্রাচ্য যাই তখন আমাদের সাবেক সম্পর্কের সূত্রগুলিকে যেস্থানে রেখে গিয়েছিলাম ঠিক সেই জায়গা থেকে সে সম্পর্ক আবার শুরু করা কেন যেনো আর সহজ ছিলো না। আমরা অপরিচিত হয়ে উঠেছি, আমরা আর এই বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষায় কথা বলছি না। বিশেষ করে, আমি যে ইসলাম নিয়ে মগ্ন রয়েছি সে বিষয়ে আমি আমার কোন বন্ধু থেকেই সহৃদয় কোনো উপলব্ধি পেলাম না। আমি যখন তাদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, একটি বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক ধারণা হিসাবে ইসলাম তুলনায় অন্য যে কোন ভাবাদর্শ থেকে শ্রেষ্ঠতর, তখন তারা প্রত্যেকেই, বলা যায় ব্যতিক্রম ব্যতিরেকেই, বিস্ময় বিমূঢ়তার সংগে মাথা নাড়লো। কখনো কখনো ইসলামের কোনো—না কোনো প্রস্তাবের যুক্তিবত্তা ওরা স্বীকার করলেও ওদের অধিকাংশেরই মত ছিলোঃ পুরানো ধর্মগুলি হচ্ছে অতীতের বিষয় আর আমাদের কালের দাবী হচ্ছেঃ এক নতুন 'মানবতাবাদী' দৃষ্টিভংগি। এমনকি, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সকল বৈধতা যারা এক কথায় উড়িয়ে দিতো না, তারাও এই পশ্চিমী জনসাধারণের এ মনোভাব ত্যাগ করতে কিছুতেই প্রস্তুত ছিলো না যে, জাগতিক ব্যাপারের সংগে প্রকাশ্য সম্পর্কিত হওয়ায় সেই— 'অতীন্দ্রিয়বাদ' ইসলামে নেই, মানুষ যা ধর্ম থেকে প্রত্যাশা করার অধিকার রাখে।

এ আবিষ্কারে বরং আমি তাজ্জব হই যে, ইসলামের সে দিকটিই, যা আমাকে পয়লা আকৃষ্ট করেছে, অর্থাৎ দৈহিক এবং আত্মিক এই পৃথক পৃথক কক্ষে সত্যকে ভাগ না করা এবং ঈমান লাভের জন্য যুক্তির উপর তাগিদ— তা সে-সব বুদ্ধিজীবীর হৃদয়ে অতি সামান্যই আবেদন জাগালো যারা অন্য দিক দিয়ে জীবনে যুক্তির প্রভাব সবচেয়ে বেশি বলে দাবী করতে অভ্যস্ত। কেবলমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রে এসেই ওরা ওদের খুবই-অভ্যস্ত যুক্তিবাদী ও বাস্তববাদী ভূমিকা থেকে সহজভাবেই পিছু হটে যায়। এ ব্যাপারে আমার সেই স্বল্প ক'টি বন্ধু, যারা ধর্মের প্রতি অনুরাগী এবং তারা যারা ধর্মকে জীর্ণ প্রথার বেশি কিছু ভাবতে আর রাজী নয়, তাদের মধ্যে কোনো ব্যবধানই আমি দেখতে পেলাম না।

অবশ্য ওদের সংকট কোথায় এক সময় আমি বুঝতে পারি। আমি দেখতে শুরু করলাম—যেসব মানুষ খৃশ্চান ভাবধারার পরিবেশে মানুষ হয়েছে—যে চিন্তাধারায় জোর দেওয়া হয়েছে, সকল সত্যিকার ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় নিহিত বলে অনুমিত 'অতি প্রাকৃতের উপর'—তাঁদের দৃষ্টিতে একটি প্রবল যুক্তিবাদী দৃষ্টিভংগির ধর্মের আধ্যাত্মিক মূল্য থেকে একটা বিচ্যুতি বলে মনে হয়ে থাকে। এই মনোভংগি বিশ্বাসী খৃশ্চানদের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ ছিলো না—অন্য কোনো ধর্মের সংস্পর্শে না এসে কেবল খৃস্টধর্মের সংগে ইউরোপের সুদীর্ঘ সহবাসের ফলে সংশয়বাদী ইউরোপীয়রা পর্যন্ত অবচেতনভাবে খৃশ্চীয় ধ্যান-ধারণার লেন্স দিয়ে সকল ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রতি তাকাতে শিখেছে। এবং কেবল সেই অবস্থায়ই এরা ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে 'সত্য' বলে গণ্য করে যদি এর সংগে গুপ্ত এবং বুদ্ধির অজ্ঞেয় কোনো কিছুর সামনে সভয় ঐশী ভক্তির পুলক-রোমাঞ্চ থাকে। ইসলাম সে চাহিদা

পূরণ করে নাঃ একটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক সমতলে জীবনের দৈহিক এবং আত্মিক দিকগুলির মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের উপর ইসলাম জোর দেয়। বস্তুত ইসলামের বিশ্ব–দৃষ্টি খৃশ্চীয় বিশ্ব–দৃষ্টি থেকে এতই পৃথক যে, একটির সত্যতা গ্রহণ করলে অন্যটির সত্যতা সম্পর্কে অপরিহার্যভাবেই প্রশ্ন উঠবে, কারণ খৃশ্চীয় বিশ্ব–দৃষ্টির উপরই পাশ্চাত্যের প্রায় সকল নৈতিক ধ্যান–ধারণার ভিত্তি।

আর আমার ক্ষেত্রে ব্যাপার হলো এই ঃ আমি টের পাচ্ছিলাম, আমাকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ইসলামের দিকে। কিন্তু শেষবারের মতো একটি দ্বিধা আমাকে বাধ্য করলো চূড়ান্ত অপরিবর্তনীয় পদক্ষেপটি মূলতবি রাখতে। ইসলাম গ্রহণ করার চিন্তা মনে হলো একটি সেতুতে ওঠার প্রয়াস, যে–সেতু দুটি ভিন্ন জগতের মধ্যকার শূন্যতার উপর দাঁড়িয়ে আছেঃ এত দীর্ঘ সে সেতু যে, সেতুর অপর প্রান্ত দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠার আগে এমন একবিন্দু পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে যেখান থেকে ফিরে আসার আর পথ নেই। আমি খুব ভাল করেই জানতাম—আমি যদি মুসলমান হয়ে পড়ি তাহলে যে জগতের মধ্যে আমি মানুষ হয়েছি তার সাথে আমার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলতে হবে। এর অন্য কোনো বিকল্পই আর সম্ভব ছিলো না। মুহাম্মদের বাণী সত্যি সত্যি অনুসরণ করা আর সম্পূর্ণ উল্টা ধ্যান–ধারণায় শাসিত সমাজের সাথে একই সংগে অন্তরের সম্পর্ক বজায় রেখে চলা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু 'ইসলাম কি সত্যিই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আগত বাণী—নাকি কেবলই একজন মহান অথচ ভুল–ত্রুটির অধীন মানুষের প্রজ্ঞামাত্র...?'

... ...

একদিন, ১৯২৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমি এবং এল্‌সা আমরা দু'জন সফর করছিলাম বার্লিনের ভূগর্ভস্থ রেলপথে। ওটি ছিলো একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা। আমার উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি পড়লো আমার ঠিক বিপরীতদিকে বসা পরিপাটি পোশাক পরা একজন মানুষের উপর ঃ বোঝা যাচ্ছে লোকটি একজন ধনী ব্যবসায়ী, তাঁর হাঁটুর উপর রয়েছে একটি চমৎকার ব্রীফকেস এবং ডান হাতে একটা বড় আকারের হীরার আংটি। আমার মনে এ অলস ভাবনার উদয় হলোঃ এ স্থূলকায় লোকটির চেহারা, তখনকার দিনে মধ্য ইউরোপের সর্বত্র সমৃদ্ধির যে চিত্র দেখা যেতো সেই চিত্রের মধ্যে কি চমৎকারই না মানিয়েছেঃ যে সমৃদ্ধি এ কারণে আরো বেশি পষ্ট যে, তা এসেছিলো কয়েক বছর স্থায়ী মুদ্রাস্ফীতির পরে, যখন গোটা অর্থনৈতিক জীবনই লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়েছিলো এবং কদর্য চেহারা হয়ে পড়েছিলো ব্যতিক্রমহীন। এখন প্রায় সব লোকই ভাল পোশাক পরে, খেতে পায় প্রচুর, আর এজন্যই আমার বিপরীতদিকের লোকটিকে কোনো ব্যতিক্রম মনে হলো না। কিন্তু আমি যখন তার মুখের দিকে তাকালাম, মনে হলো না একটি সুখী মুখের দিকে তাকাচ্ছি। মনে হলো, লোকটি যেনো উদ্বিগ্ন ঃ এবং কেবল উদ্বিগ্ন নয়, বরং তীব্র অসুখী; চার চোখ দুটি উদাস দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে আর মুখের কোণা যেনো যন্ত্রণায় কুঁচকানো, তবে দৈহিক যন্ত্রণায় নয়। আমি অভদ্র হতে চাইনা। এজন্য আমি আমার চোখ সরিয়ে নিই এবং তার ঠিক পরেই দেখতে পাই একটি মহিলাকে, দেখতে বেশ নাজনীন, সুন্দরী। তার মুখেও দেখা গেলো এক অদ্ভুত অসুখী অভিব্যক্তি, যেনো এমন

কিছু সে ভাবছে অথবা এমন কিছুর অভিজ্ঞতা তার হচ্ছে যা তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক। তা সত্ত্বেও তার মুখ অচঞ্চল রয়েছে, যেনো একটা স্থির হাসির মধ্যে; আমার সন্দেহ নেই মেয়েটির জন্য এ ছিলো একটি অভ্যস্ত ব্যাপার। এরপর আমি ঘুরে কম্পার্টমেন্টের অন্য সকল যাত্রীর মুখের উপর তাকাতে থাকি—ব্যতিক্রমহীনভাবে সবই সেই সব লোকের মুখ, যাদের পরণে রয়েছে মূল্যবান পোশাক, যারা খায় দায় প্রচুর ঃ আর ওদের প্রায় সকলের মধ্যেই দেখতে পেলাম গোপন দুঃখের এক অভিব্যক্তি, এতো গোপন যে, সেই মুখের মালিক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন বলেই মনে হলো।

সত্যি ভারি অদ্ভুত ব্যাপার। আমি আমার চারপাশে এর আগে আর কখনো এতোগুলি অসুখী মুখ দেখিনি, কিংবা ওদের মধ্য থেকে এই মুহূর্তে যা এতো প্রবলভাবে উচ্চারিত হচ্ছে হয়তো এর আগে আমিই কখনো তার খোঁজ করিনি। ধারণাটা এতো তীব্র হলো যে, আমি এল্‌সাকে সে সম্পর্কে বলি। এবং সেও তার চারদিকে তাকাতে লাগলো—মানুষের চেহারা পড়তে অভ্যস্ত এক চিত্রকরের সজাগ চোখ মেলে। তারপর সে বিস্মিত হয়ে মুখ ফেরালো আমার দিকে আর বললো ঃ 'তুমি ঠিকই বলেছো, ওরা সকলেই এভাবে তাকাচ্ছে যেনো জাহান্নামের কষ্ট ভোগ করছে—আমি ভেবে বিস্মিত হই ঃ ওরা নিজেরা কি জানে, ওদের ভেতর কী ঘটছে?'

আমি জানি যে, ওরা তা জানে না। —যদি জানতোই তাহলে যেভাবে ওরা জীবনের অপচয় করে চলেছে তা করতে পারতো না। বাধ্যতামূলক সত্যে বিশ্বাস না ক'রে, নিজেদের জীবন-মান উন্নত করার কামনার বাইরে জীবনের কোনো লক্ষ্য না রেখে, অধিকতরো বৈষয়িক আরাম-আয়েসের উপকরণ, অধিকতরো সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি (gadgets) এবং সম্ভবত অধিকতরো ক্ষমতা অর্জনের আশা ছাড়া অন্য কোনো আশাই না রেখে এভাবে জীবনকে বরবাদ করা সম্ভব হতো না ওদের পক্ষে—

আমরা যখন বাড়ি ফিরে এলাম হঠাৎ আমার চোখ পড়লো আমার ডেস্কের উপর, যার উপর মেলা রয়েছে একখণ্ড কুরআন যা আমি আগে পড়ছিলাম। যান্ত্রিকভাবে আমি কুরআনটি হাতে তুলে নিই তুলে রাখবার জন্য। কিন্তু আমি যখন ওটি বন্ধ করতে যাচ্ছি আমার চোখ পড়লো আমার সামনে মেলা পৃষ্ঠাটির উপর এবং আমি পড়তে শুরু করিঃ

> —তোমরা, আরো চাই, আরো বেশি চাই, এই লোভে আচ্ছন্ন হয়ে থাকো যতক্ষণ না তোমরা পৌঁছাও তোমাদের কবরে—না, এটা ঠিক নয়, তোমরা জানতে পারবে—না, ওটা ঠিক নয়, অবশ্যই জানতে পারবে তোমরা; যদি তোমরা জানতে সুনিশ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পেতে তোমরা রয়েছো জাহান্নামের মধ্যে। একসময় অবশ্য তা দেখতে পাবে নিশ্চিত দৃষ্টিতে এবং সেই দিন তোমাদের জিগ্‌গাস করা হবে তোমরা কি করেছিলে যে-অনুগ্রহ তোমাদের দান করা হয়েছিলো তা দিয়ে?

মুহূর্তের জন্য আমি নির্বাক হয়ে যাই, আমার মুখে কোনো কথা সরে না। মনে হলো বইটি আমার হাতে কাঁপছে। তারপর আমি তা তুলে দিলাম এল্‌সার হাতে—এটি পড়ো। আমরা পাতাল রেলপথে যা দেখেছিলাম একি তারই জবাব নয়?

হ্যাঁ, এটি তারই জবাবঃ এমন এক চূড়ান্ত জবাব যে অকস্মাৎ সমস্ত সন্দেহ চুরমার হয়ে

গেলো। এখন আমি উপলব্ধি করলাম সন্দেহাতীতভাবে—আমার হাতে যে কিতাবটি আমি ধরে আছি তা একটি ইলাহী প্রত্যাদিষ্ট কিতাবঃ কারণ যদিও তা মানুষের সামনে পেশ করা হয়েছিলো ১৩০০ বছরেও বেশি আগে, তবু এতে এমন কিছুর আগাম ধারণা করা হয়েছে যা কেবল আমাদের এই জটিল যান্ত্রিক, অবাস্তব কল্পনা–কবলিত জামানায়ই, সত্য হতে পারে।

লোক মানুষের সবসময়ই ছিলোঃ কিন্তু এর আগে লোভ কখনো জিনিসপত্র সংগ্রহের কেবল একটা আগ্রহকে ছাপিয়ে উঠতে পারেনি এবং এমন নেশা হয়ে উঠতে পারেনি যা অন্য সবকিছুর প্রতি দৃষ্টিকে করে দেয় ঝাপসাঃ একটি অদম্য বাসনা—অধিক পাওয়ার, অধিক করার, অধিক ফন্দি আঁটার, গতকালের চাইতে আজকে বেশি এবং আজকের চাইতে আগামীকাল বেশিঃ একটি দানব সওয়ার হয়েছে মানুষের কাঁধের উপরে এবং তাদের হৃদয়ে চাবুক কষে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এমন সব লক্ষ্যের দিকে যা ঝলমল করছে দূরে, বিদ্রূপাত্মকভাবে এবং যখনি তার কাছে পৌঁছুনো হচ্ছে তা মিলিয়ে যাচ্ছে তুচ্ছ শূন্যতায়। সবসময়ই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে—সামনে রয়েছে নতুন নতুন লক্ষ্য—আরো অধিক উজ্জ্বল, আরো অধিক প্রলোভন জাগানো লক্ষ্য, যতক্ষণ না সেগুলি দিগন্ত সীমানায় রয়েছে এবং কব্জায় আসার সংগে সংগে অনিবার্যভাবে আবার হারিয়ে যাচ্ছে নতুনতরো শূন্যতায়ঃ এবং সেই ক্ষুধা, সেই অতৃপ্ত ক্ষুধা, নিত্য–নতুন লক্ষ্যের জন্য, যা চিবিয়ে খাচ্ছে মানুষের আত্মাকেঃ না, যদি তোমরা জানতে তোমরা দেখতে পেতে সেই জাহান্নাম, যার মধ্যে তোমরা রয়েছো।—

আমি দেখতে পেলাম দূর আরবের সুদূর অতীতের কোনো মানুষের মানবিক প্রজ্ঞামাত্র এ নয়। তিনি যতো প্রজ্ঞাবানই হোন, এ রকম একজন মানুষের পক্ষে কিছুতেই আপন শক্তিতে এই বিশ শতকের নিজস্ব যন্ত্রণা আগাম দেখা সম্ভব ছিলো না। কুরআন থেকে উচ্চারিত হলো একটা কণ্ঠস্বর যা বৃহত্তর মহত্তর মুহাম্মদের কণ্ঠস্বর থেকে...।

পাঁচ

নবীর মসজিদের প্রাংগণে নেমে এসেছে অন্ধকার, যার মধ্যে এখানে ওখানে কিছু ভালো ফুটে উঠছে কেবল খিলানের থামগুলির মধ্যে লম্বা শিকলে ঝুলানো তেলের প্রদীপগুলি থেকে। শায়খ আবদুল্লাহ্ ইবনে বুলাইহিদ তাঁর বুকের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তাঁকে যে জানে না তার মনে হতে পারে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন; কিন্তু আমি জানি, তিনি আমার বর্ণনা শুনছেন গভীর তন্ময়তার সাথে এবং মানুষ ও তাদের হৃদয় সম্পর্কে তাঁর নিজের যে বিপুল অভিজ্ঞতা রয়েছে তারই নকশাটির সাথে তা মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছেন। অনেকক্ষণ পর তিনি তাঁর মাথা তোলেন এবং চোখ মেলে চান ঃ

—'এবং তারপর? তারপর তুমি কি করলেন ?'

—'যা স্বাভাবিক এবং অনিবার্য তা–ই শায়খ। আমি আমার এক মুসলিম বন্ধুকে খুঁজে বার করলাম। তিনি একজন ভারতীয় এবং সে সময়ে বার্লিনের ছোট্ট মুসলিম সমাজটির প্রধান ছিলেন তিনি। আমি তাঁকে বললামঃ আমি ইসলাম কবুল করতে চাই। তিনি আমার দিকে তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং আমি আমার ডান হাত সেই হাতে রাখলাম আর

দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে ঘোষণা করলামঃ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রসূল'[১]। কয়েক সপ্তাহ পরে আমার স্ত্রীও ইসলাম কবুল করেন।

—'এবং তোমার লোকেরা তখন কি বললো?'

—'হ্যাঁ, ওরা তা পছন্দ করেনি। আমি যখন আমার আব্বাকে জানালাম আমি মুসলমান হয়েছি, তিনি আমার চিঠির জবাব পর্যন্ত দিলেন না। কয়েকমাস পর আমার বোন আমাকে লিখলো, আমার আব্বা আমাকে মৃত বলে গণ্য করেন..তখন আমি আরেকটি চিঠি পাঠাই এবং তাঁকে এ নিশ্চয়তা দিই যে, আমার ইসলাম গ্রহণ তার প্রতি আমার মনোভাব বা তাঁর জন্য আমার ভালবাসায় কোনো পরিবর্তন আনেনি। বরং ইসলাম আমাকে আমার আব্বা-আম্মাকে সকলের উপরে ভালবাসতে ও সম্মান করতে শেখায়। কিন্তু এ চিঠিরও জবাব মিলেনি।'

—'তোমার আব্বা নিশ্চয়ই তাঁর ধর্মের প্রতি খুবই অনুরাগী...'

—'তা নয় শায়খ, তিনি তা নন এবং এটিই হচ্ছে এ কাহিনীর সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক। আমার মনে হয়, তিনি আমাকে রেনিগেড-মুর্তাদ মনে করেন, তাঁর ধর্ম থেকে ততোটা নয় (কারণ ধর্ম কখনো তেমন প্রবলভাবে তাঁকে ধরে রাখেনি) যতোটা সেই সমাজ থেকে যার মধ্যে তিনি মানুষ হয়েছেন এবং সেই সংস্কৃতি থেকে যার সাথে তিনি যুক্ত।'

—'আর, এরপর কি তাঁর সংগে তোমার কখনো দেখা হয়নি?'

—'না, আমাদের ইসলাম গ্রহণের পরপরই আমি এবং আমার স্ত্রী ইউরোপ ত্যাগ করি। ওখানে আর থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। আর কখনো ফিরে যাইনি আমি'...[২]।

---

১. ঈমান সম্পর্কে এই ঘোষণা মুসলমান হওয়ার জন্য একমাত্র আবশ্যকীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইসলামে 'রাসূল' এবং 'নবী' শব্দ দুটির একটিকে অপরটির পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় প্রধান প্রধান নবীদের ক্ষেত্রে, যাঁরা একেকটি নতুন বাণী বহন করেন, যেমন মুহাম্মদ, ঈসা, মূসা, ইবরাহীম।

২. ১৯৩৫ সনে আমাদের সম্পর্ক আবার পুনরুজ্জীবিত হয়, যখন আমার পিতা আমার ইসলাম গ্রহণের কারণগুলি শেষপর্যন্ত বুঝতে পারলেন এবং তার মর্যাদাও দিতে পারলেন, যদিও আর কখনো আমাদের সাক্ষাৎ বা দেখা হয়নি। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত আমরা নিয়মিত পত্র যোগাযোগ বজায় রাখি; ঐ বছরই নাৎসীরা আমার আব্বা ও বোনকে ভিয়েনা থেকে নির্বাসন দেয় এবং পরে তাঁরা নাৎসী বন্দী শিবিরে মারা যান।

জিহাদ

এক

আমি যখন নবীর মসজিদ থেকে বের হচ্ছি তখন একটি হাত বন্দী করলো আমার একটি হাত; আমি মাথা ঘুরিয়ে সেনুসি নেতা সিদি মুহাম্মদ আজজুবাইয়ের সদয় প্রবীণ চোখের মুকাবিলা হলাম।

—'বাবা, তোমাকে দীর্ঘ ক'মাস পরে দেখে কতো যে খুশী হয়েছি! নবীর এই আশিসপূত নগরীতে তোমার পদক্ষেপের উপর আল্লাহ্‌র আশিসপূত বর্ষিত হোক।...

মসজিদ থেকে প্রধান বাজারের দিকে যে নুড়ি বিছানো রাস্তাটি গিয়েছে আমরা ধীরে ধীরে হাতে হাত ধরে হাঁটি সেই পথে। উত্তর আফ্রিকার আরব এবং বার্‌বারেরা মাথায় পাগড়িসহ যে চৌগা পরে সেই চৌগা পরা সিদি মুহাম্মদ মদীনায় একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। এখানে তিনি বাস করছেন কয়েক বছর ধরে। আমরা যখন আগাচ্ছি তখন বহু মানুষই আমাদের পথে থামাচ্ছে তাঁকে অভিবাদন জানানোর জন্য। এই অভিবাদন কেবল তাঁর সত্তর বছর বয়সের প্রতি তাযিমের জন্য নয়, লিবিয়ার বীরোচিত আযাদী সংগ্রামের একজন নেতা হিসাবে তাঁর খ্যাতির জন্যও।

—'বাবা, আমি তোমাকে জানাতে চাই, সৈয়দ আহমদ মদীনায় রয়েছেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না। তোমাকে দেখলে তিনি খুবই খুশি হবেন। তুমি কতদিন থাকবে এখানে?'

—'কেবল আসছে পরশু পর্যন্ত,' আমি জবাব দিই, 'কিন্তু সৈয়দ আহমদকে না দেখে আমি নিশ্চয়ই যাবো না। চলুন, আমরা এখুনি তাঁর কাছে যাই।'

—গোটা আরবে এমন কোনো লোক নেই যাকে আমি সৈয়দ আহমদের চেয়ে বেশি ভালোবাসিঃ কারণ, তিনি যে-রকম সম্পূর্ণভাবে, যে-রকম নিঃস্বার্থভাবে একটি আদর্শের জন্য নিজেকে কুরবান করেছেন সে রকম কুরবান করেছে এমন কোনো মানুষই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি একজন পণ্ডিত এবং যোদ্ধা। তিনি তাঁর গোটা জীবনকে নিয়োজিত করেছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক পুনরুজ্জীবনের জন্য এবং তাঁর রাজনৈতিক আযাদীর সংগ্রামে—কারণ তিনি ভালোই জানেন, এর একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

কতো স্পষ্টই না আমার মনে পড়ছে বহু বছর আগে মক্কায় সৈয়দ আহমদের সাথে আমার প্রথম মুলাকাতের কথা...

পবিত্র নগরীর উত্তরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আবু কুবাইস পাহাড়—বহু প্রাচীন উপকথা ও ইতিকথার কেন্দ্র। এছাড়া, যেখানে মুকুটের মতো রয়েছে দুটি নিচু মীনার সম্বলিত একটি ছোট্ট চুনকাম করা মসজিদ, সেখান থেকে নীচের দিকে তাকালে একটি চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়ে মক্কা উপত্যকার, যার ঠিক তলদেশেই রয়েছে বর্গাকার কা'বার মসজিদ এবং বর্ণাঢ্য, ইতস্তত ছড়ানো রঙ্গশালার মতো ঘরবাড়ি, যা সকল দিকে পাহাড়ের নগ্ন শিলাময় ঢালু বেয়ে যেনো উঠে আসছে উপরের দিকে। আবু কুবাইস পাহাড়ের চূড়ার সামান্য নীচেই রয়েছে এক সারি পাথুরে দালান, যা সংকীর্ণ সমতল খাঁজ থেকে ঝুলছে এক গুচ্ছ ঈগলের

নীড়ের মতোঃ সেনুসি ভ্রাতৃ–সংঘের মক্কী কেন্দ্র। এখানে যে বৃদ্ধ লোকটির সাথে আমি মুলাকাত করি, তাঁর নাম সারা মুসলিম জগতে মশহুরঃ মহান সেনুসি সৈয়দ আহমদ ঃ এখানে তিনি একজন নির্বাসিত ব্যক্তি। দীর্ঘ ৩০ বছরের সংগ্রাম এবং কৃষ্ণসাগর ও ইয়েমেনের পর্বতগুলির মধ্যবর্তী স্থানে তাঁর সাত বছর ছুটাছুটির পর সাইরেনিকায় তাঁর নিজের ফিরে আসার সকল পথ দেওয়া হয়েছে বন্ধ করে। আর কোনো নামই উত্তর আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শাসকদের অতো বিনিদ্র রজনীর কারণ ছিলো না। এমন কি, উনিশ শতকের আল্‌জিরিয়ার মহান আবদুল কা'দিরের নামও নয়, কিংবা মরক্কোর আবদুল করিমের নাম পর্যন্ত নয়, যিনি ফরাসী শাসকদের বুকের ভেতরে একটা প্রচণ্ড কাঁটার মতো ছিলেন অধিকতরো সাম্প্রতিক- কালে। এই নামগুলি মুসলমানদের কাছে যতো অবিস্মরণীয়ই হোক, এঁদের কেবল রাজনৈতিক তাৎপর্যই ছিলো। কিন্তু সৈয়দ আহমদের নেতৃত্ব এবং তাঁর তরীকা বহু বছর ধরে কাজ করেছে একটা বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি হিসাবে।

তাঁর সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন আমার জাভার বন্ধু হাজী আজোস সালিম। ইন্দোনেশিয়াতে রাজনৈতিক আযাদীর জন্য যে লড়াই চলছিলো তাতে একজন নেতার মর্যাদা ছিলো হাজী সালিমের। তিনি মক্কায় এসেছিলেন হজ্জ করতে। সৈয়দ আহমদ যখন শুনলেন আমি সম্প্রতি ইসলাম কবুল করেছি তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে নরম যবানে বললেন ঃ

—'আমার তরুণ ভাই, তোমাকে খোশ আম্‌দেদ তোমার ভাইদের মধ্যে...।'

ধর্ম এবং আযাদীর জন্য আপোসহীন যোদ্ধা, যিনি আগিয়ে চলেছেন বার্ধক্যের দিকে, তাঁর সুন্দর ভ্রূ–জোড়ার উপর খোদিত দেখতে পেলাম দুঃখ–যন্ত্রণার ছাপ। সামান্য সাদা দাড়ি এবং যন্ত্রণা–চিহ্নিত গভীর রেখার মধ্যে ইন্দ্রিয়গতভাবে সুচতুর মুখের অধিকারী সাঈদ আহমদের মুখমণ্ডল ছিলো ক্লান্ত। চোখের পাতা একান্তভাবেই ঝুলে আছে চোখের উপর, যার জন্য মনে হয় চোখ দুটি যেনো ঘুমে ঢুলছে। তাঁর কণ্ঠস্বরের ধ্বনিও দুঃখ–বেদনায় একই রকম মোলায়েম ও ভারাক্রান্ত। কিন্তু কখনো কখনো তার মধ্যে হঠাৎ উদ্দীপনা জেগে ওঠে; তখন চোখ দুটি তাঁর হয়ে ওঠে জ্বলজ্বলে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয় প্রসাদগুণ, সংগীতের কম্পন এবং তাঁর সাদা চৌগার ভাঁজের ভেতর থেকে উর্ধ্বে উত্থিত হয় একটি বাহু, ঈগলের ডানার মতো!

তিনি এমন একটি ভাবাদর্শ, এমন একটি মিশনের উত্তরাধিকারী যা কার্যে পরিণত হলে হয়তো বা আধুনিক ইসলামে একটি পুনরুজ্জীবন ঘটতো ঃ বয়সের ক্ষয় এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও এবং তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য বানচাল হলেও উত্তর আফ্রিকার এই মহান বীর তাঁর উজ্জ্বল দীপ্তি হারাননি। তাঁর ছিলো সেই অধিকার হতাশ না হওয়ার। তিনি জানতেন, ইসলামের সত্যিকার মর্মানুযায়ী ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের আকাংখা—যা সেনুসি আন্দোলনের লক্ষ্য মুসলিম জাতিগুলির হৃদয় থেকে কখনো তা মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

... ...

সাঈদ আহমদের দাদা ছিলেন মহান আলজিরীয় পণ্ডিত মুহাম্মদ ইব্‌নে আলী আস–সেনুসি, (উপনামটি বানু সেনুস গোত্র থেকে গৃহীত, যে গোত্রে জন্ম হয়েছিলো তাঁর) যিনি

এই শতকের প্রথমার্ধে স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি ইসলামী ভ্রাতৃসমাজের যা একদিন সত্যিকার এক ইসলামী কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দেবে। বহু বছর বহু আরব দেশে ঘুরে বেড়ানো ও পড়াশোনার পর মুহাম্মদ ইব্‌নে আলী সেনুসি তরীকার প্রথম 'জাভিয়া' বা মোকাম স্থাপন করেন মক্কায় আবু কুবাইস পাহাড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি হেজাজের বেদুঈনদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক অনুসারী পেয়ে যান। অবশ্য তিনি মক্কায় বসে থাকলেন না, তিনি ফিরে গেলেন উত্তর আফ্রিকায়, শেষপর্যন্ত সাইরেনিকা ও মিসরের মধ্যবর্তী মরুভূমিতে অবস্থিত যাগবুব্ নামক এক মরূদ্যানে, স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। ওখান থেকেই তাঁর বাণী বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়লো সারা লিবিয়াতে এবং লিবিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে। তিনি যখন ১৮৫৯ সালে ইন্তেকাল করেন, তখন সেনুসিদের (এই তরীকার সকল লোকই এই নামে পরিচিত হয়ে ওঠে) নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এক বিশাল রাষ্ট্র—ভূমধ্যসাগরের তীর থেকে শুরু করে বিষুব অঞ্চলের আফ্রিকার গভীরে এবং আলজিরীয় সাহারার তুয়ারেগ নামক অঞ্চল অবধি।

অবশ্য 'স্টেট' বা রাষ্ট্র শব্দটি দ্বারা এই অনুপম সৃষ্টির নিখুঁত বর্ণনা হয় না, কারণ মহান সেনুসি কখনো তাঁর নিজের জন্য কিংবা তাঁর বংশধরদের জন্য একটি ব্যক্তিগত শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চাননি; তাঁর লক্ষ্য ছিলো ইসলামের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য একটি সাংগঠনিক বুনিয়াদ তৈরি করা। তাঁর এই লক্ষ্যের স্বার্থেই তিনি ঐ এলাকার চিরাচরিত গোত্রীয় কাঠামো ভেঙে ফেলার জন্য কিছুই করলেন না। এমনকি, লিবিয়ার উপর তুর্কী সুলতানের নামমাত্র প্রভুত্বকেও তিনি চ্যালেঞ্জ করেননি—তুর্কীর সুলতানকেই তিনি ইসলামের খলীফা বলে মেনে নিতে থাকেন—তিনি তাঁর সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত করলেন বেদুঈনদের ইসলামের মূল শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে, যা থেকে ওরা দূরে সরে গিয়েছিলো অতীতে, এবং তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সেই উপলব্ধি আনতে যা ছিলো কুরআনের লক্ষ্য, কিন্তু বহু শতকের গোত্রীয় দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের ফলে লোপ পেয়েছিলো বহুলাংশে। উত্তর আফ্রিকার সর্বত্র যে বিপুল সংখ্যক 'জাভিয়া' গড়ে উঠলো সেনুসিয়া সেগুলি থেকে তাদের বাণী বহন করে নিয়ে গেলো দূরতম অঞ্চলের গোত্রগুলির কাছে এবং কয়েক যুগের মধ্যেই প্রায় এক অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এনে দিলো আরব ও বারবার, উভয়ের মধ্যে। ধীরে ধীরে অতীতের আন্তগোত্রীয় অরাজকতার অবসান ঘটলো এবং মরুভূমির এককালের উচ্ছৃংখল যোদ্ধারা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলো পারস্পরিক সাহায্যের আন্তরিকতায়, এতোকাল তাদের নিকট যা অপরিচিত। জাভিয়াগুলিতে তাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পেলো—কেবল ইসলামী শিক্ষা নয়, বহু ব্যবহারিক শিল্প এবং হাতের কাজেও, যা আগে নিন্দার চোখে দেখতো যুদ্ধবাজ যাযাবরেরা। শত শত বছর ধরে যেসব এলাকা ছিলো বন্ধ্যা সেসব অঞ্চলে আরো বেশি এবং আরো উন্নত ধরনের কূয়া খনন করতে ওদের উৎসাহিত করা হলো, আর সেনুসি পরিচালনায় ধূসর মরুভূমির বুকে সমৃদ্ধিশালী বসতি গড়ে উঠতে লাগলো, দূরে দূরে, একেকটি বিন্দুর মতো। তেজারতিকে উৎসাহ দেওয়া হলো এবং সেনুসি ব্যবস্থার ফলে যে শান্তি-শৃংখলা এলো তার ফলে সে-সব অঞ্চলেও সফর সম্ভব হলো যেখানে অতীতে কোনো কাফেলার পক্ষেই আগানো ছিলো

অসম্ভব লুণ্ঠিত না হয়ে। সংক্ষেপে, এই তরীকার প্রভাব সভ্যতা এবং প্রগতির জন্য এক প্রচণ্ড প্রেরণা হয়ে দাঁড়ালো; অন্যদিকে, ওদের অনঢ় ধর্মনিষ্ঠা, পৃথিবীর এ অংশের লোকদের অতীতে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে এই নতুন সমাজের নৈতিক মানকে তা থেকে উন্নীত করলো অনেক উপরে। প্রায় প্রত্যেকটি মানুষ, গোত্র এবং গোত্রের সর্দারেরা স্বেচ্ছায় মেনে নিলো মহান সেনুসির রূহানী নেতৃত্ব; এমনকি, লিবিয়ার উপকূলভাগের শহরগুলির তুর্কী কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত দেখতে পেলো, এ তরীকার নৈতিক নেতৃত্বের ফলে তাদের পক্ষে এককালের 'দুর্ধর্ষ' বেদুঈন গোত্রগুলির সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ এখন অনেক বেশি সহজ হয়েছে।

এভাবে, একদিকে যেমন এ তরীকা তার প্রয়াসকে কেন্দ্রীভূত করলো স্থানীয় লোকদের ধাপে ধাপে পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে, অন্যদিকে কালক্রমে এর প্রভাবকে বাস্তব সরকার পরিচালন-ক্ষমতা থেকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। সেনুসি তরীকার এই ক্ষমতার ভিত্তি ছিলো ধর্মীয় ব্যাপারে সরল বেদুঈন এবং উত্তর আফ্রিকার তুয়ারেগদের কিছুকাল আগেকার বন্ধ্যা অনুষ্ঠান-সর্বস্বতা থেকে মুক্ত করে তাদের জাগ্রত করার সামর্থ্য, ইসলামের মর্মবাণীর সাথে সত্যিকার সংগতি রেখে জীবন-যাপন করবার বাসনায় ওদের অন্তর কানায় কানায় ভরে দেবার ক্ষমতা এবং ওদের মধ্যে, ওরা সকলেই যে আযাদী, মানবিক মর্যাদা ও ভ্রাতৃত্বের জন্য কাজ করছে এ উপলব্ধি সৃষ্টির কৃতিত্ব। রাসূলের সময় থেকে মুসলিম বিশ্বের কোথাও এমন ব্যাপক আকারের কোনো আন্দোলন আর দেখা যায়নি, যা এই সেনুসি আন্দোলনের মতো ইসলামী জীবন পদ্ধতির এতোটা নিকট, এতোটা কাছাকাছি পৌঁছেছিলো!

এই শান্তিপূর্ণ যুগ উনিশ শতকের শেষ কোয়ার্টারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো যখন ফ্রান্স দক্ষিণদিকে আগাতে শুরু করলো আলজিরিয়া থেকে বিষুব আফ্রিকার দিকে, আর ধাপে ধাপে দখল করতে লাগলো সেসব অঞ্চল, যা আগে স্বাধীন ছিলো এ তরীকার নেতৃত্বে। ওদের এই আযাদী রক্ষা করতে গিয়ে আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ আল মাহ্‌দী তরবারী ধারণ করতে বাধ্য হন—তাঁর পক্ষে সে তরবারী আর কখনো সংবরণ করা সম্ভব হয়নি। এই দীর্ঘ সংগ্রাম ছিলো সত্যিকার ইসলামী 'জিহাদ', আত্মরক্ষার জন্য এক যুদ্ধ, যার বর্ণনা করা হয়েছে কুরআনে এভাবেঃ

> আল্লাহ্‌র পথে তোমরা সংগ্রাম করো তাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তোমাদের বিরুদ্ধে; কিন্তু তোমরা নিজেরা হয়ো না আগ্রাসনকারী, কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আগ্রাসনকারীদের পছন্দ করেন না...যুদ্ধ করো তাদের বিরুদ্ধে যতক্ষণ না অত্যাচার নির্মূল হয়েছে এবং সকল মানুষ অবাধে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারছে। কিন্তু ওরা যদি বিরত হয়, বন্ধ করতে হবে সকল শত্রুতা...।

কিন্তু ফরাসীরা ক্ষান্ত হয়নি। ওরা ওদের বেয়নেটের মাথায় ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ঝাণ্ডা বহন করে নিয়ে গেলো গভীর হতে আরো গভীরে—মুসলিম দেশগুলির ভেতরে।

মুহাম্মদ আল্ মাহ্‌দী যখন ইন্তেকাল করলেন ১৯০২ সালে; তখন তাঁর ভাতিজা সৈয়দ আহমদ তাঁর স্থলে এই তরীকার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। উনিশ বছর বয়স থেকে, তাঁর চাচার জীবৎকালে এবং পরে যখন তিনি নিজেই হলেন মহান সেনুসি, একটানা তিনি যুদ্ধ করে

চললেন, এখন যাকে ফরাসী বিষুব আফ্রিকা বলা হয়, সে অঞ্চলে, ফরাসী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। ইতালীয়ানরা যখন ১৯১১ সনে ত্রিপলীতানিয়া এবং সাইরেনিকা অবরোধ করে তখন তাঁকে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয় দুই ফ্রন্টে। এই নতুন এবং অধিকতরো অব্যবহিত চাপ তাঁকে তাঁর প্রধান মনোযোগ উত্তর দিকে ফেরাতে বাধ্য করলো। তুর্কীদের সংগে পাশাপাশি এবং পরে তুর্কী কর্তৃক লিবিয়া পরিত্যক্ত হলে একাই সৈয়দ আহমদ এবং তাঁর সেনুসি 'মুজাহিদীন'—এই নামেই এই যোদ্ধারা অভিহিত করতো নিজেদেরকে—সাফল্যের সংগে যুদ্ধ পরিচালনা করেন হানাদারদের বিরুদ্ধে—ইতালীয়রা, তাদের উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র আর বিপুলতরো সংখ্যা সত্ত্বেও মাত্র উপকূলের কয়েকটি শহরেই কোনো রকমে তাদের পা রাখতে সক্ষম হলো!

ব্রিটিশ শক্তি তখন মজবুত হয়ে আসন গেড়েছে মিসরে! উত্তর আফ্রিকার অভ্যন্তরভাগে ইতালীয়দের ক্ষমতা বিস্তার করতে দেখে ওরা পষ্টতই তেমনটি উদ্বিগ্ন ছিলো না। এ সব কারণে, সে সময় ব্রিটিশ শক্তি সেনুসিদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলো না। এই নিরপেক্ষ মনোভাব সেনুসি তরীকার জন্য ছিলো পরম গুরুত্বপূর্ণ, কারণ 'মুজাহিদীনে'র সমস্ত রসদ আসতো মিসর থেকে, যেখানে প্রায় গোটা জনগোষ্ঠীই ছিলো তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এটা খুবই সম্ভাব্য মনে হয় যে, ব্রিটেনের এই নিরপেক্ষতার ফলে শেষপর্যন্ত সেনুসিয়া সাইরেনিকা থেকে ইতালীয়দের সম্পূর্ণভাবে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হতো। কিন্তু ১৯১৫ সনে তুরস্ক মহাযুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে অংশ গ্রহণ করে এবং ইসলামের খলীফা হিসাবে উসমানী সুলতান মহান সেনুসিকে আহ্বান জানালেন মিসরে ব্রিটিশ শক্তির উপর আক্রমণ চালিয়ে তুর্কীদের সাহায্য করতে। যেহেতু ব্রিটিশ সরকার মিসরে তাদের অধিকারের পশ্চাৎভাগের নিরাপত্তার জন্য অন্য সকল সময়ের চাইতে স্বভাবতই অধিকতর ব্যগ্র ছিলো সে কারণে তারা সৈয়দ আহমদকে নিরপেক্ষ থাকার জন্য অনুরোধ করে। এই নিরপেক্ষতার বিনিময়ে ওরা প্রস্তুত ছিলো লিবিয়ার সেনুসি তরীকাকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিতে—এমনকি, পশ্চিমাঞ্চলের মরুভূমির কিছু সংখ্যক মিসরীয় ওয়েসিসও সেনুসিদের হাতে ছেড়ে দিতে ওরা তৈরি ছিলো।

সৈয়দ আহমদ যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ করতেন, তাহলে কাণ্ডজ্ঞান যার নির্দেশ দেয় দ্ব্যর্থহীনভাবে, তিনি কেবল তারই অনুসরণ করতেন। তুরস্কের প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো আনুগত্য ছিলো না; কারণ এই তুরস্কই কয়েক বছর আগে লিবিয়াকে লিখে দিয়ে দিয়েছিলো ইতালীর হাতে, যার জন্য একা সানুসিকেই দাঁড়াতে হলো ইতালীর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য। ব্রিটিশ শক্তি সানুসির বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কোনো কাজই করেনি, বরং তাদের সুযোগ দিয়েছিলো মিসর থেকে রসদ পাবার, আর মিসরই ছিলো তাদের রসদ পাওয়ার একমাত্র উপায়। অধিকন্তু বার্লিনের মন্ত্রণায় উসমানী সুলতান যে 'জিহাদ' ঘোষণা করেছিলেন তা নিশ্চয়ই কুরআনে লিপিবদ্ধ শর্তাবলী পূরণ করেনি। আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করছিলো না তুর্কীরা, বরং ওরা এক অমুসলিম শক্তির সাথে আগ্রাসনী যুদ্ধে হাত মিলিয়েছিলো। তাই ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিবেচনা সমভাবে মহান সেনুসিকে, কেবল একটিমাত্র পদক্ষেপেরই দিকে আঙুলি নির্দেশ করে ঃ যে যুদ্ধ তাঁর নিজের যুদ্ধ নয় তা থেকে দূরে সরে থাকা। সবচেয়ে প্রভাবশালী সেনুসি নেতাদের কয়েকজন—আমার বন্ধু তিনি সিদি মুহাম্মদ আজ্‌জুবাই ছিলেন

তাঁদের একজন—সৈয়দ আহমদকে নিরপেক্ষ থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইসলামের দুর্বল খলীফাকে রক্ষা করার অত্যুচ্চ অথচ অবাস্তব আকাংখাই প্রবল হয়ে দাঁড়ালো যুক্তির নির্দেশের উপর এবং তাঁকে একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিতে করলো প্ররোচিত। তিনি নিজেকে তুর্কীর পক্ষে বলে ঘোষণা করেন এবং পশ্চিমের মরুভূমিতে ব্রিটিশ শক্তিকে আক্রমণ করে বসেন।

বিবেকের এই দ্বন্দ্ব এবং ঘটনাক্রমে তার পরিণতি সৈয়দ আহমদের বেলায় অধিকতরো করুণ হয়ে উঠলো—কারণ তাঁর ক্ষেত্রে, এ কেবল ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের প্রশ্ন ছিলো না, বরং এতে করে সম্ভবত অপূরণীয় ক্ষতিসাধিত হলো তাঁর সমগ্র জীবনের এবং তাঁর আগের দুই পুরুষের, সকল সেনুসির জীবনের মহৎ লক্ষ্যটিরই। আমি তাঁকে জানি বলেই আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, তাঁর এ কাজের পেছনে যে উদ্দেশ্য ছিলো, তা ছিলো চূড়ান্তভাবেই স্বার্থলেশশূন্য—মুসলিম জাহানের সংহতি রক্ষা করার বাসনাই ছিলো তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু এ ব্যাপারেও আমার সন্দেহ সামান্যই যে, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর পক্ষে এর চেয়ে খারাপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কখনো সম্ভব ছিলো না। ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে তিনি কুরবানী দিয়েছিলেন সেনুসি তরীকার গোটা ভবিষ্যতকেই—সে সময়ে তা পুরাপুরি উপলব্ধি না ক'রে।

তখন থেকেই তিনি বাধ্য হলেন তিনটি ফ্রন্টে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে। উত্তরে ইতালীয়দের বিরুদ্ধে, দক্ষিণ-পশ্চিমে ফরাসীদের বিরুদ্ধে এবং পূর্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে। শুরুর দিকে তিনি কিছু কিছু সাফল্য অর্জন করেন। সুয়েজ খাল অভিমুখে জার্মান-তুর্কীর অগ্রাভিযানে কোণঠাসা হয়ে ব্রিটিশ শক্তি পশ্চিমের মরুভূমির ওয়েসিসগুলি থেকে সরে পড়লে সৈয়দ আহমদ সংগে সংগেই সেগুলি দখল করে নেন। মুহাম্মদ আজ্‌জুবাইর নেতৃত্বে (যিনি তাঁর প্রজ্ঞাবশত এত তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন এই চেষ্টার) উটের উপর সওয়ার ধাবমান ফৌজের বিভিন্ন ব্যূহ ঢুকে পড়লো কায়রোর একেবারে আশেপাশে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই যুদ্ধের গতি বদলে গেলো আকস্মিকভাবে ঃ জার্মান-তুর্কী বাহিনীর ক্ষিপ্র অগ্রাভিযান ঠেকিয়ে দেওয়া হলো সিনাই উপত্যকায় এবং অগ্রাভিযান রূপ নিলো পশ্চাদ-অপসরণে। কিছু পরেই পশ্চিমের মরুভূমিতে ব্রিটিশ পাল্টা আক্রমণ করে সেনুসি ফৌজকে, সীমান্ত অঞ্চলের মরূদ্যান এবং কূপগুলি দখল করে নেয়, আর এমনিভাবে 'মুজাহিদীনে'র রসদ পাবার একমাত্র পথটিকে দেয় কেটে। সাইরেনিকার অভ্যন্তরভাগ একা সক্ষম ছিলো না জীবন-মরণ যুদ্ধে লিপ্ত জনগোষ্ঠীকে রসদ যুগিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে, আর যে স্বল্প ক'টি জার্মান ও অস্ট্রীয় সাবমেরিন অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ এনে পৌঁছালো, তারাও নামমাত্র সাহায্যের বেশি কিছু নিয়ে এলো না।

১৯১৭ সনে সৈয়দ আহমদ তাঁর তুর্কী উপদেষ্টাদের পরামর্শে সাবমেরিনে করে ইস্তাম্বুল যান অধিকতরো কার্যকরী সাহায্য-সমর্থনের ব্যবস্থা করার জন্য। কিন্তু রওনা করার আগেই সাইরেনিকায় তিনি তরীকার নেতৃত্ব দিয়ে যান তাঁর চাচাতো ভাই সৈয়দ মুহাম্মদ আল্ ইদরিসকে।* প্রকৃতির দিক দিয়ে সৈয়দ আহমদের চেয়ে অধিকতরো আপোসকামী ইদ্‌রিস কাল বিলম্ব না করেই ব্রিটিশ এবং ইতালীয়দের সাথে সন্ধি করার প্রয়াস পান। ব্রিটিশেরা তো শুরু থেকেই সেনুসিদের সংগে এই সংঘর্ষ না-পছন্দ করেছে,

* ১৯৫২ সাল থেকে লিবিয়ার বাদশাহ্।

কাজেই ওরা দ্বিধা না করে সন্ধি করতে ইতালী সরকার সৈয়দ ইদরিসকে 'সেনুসিদের আমীর' বলে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দান করে। ইদরিস ১৯২২ সন পর্যন্ত সাইরেনিকার অভ্যন্তরভাগে এক টলটলায়মান আধা-স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হন। কিন্তু যখন স্পষ্ট হয়ে উঠলো, ইতালীয়রা আসলে তাদের চুক্তি মেনে চলতে চায়নি, বরং গোটা দেশটিকেই ওদের শাসনের আওতায় আনার জন্য বদ্ধপরিকর, তখন সৈয়দ ইদরিস তার প্রতিবাদে ১৯২৩ ইংরেজির শুরুর দিকে মিসর ত্যাগ করেন—একজন বিশ্বস্ত, বহুদিনের অনুসারী উমর আল্ মুখতারের হাতে সেনুসিদের নেতৃত্ব তুলে দিয়ে। এর পরেই ঘটে প্রত্যাশিত সন্ধি-ভংগ এবং সাইরেনিকার যুদ্ধ আবার শুরু হয়ে যায়।

এদিকে তুরস্কে সৈয়দ আহমদ হতাশার পর হতাশার সম্মুখীন হতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো, তাঁর উদ্দেশ্য হাসিলের সাথে সাথে তিনি সাইরেনিকায় ফিরে আসবেন। কিন্তু সে উদ্দেশ্য কখনো হাসিল হলো না, কারণ তিনি যেই ইস্তাম্বুল ঢুকলেন, অমনি বিচিত্র-সব ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেলো, যার ফলে তিনি তাঁর প্রত্যাবর্তন স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেন হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস। তাঁর কাছে এ প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠলো ঃ সুলতানকে যারা ঘিরে আছে তারা সত্যি চায় না যে, সেনুসিরা সফল হোক, বিজয়ী হোক। তুর্কীদের এ আশংকা বরাবরকার—পাছে নবজাগ্রত আরবেরা মুসলিম জাহানে আবার তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে! সেনুসিদের বিজয়ে অনিবার্যভাবেই ঘোষিত হবে এ জাতীয় আরব পুনর্জাগরণের কথা এবং মহান সেনুসিকে—তুরস্কেও যাঁর খ্যাতি অনেকটা রূপকথার মতোই—করে তুলবে খিলাফতের সন্দেহাতীত উত্তরাধিকারী। তাঁর নিজের যে এ ধরনের কোনো উচ্চাকাংখাই নেই তাতেও তুরস্কের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারীদের-সন্দেহ দূর হলো না—এবং যদিও তাঁর মর্যাদার উপযোগী পরম সম্মান এবং সকল সম্মানই তাঁকে দেওয়া হলো তবু বিনয়ের সংগে অথচ কার্যকরীভাবেই তুরস্কে আটক করা হলো সৈয়দ আহমদকে। ১৯১৮ সনে উসমানী খিলাফত ভেঙে পড়লে এবং তারপর মিত্র শক্তি ইস্তাম্বুল দখল করে নিলে তাঁর অলীক আশার মৃত্যু-ঘণ্টা বেজে উঠলো এবং যুগপৎ তাঁর জন্য সাইরেনিকার সকল দরোজা বন্ধ হয়ে গেলো।

কিন্তু মুসলিম সংহতির জন্য উদ্দাম প্রেরণা সৈয়দ আহমদকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দিলো না। মিত্র শক্তি যখন ইস্তাম্বুলে অবতরণ করছে তখন তিনি সীমান্ত পার হয়ে গিয়ে পৌঁছুলেন এশিয়া মাইনরে কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য...তখনো তিনি কেবল মোস্তফা কামাল নামে পরিচিত—যিনি সবেমাত্র তুর্কী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করেছেন আনাতোলিয়ার অভ্যন্তরে।

মনে রাখতে হবে, শুরুতে কামালের তুর্কীর বীরোচিত সংগ্রামে ছিলো ইসলামী সংগ্রামেরই লক্ষণ, আর সেই ভয়ংকর দিনগুলিতে কেবলমাত্র ধর্মীয় উদ্দীপনাই তুর্কী জাতিকে দিয়েছিলো বহু গুণে প্রবল গ্রীক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সামর্থ্য, যে গ্রীক শক্তিকে মিত্র শক্তি মদদ যুগিয়েছিলো তাদের সমস্ত সাহায্য-সম্ভার দিয়ে।

তুর্কীর লক্ষ্য হাসিলের স্বার্থে সৈয়দ আহমদ তাঁর মহৎ রূহানী ও নৈতিক ক্ষমতা নিয়োজিত করে অবিশ্রান্তভাবে ছুটাছুটি করতে লাগলেন আনাতোলিয়ার বিভিন্ন শহরে এবং গাঁয়ে, আর

ডাক দিলেন জনসাধারণকে 'গাজী' বা 'ধর্মের রক্ষক' মোস্তফা কামালকে সমর্থন করতে। আনাতোলিয়ার সরল চাষীদের মধ্যে কামালী আন্দোলনের সাফল্যে মহান সেনুসির এ প্রয়াসের এবং তাঁর সংগে, তার নামের দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্যের অবদান অপরিমেয়; কারণ এ সব সরল চাষীর কাছে জাতীয়তাবাদী শ্লোগানের কোন অর্থই ছিলো না; অথচ ওরা যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস করে এসেছে ইসলামের জন্য তাদের জান কুরবান করা তাদের জন্য এক গৌরবের বিষয়।

কিন্তু মহান সেনুসি এখানেও আবার তাঁর বিচারে ভুল করে বসলেন—অবশ্য তুর্কী জনসাধারণের ক্ষেত্রে নয়, কারণ ওদের ধর্মীয় উদ্দীপনাই ওদের চেয়ে বহু গুণে শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে ওদের করেছিলো বিজয়ী। সেনুসি ভুল করলেন, তুর্কী জনগোষ্ঠীর নেতার মতলব সম্পর্কে। কারণ 'গাজী'র বিজয় অর্জনের সংগে সংগেই তাঁর কাছে পষ্ট হয়ে উঠলো ঃ তাঁর আসল মতলব এবং তাঁর জাতির মধ্যে যে প্রত্যাশা সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দুয়ের মধ্যে তফাত বিপুল। আতাতুর্ক পুনরুজ্জীবিত এবং নতুন জীবনী-শক্তিতে সঞ্জীবিত ইসলামের উপর তাঁর সমাজ-বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন না ক'রে ধর্মের আত্মিক শক্তি বর্জন (এককভাবেই যে শক্তি তাঁকে এনে দিয়েছিলো বিজয়) এবং সম্পূর্ণ অনাবশ্যকভাবে সকল ইসলামী মূল্যবোধ পরিহারকেই করলেন তাঁর সংস্কারের ভিত্তি—এমনকি, আতাতুর্কের দৃষ্টিকোণের বিচারেও—অনাবশ্যকভাবে। কারণ তিনি সহজেই পারতেন তাঁর জাতির প্রচন্ড ধর্মীয় উৎসাহকে সংহত করে প্রগতিমুখী একটি সক্রিয় উদ্যোগ সৃষ্টির জন্য কাজে লাগাতে। এজন্য, যা কিছু ওদের সংস্কৃতিকে রূপ দিয়েছে আর ওদের করে তুলেছে এক মহৎ জাতি, সে-সব থেকে ওদের সমূলে উৎপাটিত না ক'রেই তিনি তা করতে পারতেন।

আতাতুর্কের ইসলাম-বিরোধী বিভিন্ন সংস্কারে চরম হতাশ হয়ে সৈয়দ আহমদ তুরস্কে সকল রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং অবশেষে ১৯২৩ সনে চলে গেলেন দামেশকে—সেখানে আতাতুর্কের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ পলিসির বিরোধী হলেও—তিনি আবার মুসলিম সংহতির লক্ষ্যে তুরস্কের সংগে মিলিত হবার জন্য সিরীয়দের বোঝাবার চেষ্টা করেন। স্বভাবতই ফরাসী ম্যান্ডেটরী সরকার তাঁকে চরম অবিশ্বাসের চোখে দেখতে শুরু করে। ১৯২৪ সনের দিকে তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা যখন জানতে পারলেন তাঁর গ্রেফতারী আসন্ন, তখন তিনি একটি মোটর গাড়িতে করে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পৌছুলেন গিয়ে নযদ সীমান্তে আর সেখান থেকে রওয়ানা হলেন মক্কা, যেখানে আন্তরিকতার সংগে তাঁকে গ্রহণ করলেন বাদশা ইব্‌নে সউদ।

দুই

—'আর 'মুজাহিদীনে'র কাজকর্ম কেমন চলছে, হে সিদি মুহাম্মদ?' আমি জিগ্‌গাস করি, কারণ প্রায় এক বছর হলো আমি কোনো খবর পাচ্ছি না সাইরেনিকা থেকে।

সিদি মুহাম্মদ আজ্‌জুবাই-এর গোল সাদা দাড়ি শোভিত মুখখানা কালো হয়ে ওঠেঃ 'খবর ভালো নয় বাবা। যুদ্ধ শেষ হয়েছে কয়েক মাস আগে। 'মুজাহিদীন' ভেঙে পড়েছে। ওদের শেষ বুলেটও খরচ হয়ে গেছে। এখন আমাদের হতভাগা জাত এবং ওদের উৎপীড়কদের কহরের মাঝখানে আছে কেবল আল্লাহ্‌র রহমত....'

—'আর সাইয়িদ ইদ্‌রিসের খবর কি?'

—'সাইয়িদ ইদ্‌রিস?' দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দেন সিদি মুহাম্মদ, 'সাইয়িদ ইদ্‌রিস এখনো আছেন মিসরে, নির্বল প্রতীক্ষারত—কিসের প্রতীক্ষা—খুবই একজন ভাল মানুষ তিনি, আল্লাহ্‌ তাঁকে রহম করুন, তবে তিনি যোদ্ধা নন। তিনি বাস করতেন তাঁর বই-পুস্তকের মধ্যে—তলোয়ার খুব খাপ খায় না তাঁর হাতে...'

—'কিন্তু উমর আল্‌-মুখতার—তিনি নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণ করেন নি? তিনি কি মিসর চলে গিয়েছিলেন?'

সিদি মুহাম্মদ তাঁর পথের উপর থেমে যান এবং বিস্ময়ে পলকহীন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান ঃ 'উমর...? তাহলে এ...ও তুমি শোনো নি?'

—'কী শুনিনি?'

—'বেটা', তিনি বলেন মোলায়েমভাবে, 'সিদি উমর, আল্লাহ্‌ তাঁর উপর রহমত করুন, প্রায় এক বছর হলো মারা গেছেন তিনি...।'

উমর আল-মুখতার মারা গেছেন...সাইরেনিকার সেই সিংহপুরুষ যাঁর সত্তর বছরের অধিক বয়স শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দেশের আযাদীর জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বাধ্য হতে পারেনি... তিনি মৃত... সুদীর্ঘ দশটি বছর... ভয়ংকর দশটি বছর তিনি ছিলেন তাঁর জাতির প্রতিরোধ শক্তির প্রাণ, তার রূহ যে-সব বাধা-বিঘ্ন জয়ের আশা নেই সে-সবের বিরুদ্ধে, তাঁর ফৌজের চাইতে দশ গুণ বেশি ইতালীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে...যে ইতালীয় ফৌজ আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে, সাঁজোয়া গাড়ি, উড়োজাহাজ এবং কামানে সজ্জিত—যখন উমর এবং তাঁর অর্ধ-উপবাসী 'মুজাহিদীনে'র কিছুই ছিলো না রাইফেল এবং কয়েকটি ঘোড়া ছাড়া, যা নিয়ে তাঁকে এমন এক দেশে লড়তে হয়েছে একটি বেপরোয়া গেরিলা যুদ্ধ যে দেশ পরিণত হয়েছিলো একটি বিশাল বন্দী শিবিরে...।

আমার স্বর আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে যখন আমি বলি ঃ 'সাইরেনিকা থেকে আমার ফিরে আসার পর গত দেড় বছর ধরে আমি প্রতি মুহূর্তেই জেনেছি তাঁর এবং তাঁর সমর্থকদের ধ্বংস নিশ্চিত। তাঁর 'মুজাহিদীনে'র মধ্যে যারা বেঁচে ছিলো তাদের নিয়ে মিসরের ভেতরে সরে পড়ার জন্য আমি তাঁকে কত করেই না বুঝিয়েছিলাম যাতে করে তিনি তাঁর কওমের লোকজনের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারেন....আর কী শান্তভাবেই না তিনি তাঁকে বোঝানোর জন্য আমার এই চেষ্টাকে ঠেকিয়েছিলেন, একথা চূড়ান্তভাবে জেনেও যে মৃত্যু, আর কিছু নয়, মৃত্যু তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে সাইরেনিকায়। আর এখন, শত যুদ্ধের পর সেই বহু প্রতীক্ষিত মৃত্যু তাঁকে শেষ পর্যন্ত কব্জা করেছে...কিন্তু বলুন কখন পতন ঘটলো তাঁর ?'

মুহাম্মদ আজ্‌জুবাই আস্তে করে তাঁর মাথা নাড়েন এবং আমরা যখন বাজারের চিপা রাস্তা থেকে বের হলাম আল্‌-মানাখার খোলা অন্ধকার চকে, তিনি আমাকে বললেন ঃ

—'যুদ্ধে ওঁর মৃত্যু হয়নি, তিনি যখম হন এবং জীবিত অবস্থায় বন্দী হন এবং তারপরই তাঁকে ইতালীয়রা হত্যা করে...ওরা তাঁকে একজন সাধারণ চোরের মতো ফাঁসি দেয়...।'

—'কিন্তু কী করে ওরা তা করতে পারে,' আমি বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করি। গ্রাৎসিয়ানি ও

তো এ ধরনের ভয়ংকর কাজ করতে সাহস পেতো না!'

—'কিন্তু সে-ই তা করেছে, সে-ই তা করেছে,' তিনি জবাব দেন বিদ্রূপ মেশানো হাসির সংগে। জেনারেল গ্রাৎসিয়ানি নিজেই তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারার আদেশ দেয়। সিদি উমর এবং তাঁর বিশ পঁচিশ জন সংগী ছিলেন ইতালী অধিকৃত এলাকার অনেক ভেতরে, যখন তাঁরা স্থির করেন তাঁরা রসূলের সাহাবা সিদি রফির মাযারে গিয়ে যিয়ারত করবেন। মাযারটি ছিলো কাছেই। কোনো না কোনোভাবে ইতালীয়রা তাঁর উপস্থিতির কথা জানতে পায় এবং বহু লোক দিয়ে উপত্যকার দু'দিকই বন্ধ করে দেয়। পালিয়ে বাঁচার আর কোনো পথ ছিলো না। সিদি উমর এবং 'মুজাহিদীন' আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করেন, শেষপর্যন্ত তিনি আর তাঁর দুই সংগী বেঁচে রইলেন। অবশেষে তিনি, যে ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন, শত্রুর গুলীতে সে ঘোড়াটি মারা যায় এবং ঘোড়াটি পড়ে যাওয়ার সংগে সংগে তিনিও মাটিতে গড়িয়ে পড়েন। কিন্তু বৃদ্ধ সিংহ তখনো রাইফেল বাগিয়ে গুলী চালিয়ে যেতে থাকেন। এক সময় একটি বুলেট এসে তাঁর একটি হাত চুরমার করে দেয় ; তখন তিনি অন্য হাত দিয়ে গুলী করতে থাকেন, কিন্তু এক সময় গুলীও ফুরিয়ে গেলো। তখন ওরা তাঁকে ধরে ফেলে এবং তাঁকে বেঁধে সুলুকে নিয়ে যায়। ওখানে তাঁকে নিয়ে হাজির করা হয় জেনারেল গ্রাৎসিয়ানির সম্মুখে। সে তাঁকে জিগ্‌গাসা করে ঃ 'তুমি কী বলবে যদি ইতালী সরকার তার মহৎ করুণা বশে তোমাকে বেঁচে থাকবার অনুমতি দেয়? তুমি কি ওয়াদা করতে রাজী আছো তুমি তোমার জীবনের বাকি বছরগুলো শান্তিপূর্ণভাবে কাটাবে?' কিন্তু সিদি উমর জবাব দিলেন ঃ 'তোমার লোকলসকর আর তোমার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধে ক্ষান্ত দেবো না যতক্ষণ না তোমরা আমার দেশ ত্যাগ করেছো অথবা আমি আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছি। মানুষের অন্তরে যা আছে, যিনি তা জানেন, তাঁর নামে কসম করে আমি তোমাকে বলছি, যদি এই মুহূর্তে আমার হাত দুটি বাঁধা না থাকতো, আমি আমার খালি হাত নিয়ে তোমার সংগে লড়তাম যদিও আমি বৃদ্ধ এবং বিধ্বস্ত...।'

এতে জেনারেল গ্রাৎসিয়ানি হো হো করে হেসে ওঠে এবং সুলুকের বাজারের মধ্যে সিদি উমরকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করার হুকুম দেয়। ওরা সে হুকুম কার্যকরী করে। আর বিভিন্ন তাঁবুতে যে-সব হাজার হাজার মুসলিম নর-নারীকে কয়েদ করে রাখা হয়েছিলো তাদের গরু-ভেড়ার পালের মতো একত্র হয়ে হাঁকিয়ে নিয়ে এসে ফাঁসি-কাষ্ঠে তাদের নেতার মৃত্যু দেখতে বাধ্য করে...।[১]

তিন

তখন হাত ধরাধরি করে মুহাম্মদ আজ্‌জুবাই আর আমি চলেছি সেনুসি 'জাভিয়া' তথা ধর্মীয় আস্তানার দিকে। বিশাল চকের উপর অন্ধকার ছড়িয়ে আছে। বাজারের হট্টগোল আমরা ফেরে এসেছি পেছনে। আমাদের স্যান্ডেলের নীচে বালু দেবে যাচ্ছে। এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে ভারবাহী উটের একেকটি দল বিশ্রাম করছে; দূরে, চকের বহির্ভাগে এক সারি ঘর-বাড়ি অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে মেঘাচ্ছন্ন রাতের আকাশের পটভূমিকায়। এ

১. ইতালীয়দের এই বীরোচিত কর্মটি ঘটেছিলো ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ ইংরেজি।

দৃশ্য আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় সুদূরের একটি অরণ্যের প্রান্তভাগের কথা, সাইরেনিকার মালভূমি অঞ্চলের সেই সব জোনিপার অরণ্যের কথা, যেখানে আমি প্রথম সিদি উমর আল্ মুখতারের সাক্ষাৎ পেয়েছিলামঃ এবং সেই নিষ্ফল সফরের স্মৃতি আমার বুকের ভেতর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে অন্ধকার, বিপদ এবং মৃত্যুর সমস্ত করুণ রসসহ। আমি দেখতে পাই—একটি ছোট্ট নিবু নিবু আগুনের উপর নুয়ে পড়া সিদি উমরের গম্ভীর বিষণ্ন মুখ এবং শুনতে পাই তাঁর ভাঙা ভাঙা, গম্ভীর কণ্ঠস্বরঃ আমাদের ধর্ম এবং আমাদের আযাদীর জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে যতোক্ষণ না আমরা হানাদারদের তাড়িয়ে দিতে পেরেছি অথবা আমরা নিজেরা মৃত্যুবরণ করেছি...আমাদের আর কোনো বিকল্প নেই...।'

... ...

এ ছিলো এক অদ্ভুত মিশন, যা আমাকে সাইরেনিকায় নিয়ে আসে ১৯৩১ সালের জানুয়ারির শেষের দিকে। কয়েক মাস আগে—সঠিকভাবে বলতে গেলে ১৯৩০-এর শরৎকালে—মহান সেনুসি মদীনায় এসেছিলেন। আমি তাঁর এবং মুহাম্মদ আজ্জুবাই-এর সহবতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাই 'মুজাহিদীনে'র মারাত্মক সংকটের কথা আলোচনা ক'রে, যারা উমর আল্-মুখতারের নেতৃত্বে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলো সাইরেনিকয়। স্পষ্ট বোঝা গেলো, ওরা যদি বহির্বিশ্ব থেকে দ্রুত এবং কার্যকরী মদদ না পায়, ওরা আর বেশি দিন টিকে থাকতে সক্ষম হবে না।

সাইরেনিকার পরিস্থিতি ছিলো মোটামুটি এইরূপঃ উপকূলের সব ক'টি শহর এবং জবল আখ্দার যাকে, বলা হয় মধ্য সাইরেনিয়কার 'সবুজ পর্বতমালা'—তার উত্তর অঞ্চলের কয়েকটি স্থান রয়েছে ইতালীয়দের কঠোর নিয়ন্ত্রণে। এসব সুরক্ষিত স্থানের ফাঁকে যেসব জায়গা রয়েছে সেখানে নিরবিচ্ছন্নভাবে টহল দিয়ে চলেছে সাঁজোয়া গাড়ি এবং বেশ কিছু সংখ্যক পদাতিক ফৌজ, যাদের বেশির ভাগই হচ্ছে ইরিত্রিয় 'আশকারী' বা লস্কর—ওদের সমর্থনে এক স্কোয়াড্রন বিমান ঘন ঘন উড়ছে আকাশে, গ্রামাঞ্চলের উপর দিয়ে। বেদুঈন (যাদের নিয়ে গঠিত ছিলো সেনুসি প্রতিরোধ বাহিনীর মূল শক্তি) পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর নযর না পড়ে এবং আকাশ হতে বিমান হামলার শিকার না হয়ে চলাফেরা মোটেই সম্ভব ছিলো না। প্রায়ই এরকম ঘটতো যে, একটি সন্ধানী বিমান হয়তো বেতারযোগে নিকটতম পোস্টে বার্তা পাঠিয়েছে কোনো বেদুঈন কবিলার তাঁবুর অস্তিত্ব সম্পর্কে, বিমানের মেশিনগান যখন ওদের ছত্রভংগ হতে দিচ্ছে না, তখন কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ি ছুটে এলো সোজাসুজি তাঁবু, উট এবং মানুষের মধ্য দিয়ে—আওতার মধ্যে যা পেলো নারী, পুরুষ, ছেলেমেয়ে, জীব-জানোয়ার সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করতে করতে—এবং যে ক'টি মানুষ আর জীবজন্তু বেঁচে রইলো তাদের গরু-ভেড়ার পালের মতো এক জায়গায় জমা করে তাড়িয়ে নেওয়া হলো উত্তর- দিকে, কাঁটাতারের বৃহৎ বেষ্টনীর মধ্যে, যা ইতালীয়রা স্থাপন করেছে উপকূলভাগে। সে সময়ে, ১৯৩০-এর শেষের দিকে, প্রায় ৮০ হাজার বেদুঈন আর তার সংগে কয়েক লাখ গরু-ভেড়া উটকে ওরা অতোটুকু জায়গার মধ্যে এনে পশুর পালের মতো জমা করে, যে জায়গায় ঐ সংখ্যার সিকি ভাগেরও রসদ ছিলো না। ফলে মানুষ এবং জীব-জানোয়ারের মৃত্যুহার হলো

ভয়াবহ। অধিকন্তু, ইতালীয়রা সমুদ্র-উপকূল থেকে দক্ষিণের জাগবুবের দিকে মিসর সীমান্ত বরাবর একটি কাঁটাতারের প্রতিবন্ধক গড়ে তুলছিলো, যাতে গেরিলাদের পক্ষে মিসর থেকে রসদ বা অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। বীর মাঘারিবা কবিলা তাদের অজেয় সর্দার আল্-আতায়বিস-এর নেতৃত্বে—যিনি ছিলেন উমর আল মুখ্তারের দক্ষিণ হস্ত—তখনো অবিচলিতভাবে বাধা দিয়ে যাচ্ছে শত্রুকে সাইরেনিকার পশ্চিম উপকূলের নিকটে। কিন্তু বেশির ভাগ কবিলাই ইতালীয়দের বিপুলতরো সংখ্যা এবং উন্নততরো অস্ত্রশস্ত্রের কাছে ইতিমধ্যেই হার মেনেছে। আরো দক্ষিণে অনেক ভেতর ভাগে নব্বই বছর বয়স্ক আবু কারাইমের নেতৃত্বে জুবাইয়া কবিলা তখনো মরণপণ জিহাদ করে চলেছে—তাদের কবিলার কেন্দ্র জালু মরুদ্যান হাতছাড়া হওয়ার পরও। অভ্যন্তরভাগে বেদুঈনেরা বিপুল সংখ্যায় মারা যাচ্ছিলো অনাহারে এবং রোগ-ব্যাধিতে।

সিদি উমরের পক্ষে যুদ্ধের জন্য একবারে যে সৈন্য সমাবেশ সম্ভব ছিলো তা বড়জোর সংখ্যায় এক হাজারের কিছু বেশি হতে পারে। অবশ্য লোকের অভাবই এর কারণ নয়। 'মুজাহিদীন' যে ধরনের গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলো তাতে যোদ্ধাদের বড় দল করে কাজ করা সুবিধাজনক ছিলো না। বরং এ ধরনের যুদ্ধ নির্ভর করতো আঘাত করতে সক্ষম ছোট্ট দলের ক্ষীপ্রতা ও গতিশীলতার উপর যা হঠাৎ শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে একটি ইতালীয় ব্যূহ অথবা দূরবর্তী ঘাঁটির উপর—এর অস্ত্রশস্ত্র দখল করে নেবে। তারপর কোনো চিহ্ন না রেখেই সাইরেনিকার মালভূমির ঘন জুনিপার অরণ্যে এবং শুকিয়ে যাওয়া নদীর উঁচু নীচু ভঙ্গুর উপত্যকায় গায়েব হয়ে যাবে। যতো দুঃসাহসীই হোক না কেন, জীবন মৃত্যুকে যতোই পায়ের ভৃত্য মনে করুক না কেন, এ ধরনের ছোট ছোট দলের পক্ষে যে, জনসংখ্যা আর অস্ত্রশস্ত্রের দিক দিয়ে প্রায় অপরিসীম সম্পদের অধিকারী দুশমনের উপর নিশ্চিত জয়লাভ কখনো সম্ভব নয়, তা ছিলো সুস্পষ্ট। কাজেই, প্রশ্নটি ছিলো, কী করে 'মুজাহিদীনে'র শক্তি বৃদ্ধি করা যায়, যাতে করে ওরা হানাদারদের উপর বিচ্ছিন্ন আক্রমণ চালিয়ে ওদের কেবল ক্ষতিগ্রস্ত করতেই সক্ষম হবে না, বরং দুশমন যে-সব অবস্থানে আসন গেড়েছে মজবুতভাবে, সেগুলিও কেড়ে নিতে সক্ষম হবে, পারবে নতুন আক্রমণের মুকাবিলায় সে অবস্থানগুলিকে নিজের অধিকারে রাখতে।

সেনুসি শক্তিকে এভাবে বাড়াতে হলে তা নির্ভর করছিলো কয়েকটি বিষয়ের উপরঃ মিসর থেকে নিয়মিতভাবে অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য যাতে আসতে পারে তার ব্যবস্থা; বিমান এবং সাঁজোয়া গাড়ির মারাত্মক ধ্বংসলীলার মুকাবিলা করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র বিশেষ করে, ট্যাংক বিধ্বংসী রাইফেল এবং ভারী কামান; এ-ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকজন এবং 'মুজাহিদীন'কে এসব ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ, এবং সর্বশেষে সাইরেনিকার বিভিন্ন 'মুজাহিদীন' দলের মধ্যে নির্ভরযোগ্য বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা আর মিসরীয় এলাকার অভ্যন্তরে গোপন সরবরাহ-ডিপো!

প্রায় এক হপ্তা, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা, মহান সেনুসি সিদি মুহাম্মদ এবং আমি এক সংগে বসে পরামর্শ করি—কী করা যায়। সিদি মুহাম্মদ বললেন—কখনো কখনো সাইরেনিকায় মুজাহিদীনের কিছু শক্তি বৃদ্ধি করলেও তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। তাঁর বিশ্বাস, লিবীয়

মরুভূমির অনেক দক্ষিণে অবস্থিত কুফ্রা মরুদ্যানটিকে ভবিষ্যতের সকল যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু ক'রে গড়ে তুলতে হবে আবার। কারণ কুফ্রা এখনো ইতালীয় সৈন্যবাহিনীর নাগালের অনেক দূরে রয়েছে। উপরন্তু সাইয়িদ আহমদের নেতৃত্বে সেনুসি তরীকার হেড কোয়ার্টর ছিলো এই কুফা। কুফা মিশরীয় মরুদ্যান বাহ্রিয়া এবং ফারাফ্রা অভিমুখী সরাসরি, যদিও দীর্ঘ এবং দুস্তর, মরু কাফেলার পথের উপর অবস্থিত এবং সে কারণে, দেশের অন্য যে-কোন স্থানের চাইতে এ স্থানে অনেক বেশি কার্যকরভাবে রসদের ব্যবস্থা করা সম্ভব। তা ছাড়া, মিসরের বিভিন্ন ক্যাম্পে যে বহু হাজার সাইরেনীয় মুহাজির বাস করছে, তাদের জন্যও এটিকে করা যেতে পারে নতুন করে সমাবেশের কেন্দ্র। আর এভাবে তা হয়ে উঠতে পারে উত্তরাঞ্চলে সিদি উমরের গেরিলা বাহিনীর জন্য জনশক্তির একটি নিয়মিত সংরক্ষণাগার। ঠিক মতো সুশিক্ষিত হলে এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হলে কুফ্রা নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়া বিমান থেকে কামানের আক্রমণ ঠেকাতে পারবে। অন্য দিকে খুব উঁচু থেকে বোমা বর্ষণ করলে এতো দূর দূর ব্যবধানে অবস্থিত তাঁবুগুলির সত্যিকার বিপদের আশংকা সামান্যই থাকবে।

মহান সেনুসি বললেন ঃ এভাবে সংগ্রামের পদ্ধতি নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব হলে তিনি নিজে কুফ্রায় ফিরে যাবেন ভাবী সকল অপারেশন সেখান থেকে পরিচালনা করার জন্য। আমার দিক থেকে আমি জোর দিয়ে বলি—এ ধরনের একটা পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সংগে নতুন করে সদ্ভাব স্থাপন করা সাইয়িদ আহমদের জন্য জরুর। বলাবাহুল্য, ১৯১৫ সনে ব্রিটিশ শক্তির উপর আক্রমণ ক'রে সাইয়িদ আহমদ ব্রিটিশ সরকারকে একেবারে অযথাই অতি ঘোর শত্রুতে পরিণত করেছিলেন। সম্পর্কের এ ধরনের উন্নতি হয়তো অসম্ভব নয়, কারণ ইতালীর সম্প্রসারণবাদী মেজাজে ব্রিটেন খুব খুশী ছিলো না। বিশেষ করে, যখন মুসোলিনী ঢাক-ঢোল পিটিয়ে দুনিয়াকে জানাচ্ছেন ভূমধ্যসাগরের উভয় তীরে 'রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা' তাঁর অভিপ্রায় এবং লোভাতুর দৃষ্টিতে তিনি যখন তাকাচ্ছেন মিসরের দিকেও। সেনুসিদের ভাগ্য সম্বন্ধে আমার এই গভীর আগ্রহের কারণ একটি ন্যায়সংগত লক্ষ্য হাসিলের জন্য চরম বীরত্বের প্রতি আমার শ্রদ্ধাই কেবল নয়, আমি আরো বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম সেনুসিদের বিজয় গোটা আরব জগতের উপর যে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তা'ই নিয়ে। অনেক মুসলমানের মতোই আমিও বহু বছর ধরে আমার আশা স্থাপন করেছিলাম ইব্‌নে সউদের উপর, ইসলামী পুনর্জাগরণের একজন সম্ভাব্য নেতা হিসাবে। কিন্তু এখন যখন সে আশা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে গোটা মুসলিম জাহানে আমি কেবল একটি আন্দোলনই দেখতে পেলাম যা আন্তরিকভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ইসলামী সমাজের আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের জন্য ঃ আর সে আন্দোলন হচ্ছে সেনুসি আন্দোলন, বেঁচে থাকার জন্য এ মুহূর্তে মরণপণ জিহাদে লিপ্ত।

এবং সাইয়িদ আহমদ জানতেন, সেনুসি আন্দোলনের লক্ষ্যের সাথে আমার আবেগ অনুভূতি খুবই নিবিড়-গভীরভাবে জড়িয়ে গেছে। তাই তিনি মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালেন এবং সোজা আমার চোখের উপর চোখ রেখে বললেন ঃ

—'হে মুহাম্মদ, তুমি কি আমাদের তরফ থেকে যেতে পারো সাইরেনিকা এবং দেখে আসতে পারো 'মুজাহিদীনে'র জন্য কী করা যায়? হয়তো আমার লোকদের চাইতে

স্বচ্ছতরো দৃষ্টিতে তুমিই সক্ষম হবে সব কিছু দেখতে...।'

আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ি নিঃশব্দে, যদিও আমার উপর তাঁর আস্থা সম্পর্কে আমি ছিলাম সজাগ। তাই, তাঁর পরামর্শে পুরাপুরি বিস্মিত হইনি। তবু, এতে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হলো। এমন বৃহৎ এবং মহৎ একটি এ্যাডভেঞ্চারের সম্ভাবনা আমাকে এতোটা বিহ্বল করে তুললো, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তারো চাইতে বেশি যা আমাকে রোমাঞ্চিত করে তুললো তা এই ভাবনা যে, যে-আদর্শের জন্য নিজেদের কুরবান করেছে বহু মানুষ, তারই জন্য আমিও হয়তো কিছু করতে সক্ষম হবো!

সাইয়িদ আহমদ তাঁর মাথার উপর একটি তাকের দিকে হাত বাড়ালেন এবং রেশমী কাপড়ে মোড়া একখন্ড কুরআন হাতে নিলেন। সেইটিকে তাঁর হাঁটুর উপর রেখে তিনি আমার ডান হাত তাঁর দুই হাতের মধ্যে নিয়ে তা রাখলেন কুরআনের উপর ঃ

'শপথ করো মুহাম্মদ, তাঁর নামে যিনি জানেন মানুষের অন্তরে যা কিছু আছে—তুমি সব সময়ই 'মুজাহিদীনে'র বিশ্বাস রক্ষা করবে...।'

আমি শপথ নিলাম—এবং আমি কী শপথ গ্রহণ করলাম, সে বিষয়ে আমার জীবনে কখনো ঐ মুহূর্তের চাইতে বেশি নিশ্চিত ছিলাম না।

সাইয়িদ আহমদ আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করলেন তার জন্য চূড়ান্ত গোপনীয়তা ছিলো অপরিহার্য; যেহেতু মহান সেনুসির সংগে আমার সম্পর্ক ছিলো সুপরিজ্ঞাত এবং সে সম্পর্ক জেদ্দায় যেসব কূটনৈতিক দূতাবাস ছিলো তাদের নযর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো না সে কারণে, প্রকাশ্যে মিসর অভিমুখে যাত্রা ক'রে ধরা পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া আক্কেলমন্দের কাজ হতো না। ফয়সল আদ-দাবীশের বিদ্রোহের পেছনে যে ষড়যন্ত্র সম্প্রতি আমি উদঘাটন করেছি, তা ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে আমার মর্যাদা নিশ্চয় বাড়ায়নি। বরং খুবই সম্ভব যে, আমি যে মুহূর্তে মিসরের মাটিতে পা রাখবো তখন থেকেই ওরা আমার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নযর রাখবে। তাই আমরা স্থির করলাম, আমার মিসর যাওয়ার কথাও গোপন রাখা হবে। আমি আরবের পালতোলা জাহাজের কোনো না কোনো একটিতে চড়ে পাড়ি দেবো লোহিত সাগর এবং পাসপোর্ট আর ভিসা ছাড়াই লুকিয়ে উজান মিসরের কোন এক নির্জন স্থানে নেমে পড়বো। মিসরে আমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবো একজন শহুরে হেজাযীর ছদ্মবেশে, কারণ তেজারতির উদ্দেশ্যে অথবা সম্ভাব্য হজ্জ যাত্রীর সন্ধানে ওখানে মক্কা মদীনা থেকে যে বহু সংখ্যক লোক যায় মিসরের বিভিন্ন শহর এবং গ্রামের লোকেরা তাদের সব সময়ে দেখে আর আমি যেহেতু অতি স্বচ্ছন্দে হেজাযী উপ-ভাষায় কথা বলতে পারি, সে কারণে এ দু'টি পবিত্র নগরীর একটির বাসিন্দা হিসাবে আমি সব জায়গায়ই অনায়াসে নিজকে চালিয়ে নিতে পারবো।

ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ করার জন্য কয়েক হপ্তার প্রস্তুতির প্রয়োজন হলো। এই প্রস্তুতির মধ্যে ছিলো সাইরেনিকায় সিদি উমরের সংগে এবং তৎসহ মিসরে যাঁদের সংগে সেনুসিদের সম্পর্ক রয়েছে তাঁদের সাথে গোপন পত্র বিনিময়ের ব্যবস্থা। এবং এভাবে ১৯৩১ সনের জানুয়ারির প্রথম হপ্তায়ই যায়েদ এবং আমি হেজাযের বন্দর-শহর ইয়ানবু ত্যাগ করে উপকূলের এমন একটি অংশে গিয়ে পৌঁছুলাম যেখানে মানুষের গতিবিধি ছিলো

বিরল। আসমানে চাঁদ ছিলো না, কৃষ্ণপক্ষের রাত, অসমান রাস্তার উপর দিয়ে স্যান্ডেল পায়ে হাঁটা ছিলো খুবই কষ্টকর। একবার যখন আমি হোঁচট খেলাম তখন আমার হেজাযী 'কাপ্তানে'র নীচে গোঁজা লুগার পিস্তলের বাটের আঘাত লাগলো আমার পাঁজরে এবং এর ফলে, আমি যে-দুঃসাহসিক অভিযানে বের হয়েছি তার ভয়ংকর প্রকৃতি আমার মনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো।

এখানে আমি চলছি এক নির্দিষ্ট স্থানের দিকে, এক অপরিচিত আরব নাবিকের সংগে, যে আমাকে তার 'পালতোলা ডিঙি'তে ক'রে সমুদ্দুর পার করে গোপনে মিসরীয় উপকূলের কোথাও নামিয়ে দেবে। আমার কাছে এমন কোনো কাগজপত্রই ছিলো না আমার পরিচয় ব্যক্ত ক'রে দিতে পারে। কাজেই আমি যদি মিসরে ধরাও পড়ি, প্রমাণ করা সহজ হবে না, আমি কে! কিন্তু আমার সামনে যে বিপদ রয়েছে তার তুলনায় মিসরের কোনো জেলে কয়েক হপ্তা কাটানোর বিপদও আমার জন্য কিছুই ছিলো না। ইতালীয় পাহারাদার—বিমান যাতে দেখতে না পায় সেভাবে এবং সম্ভবত সাঁজোয়া গাড়ির টহলদারদের দৃষ্টি এড়িয়ে আমাকে পশ্চিমের গোটা মরুভূমিটি প্রস্থে পাড়ি দিতে হবে এবং পৌঁছুতে হবে অমন একটি দেশের কেন্দ্রস্থলে, যেখানে তরবারীর ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা কেউ জানে না। আমি এ কাজ কেন করছি?—প্রশ্ন করি নিজেকে।

যদিও বিপদ আমার কাছে অপরিচিত নয়, কেবল একটা রোমাঞ্চের প্রত্যাশায় আমি কখনো তা চাইনি। যখন আমি কোনো বিপদের মধ্যে গিয়ে পড়েছি, প্রত্যেকবারই তার মূলে ছিলো জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত এক আন্তর-দোলার (Urge) প্রতি সাড়া, যা আমার নিজের জীবনের সংগে ছিলো অত্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্কিত। তাহলে, আমার এই বর্তমান উদ্যোগটির তাৎপর্য কী? আমি কি সত্যি বিশ্বাস করি আমার হস্তক্ষেপ 'মুজাহিদীনে'র পক্ষে ফিরিয়ে দেবে স্রোত? আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হলো ঃ কিন্তু আমার অন্তরের গহনে আমি জানি, একটি অবাস্তব কল্পনা—সর্বস্ব মিশন নিয়ে আমি বের হয়েছি। তা হলে, আল্লাহ্‌র শপথ, এভাবে কি আমি আমার জীবনকে বিপদের মুখ ঠেলে দিচ্ছি যা আগে কখনো করিনি এবং সামনে প্রতিশ্রুতি যখন এত সামান্য?

কিন্তু প্রশ্নটি সচেতনভাবে গঠিত হওয়ার আগেই তার জবাব আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যখন আমি ইসলামের সাথে পরিচিত হয়ে উঠি এবং ইসলামকে আমার জীবন-বিধান হিসাবে গ্রহণ করি—আমার মনে হয়েছিলো—আমার সমস্ত জিগ্‌গাসা এবং সমস্ত সন্ধান সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে খুবই ধীরে ধীরে আমি সজাগ হয়ে উঠলাম যে, এখানেই শেষ নয় ঃ কারণ নিজের জন্য বাধ্যতামূলক ব'লে কোনো জীবন-বিধান গ্রহণ, অন্ততপক্ষে আমার কাছে তা সমমতের মানুষদের মধ্যে অনুসরণের একটি বাসনার সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত। কেবলমাত্র একটা ব্যক্তিগত অর্থে তা অনুসরণ করা নয়, বরং আমার বেছে নেয়া সমাজের মধ্যে তার সামাজিক রূপায়ণের জন্য কাজ করার কামনার সংগে তা সম্পর্কিত। আমার কাছে ইসলাম ছিলো একটি পথ, লক্ষ্য নয় এবং উমর আল-মুখতারের বেপরোয়া গেরিলারা তাদের জীবন আর রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করে চলেছে সেই

পথে চলার স্বাধীনতার জন্য, ঠিক যেমনটি করেছিলেন বীর সাহাবারা তেরো শো বছর আগে। ফল যতো অনিশ্চিতই হোক, তাদের এই কঠোর এবং ঘোর সংগ্রামে তাদের সাহায্য করা আমার জন্য ব্যক্তিগতভাবেই অপরিহার্য ছিলো, সালাতের মতোই....

এবং তার পরেই দেখা গেলো উপকূলভাগ। যে-সব ছোটো মৃদু ঢেউ আঘাত করছে তীরে নুড়ি পাথরের উপর সেই ঢেউগুলির মোলায়েম স্ফীতির উপর দোল খাচ্ছে দাঁড়ের নৌকা, যা আমাদের নিয়ে যাবে দূরে, অন্ধকারে নোঙর করা জাহাজে। অপেক্ষমান নৌকায় যখন নিঃসংগ দাঁড়টানা লোকটি দাঁড়ালো আমি তখন যায়েদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলি ঃ

—'ভায়া যায়েদ, তুমি কি জানো আমরা এমন এক দুঃসাহসিক অভিযানে বের হয়েছি যা আদ-দাবিশের সম্মিলিত সকল 'ইখ্‌ওয়ানে'র চাইতেও তোমার এবং আমার জন্য অধিকতরো খতরনাক প্রমাণিত হতে পারে? তোমার কি মদীনার শান্তি এবং তোমার বন্ধু-বান্ধবের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না ?'

—'চাচা, আপনার পথই আমার পথ,' যায়েদ জবাব দেয়, আপনি নিজেই কি আমাকে বলেননি যে, যে পানির স্রোত নেই তা হয়ে ওঠে বাসি এবং দূষিত? চলুন আমরা আগিয়ে যাই—আর পানি যেনো চলতে চলতে হয়ে ওঠে পরিষ্কার....'

জাহাজটি হচ্ছে সেই সব বড় বিদ্‌ঘুটে পালতোলা 'কিশতী'র একটি যা আরবের উপকূল ঘেঁষে চলাচল করে ঃ সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি এই জাহাজ, শুঁটকি আর সমুদ্র-শৈবালের গন্ধে ভরপুর। কিশতীটির পশ্চাৎভাগে রয়েছে একটি উঁচু পাটাতন, ল্যাটিন পদ্ধতিতে পাল খাটানোর জন্য দুটি মাস্তুল, আর দুই মাস্তুলের মাঝখানে রয়েছে একটি বড়ো, নীচু সিলিংবিশিষ্ট কেবিন। জাহাজের 'রইস' বা চালক হচ্ছেন মস্কটের এক বয়োবৃদ্ধ অভিজ্ঞ আরব। বহু রঙের এক মস্ত বড় পাগড়ীর তল থেকে ছোটো ছোটো তসবীর দানার মতো যে দুটি চোখ আমার দিকে অর্ধ নিমিলিত দৃষ্টিতে তাকালো, তাতে দেখলাম সতর্ক অভিব্যক্তি, যাতে বাঙময় হয়ে উঠেছে অবৈধ কাজের ঝুঁকি নেয়া এবং অবৈধ অভিযানে কাটানো বহু বছর—আর তার কোমরে গোঁজা বাঁকা রূপার আবরণে ঢাকা ডেগারটি কেবল অলংকার বলে মনে হলো না।

—'মারহাবা, ইয়া মারহাবা, হে বন্ধুরা', সে চিৎকার করে খোশ আমদেদ জানায় আমরা জাহাজে পা দেবার সাথে সাথে, 'এ নিশ্চয়ই এক শুভ মুহূর্ত!'

কতোবারই না ও, আমি মনে মনে ভাবি, একইভাবে সে আন্তরিক খোশ আমদেদ জানিয়েছে গরীব 'হাজীদের', যাদের সে গোপনে লুকিয়ে জাহাজে তুলেছে মিসরে, আর ওদের কল্যাণ সম্পর্কে নতুন করে কোনো চিন্তা না করেই নামিয়ে দিয়েছে হেজাযের উপকূলে—যাতে করে ওরা ফাঁকি দিতে পারে মোটা হজ্ব ট্যাক্স, যা সৌদী সরকার আল্লাহ্‌র ঘরে যারা হজ্ব করতে যায় তাদের উপর ধার্য করেছে! আর কতোবারই না সে ঠিক এই কথাগুলিই বলেছে দাস-ব্যবসায়ীদের, যারা ইসলামী আইন সম্পূর্ণ ভংগ ক'রে, কোনো না কোনো হতভাগা হাবশীকে বন্দী করেছে ইয়েমেনের দাস-বিক্রির হাটে বিক্রি করার জন্য! কিন্তু তা সত্ত্বেও—আমি নিজকে সান্ত্বনা দিই,—আমাদের এই 'রইস' যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার পটভূমি যতোই আপত্তিকর হোক না কেন, তা আমাদের অবশ্যি কাজে

লাগবে। কারণ লোহিত সাগর পরিক্রমণ ক'রে এর রাস্তা সম্পর্কে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে খুব কম নাবিকেরই তা আছে। আর এ কারণে, আমাদের সে এক নিরাপদ উপকূলে নামিয়ে দিতে সক্ষম হবে, এ বিষয়ে নির্ভর করা যায় তার উপর।

... ...

আর সত্যই ঐ নৌকায় ওঠার চার রাত পর আমাদের নামিয়ে দেওয়া হলো আবার একটি ছোট্ট 'দাঁড়ের নৌকা'য় ক'রে, উজান মিসরের উপকূলে, বন্দর কুসায়েরের উত্তরে। আমরা বিস্ময়ে অবাক হই, কেননা 'রইস' আমাদের সমুদ্দুর পার করে দেওয়ার জন্য কোন ভাড়া নিতে রাজী হলো না। 'কারণ,' দাঁত বের করে হেসে হেসে সে বলে, 'আমার মুনিব আমার পাওনা শোধ করে দিয়েছেন! আল্লাহ্ আপনার সহায় হোন।'

আমি যেমনটি আশা করেছিলাম, কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে বন্দর কুসায়েরে চলাফেরা করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়নি, কারণ হিজাযী পোশাকে লোকজনকে দেখতে এ শহরের লোকেরা অভ্যস্ত। আমাদের উপস্থিতির পরদিন সকালে নীল নদের তীরবর্তী আস্-সিয়ূতগামী একটি নড়বড়ে বাসে আমাদের জন্য আসন বুক্ করি—আর, একদিকে ভয়ানক মোটা একটি স্ত্রীলোক, যে তার বিশাল কোলের উপর এক ঝুঁড়ি মোরগ নিয়ে বসেছে, অন্যদিকে এক বৃদ্ধ 'কৃষক,' যে-আমাদের পোশাক দেখেই, দশ বছর আগে যে সে 'হজ্জ' করেছিলো, তারই স্মৃতিচারণ শুরু করে—এ দু'জনের চাপের মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ব'সে যায়েদ আর আমি আমাদের আফ্রিকী সফরের প্রথম পর্যায় শুরু করি।

আমি সবসময় মনে করেছি, গোপন এবং বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি যে-ই নেয় তারই উপলব্ধি অনিবার্য যে, যার সংগেই তার সাক্ষাৎ হচ্ছে, তারই সন্দেহের পাত্র সে এবং তার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে যেতে পারে সহজেই। কিন্তু আশ্চর্য, এই মুহূর্তে আমার মনে সে ভাবনা নেই! আরবে আমি আমার জীবনের যে বছরগুলি কাটিয়েছি, সে সময়ের মধ্যে এর অধিবাসীদের জীবনে আমি অতোটা পুরাপুরি প্রবেশ করেছি যে, কেমন করে যেনো কখনো আমার মনেই হতো না যে আমি নিজে ওদেরই একজন ছাড়া অন্য কেউ! এবং যদিও আমি মক্কা ও মদীনার লোকদের বিশেষ ব্যবসায়ী মনোবৃত্তির শরীক কখনো হইনি, এই মুহূর্তে আমি আমার মা'লূমের ভূমিকার সাথে নিজকে এমন সম্পূর্ণ অভ্যস্ত বলে উপলব্ধি করি যে, আমি কাল বিলম্ব না করেই আরো ক'জন যাত্রীর সাথে 'হজ্জে'র ফযিলত সম্পর্কে প্রায় 'পেশাদার' এক আলোচনায় জড়িয়ে পড়ি। যায়েদ এই খেলায় অংশ নেয় প্রচন্ড উৎসাহের সাথে আর এভাবে আমাদের সফরের কয়েকটি ঘণ্টা কেটে যায় প্রাণবন্ত আলোচনায়।

আস্-সিয়ূতে গিয়ে আমরা ট্রেনে চাপি এবং শেষপর্যন্ত গিয়ে পৌছুই ছোট্ট একটি শহর বনি সুয়েফে। ওখান থেকে আমরা সোজা চলে যাই আমাদের সেনুসি বন্ধু ইসমাঈল আধ্-ধিবির ঘরে। তিনি একজন বেঁটে-খাটো, মজবুত হাসি-খুশি লোক, কথা বলেন উজান মিসরের সুরেলা আরবী ভাষায়। তিনি কেবল সাধারণ এক কাপড় ব্যবসায়ী ব'লে শহরের উল্লেখযোগ্য লোকদের মধ্যে তিনি গণ্য ছিলেন না; কিন্তু সেনুসি তরীকার প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রমাণিত হয়েছে বহুবার, আর সাইয়িদ আহমদের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত অনুরাগ তাঁকে করেছে দ্বিগুণ বিশ্বাসভাজন। তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে বটে ; তবু তিনি তাঁর

এক নওকরকে জাগিয়ে আমাদের খাবার তৈরি করার জন্য বললেন এবং যখন আমরা খাবারের জন্য অপেক্ষা করছি, সেই অবসরে তিনি যে–যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সেগুলি সম্পর্কে এক একটি ক'রে বলতে থাকেন।

প্রথমত, সাইয়িদ আহমদের পয়গাম পাওয়ার সংগে সংগেই তিনি মিসরের রাজপরিবারের এক মশহুর ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করেন। বহু বছর ধ'রে এই লোকটি ছিলেন সেনুসি আদর্শের এক প্রবল এবং সক্রিয় সমর্থক। এই শাহযাদাকে আমার মিশনের উদ্দেশ্য পুরাপুরি অবহিত করা হলো। তিনি সহজেই রাজী হয়ে যান আমার হাতে প্রয়োজনীয় টাকা–কড়ি দেবার জন্য। সাইরেনিকার সীমান্ত পর্যন্ত আমাদের মরু–সফরের উদ্দেশ্যে সওয়ারী এবং দুটি বিশ্বস্ত রাহনুমার ব্যবস্থাও তিনি করলেন। আমাদের মেজবান আমাদের জানালেন ঃ এই মুহূর্তে ওঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন বনি সুয়েফের বাইরে কোনো এক খেজুর–বাগিচায়।

আমি আর যায়েদ এখন আমাদের হিজাযী পোশাক খুলে ফেলি। কারণ এ পোশাক পশ্চিমী মরুপথগুলিতে বেজায় ঔৎসুক্য সৃষ্টি করতে পারে। এই পোশাকের জা'গায় আমাদের দেওয়া হলো উত্তর আফ্রিকার কাটিংয়ের সুতী ট্রাউজার এবং আঁট–সাঁট জামা আর তার সাথে দেওয়া হলো পশমের তৈরি এক প্রকার জোব্বা'—মাথা–ঢাকা আবরণসহ—যা সাধারণত লোকেরা পরে পশ্চিম মিসর এবং লিবিয়ায়। তাঁর বাড়ির ভিটার নিচ থেকে ইসমাঈল বা'র করলেন ইতালীয় ধরনের দুটি ছোটোখাটো বন্দুক যা ঘোড়–সওয়ার সিপাইদের জন্য উপযোগী 'কারণ, 'মুজাহিদীনের মধ্যে এ ধরনের রাইফেলের জন্য নতুন করে গুলীবারুদ সংগ্রহ করা তোমার জন্য হবে সহজতরো।"

পরের রাতেই আমরা আমাদের মেজবানের পথনির্দেশ মতো বা'র হয়ে পড়ি শহর ছেড়ে। আমাদের সথে যে দুজন রাহনুমা দেওয়া হলো, দেখা গেলো ওরা মিসরের আওলাদ–আলী গোত্রের বেদুঈন, যাদের মধ্যে রয়েছে সেনুসির অনেক সমর্থক। ওদের মধ্যে একজনের নাম আবদুল্লাহ, এক সজীব প্রাণবন্ত তরুণ, যে এক বছর আগে সাইরেনিকার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলো। আমরা ওখানে কী আশা করতে পারি সে বিষয়ে আমাদের প্রচুর খোঁজ–খবর দেওয়া তার পক্ষে ছিলো সহজ। অপরজনের নাম আমি ভুলে গেছি। ও ছিলো হাল্‌কা–পাত্‌লা, বিমর্ষ, কথা বলতো ক্বচিৎ। তবে সে–ও তার চেয়ে অধিক সুদর্শন আবদুল্লাহর চাইতে কম বিশ্বাসভাজন ছিলো না। ওদের সাথে যে চারটি উট ছিলো—বিশারিন জাতের শক্ত সমর্থ দ্রুতগামী সেই উষ্ট্রীগুলি—স্পষ্টতই বেছে নেওয়া হয়েছিলো সেগুলির গুণের জন্য। ওদের পিঠে যে জীন চাপানো হলো, তা আরবে যে ধরনের জীন ব্যবহারে আমি অভ্যস্ত, তা থেকে খুব আলাদা নয়। আমাদের দ্রুত, কোথাও বেশীক্ষণের জন্য না থেমে, চলতে হবে ব'লে আমাদের পথের প্রায় সর্বত্র রান্না করা খাবার পাওয়ার প্রশ্নই উঠেনি। ফলে, আমাদের রসদ ছিলো সাদাসিধা ধরনেরঃ বড়ো একটি বস্তা–বোঝাই খেজুর, আরেকটি ছোটো বস্তা, মোটা গমের ময়দায় তৈরি মিষ্টি আর খেজুর দিয়ে বস্তাটি এভাবে ঠেসে ভরা যে, তা ফেটে যায় আর কি! আর ছিলো তিনটি উটের সাথে বাঁধা চামড়ার মশক।

দুপুর রাতের সামান্য আগেই ইসমাঈল আমাদের আলিংগন করে এবং আমাদের এই

অভিযানে আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করে। আমি দেখতে পেলাম ইসমাঈল খুবই বিচলিত। আবদুল্লাহকে নেতা করে আমরা পামকুঞ্জ পেছনে ফেলে বের হয়ে পড়ি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই উজ্জ্বল চাঁদের আলোতে দ্রুত কদম তালে কংকরময় মরুপ্রান্তরের উপর দিয়ে আমরা আগিয়ে চলি উত্তর–পশ্চিমদিকে।

মিসরীয় সীমান্ত প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত লোকদের মুকাবিলা এড়িয়ে চলা ছিলো আমাদের জন্য প্রয়োজনীয়। আমরা জানতাম, ওদের মোটরগাড়ি আর উট সওয়ার কনস্টেবলেরা পশ্চিমের মরুভূমির এই অঞ্চলে টহল দিতে পারে। এজন্য যে প্রধান প্রধান পথ ধ'রে কাফেলা চলে আমরা সেগুলি থেকে যতোদূর সম্ভব দূরে থাকবার জন্য যত্নবান হই। কিন্তু বাহ্‌রিয়া আর নীলা উপত্যকার মধ্যে সুদূর উত্তর অঞ্চল পর্যন্ত যে–সব যানবাহন চলাফেরা করে, সেগুলি যেহেতু ফাইয়ুম হয়েই যায় সে কারণে বড় রকমের কোনো বিপদের ঝুকি এতে ছিলো না।

পয়লা রাতে আমরা অতিক্রম করি ত্রিশ মাইল পথ এবং দিনের বেলা আমরা ঝাউ গাছের এক জংগলে অবস্থান করি। পরের রাতে এবং তার পরের রাতগুলিতে আমরা আরো অনেক বেশি পথ অতিক্রম করি, যার ফলে, চতুর্থ দিনে ফজরের সময় আমরা সেই গভীর নিচু জায়গাটির কিনারে গিয়ে পৌছুই, যেখানে রয়েছে বাহ্‌রিয়্যা মরূদ্যান।

আমরা মরূদ্যানের বাইরে কিছু বড়ো বড়ো শিলার আড়ালে তাঁবু খাটাই। মরূদ্যানটিতে রয়েছে পৃথক পৃথক কয়েকটি বসতি এবং খামার, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে বাভিতি নামক গ্রাম। আমরা যখন তাঁবু খাটাচ্ছিলাম, তখন আবদুল্লাহ্ পায়ে হেঁটে খাড়া নিচু শিলার খাদ বেয়ে নেমে গেলো পাম্‌গাছের ছায়ায় ঢাকা নিচু জায়গাটিতে—বাভিতিতে আমাদের যোগাযোগের লোকটিকে খুঁজে বের করার জন্য। সন্ধ্যার আগে তার পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব নয়। এজন্য আমরা শিলার ছায়ায় ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়িঃ রাতভর উট হাঁকিয়ে চলার শারীরিক কষ্ট আর শীতের পর কতো আরামদায়ক কতো সুখকর এই বিশ্রাম! তা সত্ত্বেও আমার খুব বেশি ঘুম হলো না, কারণ নানারকম আইডিয়া আমার মনকে দখল করে বসেছিলো।

আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে আমার মনে হলো, বনি সুয়েফ এবং বাহ্‌রিয়্যার মধ্যে একটি স্থায়ী যোগাযোগের সূত্র রক্ষা করা খুব কঠিন হবে না। আমার দৃঢ় প্রত্যয় হলো, যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করলে এই দুই স্থানের মধ্যে বড়ো বড়ো কাফেলাও চলাফেরা করতে পারবে, কারো নযরে না প'ড়ে। বাভিতিতে সীমান্ত প্রশাসনের চেক পোস্ট থাকা সত্ত্বেও (আমরা আমাদের লুকানোর জা'গা থেকে মরুভূমির উপর দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম এই চেক পোস্টের ইমারতগুলি) বাহ্‌রিয়্যার দক্ষিণে অধিকতরো যোগাযোগবিহীন কোনো গ্রামে গোপন বেতার যন্ত্র স্থাপন সম্ভব হতে পারে। এ বিষয়ে কয়েক ঘণ্টা পরে আবদুল্লাহ এবং তার সংগে আগত আমাদের যোগাযোগের লোক, বৃদ্ধ বার্বারটি আমাকে নতুন ক'রে আশ্বাস দেয়। দেখা গেলো, এই মরূদ্যানটির উপর সরকার মোটামুটি খুবই শিথিল একটা কর্তৃত্ব খাটিয়ে থাকে এবং তারো চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, এখানকার বাসিন্দারা বিপুল সংখ্যায় সেনুসি তরীকার অনুসারী।

উটের পিঠে প্রাণান্তকর আরো পাঁচটি রাত : প্রথমে শিলা, কংকর ও উঁচুনিচু মাটির উপর দিয়ে এবং পরে সমতল বালিয়াড়ির উপর দিয়ে, বসতিশূন্য সিত্‌রা মরূদ্যান এবং তার প্রাণহীন গাঢ় নীল লবণ হ্রদ ছাড়িয়ে, যার কিনার ঘিরে রয়েছে নল—খাগড়া এবং আরণ্যকে পামের ঝোপ-ঝাড়; সমতল থেকে নিচু আর্দ্র এলাকার উপর দিয়ে, যেখানে রয়েছে বিস্ময়কর অসমতল কড়িমাটির শিলা, যা চাঁদের আলো পড়ে একটি ভৌতিক অজাগতিক চেহারা লাভ করেছে এবং পঞ্চম রাতের শেষদিকে আমার চোখের সামনে প্রথম ভেসে উঠলো সীবা মরূদ্যানের ছবি।

বহু বছর ধরে আমার সযত্নে লালিত বাসনাগুলির একটি ছিলো এই সুদূর মরূদ্যানটি একবার দেখার, যা ছিলো এককালে একটি এ্যামন মন্দিরের পীঠস্থান এবং প্রাচীন বিশ্বের সর্বত্র মশহুর এক দৈবজ্ঞের লীলাভূমি। কিন্তু যে কারণেই হোক, আমার সেই বাসনা আগে কখনো সফল হয়নি। আর আজ, ঊষার উদয়কালে সেই মরূদ্যান প্রসারিত রয়েছে আমার সম্মুখে : একটি নিঃসংগ পাহাড়কে ঘিরে আছে বিস্তীর্ণ পাম-বীথি; আর, সেই পাহাড়টিতে শহরের ঘরবাড়িগুলি—যাদের ভিত্তি রয়েছে শিলার গভীরে নিহিত গুহানিবাসেরই মতো-স্তরের পর স্তর উঠে গেছে উপরের দিকে, পাহাড়টির সমতল শীর্ষদেশের উপর দণ্ডায়মান একটি উঁচু কৌণিক মীনার অভিমুখে; এ এমন একটি ভেঙে পড়া গাঁথুনির অদ্ভুত জগাখিচুড়ি যা মানুষ কেবল স্বপ্নেই দেখে থাকে... একটি প্রবল বাসনা আমাকে পেয়ে বসেঃ এর রহস্যজনক প্রাচীর ভেদ করে এর মধ্যে ঢুকে পড়ি এবং সেই সব অলিগুলিতে ঘুরে বেড়াই যা ফিরাউনদের আমল প্রত্যক্ষ করেছে; আর সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখি যেখানে লিডিয়া রাজা ক্রীসাস্‌কে দৈবজ্ঞ শুনিয়েছিলেন তাঁর বিনাশের ভবিষ্যদ্বাণী আর ম্যাসিডোনিয়ার আলেকজাণ্ডারকে সংবাদ দিয়েছিলেন তাঁর বিশ্ববিজয়ের।

কিন্তু এবারও আমার এই বাসনা অপূর্ণই থেকে গেলো। যদিও এতো নিকটে, তবু সীবা শহরটি আমার জন্য বন্ধই থেকে যাবে—যেখানে অপরিচিত বা বিদেশী লোক কখনো আসে না। কারণ যে-কোনো নতুন লোক এলেই সে সংগে সংগে নযরে পড়ে যাবে সবার। বহির্জগতের সংস্পর্শ থেকে এতো দূরের কোনো স্থান ভিজিট করা সত্যি বোকামীর কাজ হবে। কারণ, লিবিয়ার প্রায় সীমান্তে অবস্থিত বলে মিসরের সীমান্ত প্রশাসন এর উপর সবচেয়ে কড়া নযর রাখে। আর এতেও সন্দেহ নেই যে, ইতালীর বেতনভোগী গুপ্তচরে এ জা'গাটি পূর্ণ। এজন্য এ সফরে সীবা দর্শন আমার কিসমতে নেই। দুঃখের সাথে আমি নিজকে সান্ত্বনা দিয়ে সীবার চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলি।

আমরা একটি প্রশস্ত বৃত্ত পথে শহরের কিনার ঘুরে শেষপর্যন্ত এক আরণ্যক পাম্-ঝোপের নীচে তাঁবু খাটাই। আমাদের ইচ্ছা ছিলো না যে, সীমান্তের এতো কাছে যে সময়টুকু অপেক্ষা করা নেহাতই প্রয়োজন, তার বেশি আমরা এখানে আবস্থান করি। এজন আবদুল্লাহ বিশ্রাম না করেই দ্রুত উট হাঁকিয়ে ছুটে গেল নিকটবর্তী পল্লীটিতে একটি লোককে খোঁজার জন্য, যার উপর সাইয়িদ আহমদ দায়িত্ব দিয়েছিলেন সীমান্ত পার হয়ে আমাদের সাথে দেখা করতে। কয়েক ঘণ্টা পর সে ফিরে এলো দু'জন নতুন রাহনুমাকে নিয়ে, আর আনলো চারটি টাটকা নবীন উট, যা আমাদের বহন করে নিয়ে যাবে সামনের

দিকে। এই রাহ্নুমারা হচ্ছে জাবল আখ্দারের বারা'সা বেদুঈন কবিলার লোক; এরা উমর আল্-মুখতারের নিজস্ব লোক। বিশেষ ক'রে তিনি ওদের পাঠিয়েছেন ইতালীর অধিকৃত জাগ্বুব্ ও জালু নামক দুটি মরুদ্যানের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটুকুর মধ্যে দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে সাইরেনিকার মালভূমি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য। ওখানেই উমরের সাথে দেখা করতে হবে আমাকে।

আবদুল্লাহ্ এবং তার বন্ধু মিসরে তাদের গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে যাবার জন্য আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। খলিল ও আবদুর রহমান—এই দুই 'মুজাহিদিনের' পথ নির্দেশে আমরা যাত্রা করি আমাদের হপ্তাদীর্ঘ পথে প্রায় পানিশূন্য মরু-স্তেপ অঞ্চলের ভেতর দিয়ে, যা ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠে গেছে জাব্ল আখ্দারের দিকে। আমি জীবনে যতো মরু সফর করেছি তার মধ্যে এটিই ছিলো সবচেয়ে কঠিন; যদিও সতর্কতার সাথে দিনের বেলা আত্মগোপন করলে এবং কেবল রাতের বেলা পথ চললে ইতালীয় পাহারাদারদের নযরে পড়ার আশংকা খুব বেশি ছিলো না। তবু দূরে দূরে অবস্থিত ইঁদারাগুলি এড়িয়ে চলার আবশ্যকতা এ দীর্ঘ সফরকে একটা দুঃস্বপ্ন করে তোলে। কেবল একবারই আমরা ওয়াদি আল্-ম্রার একটি পরিত্যক্ত ইঁদারা থেকে আমাদের উটগুলিকে পানি খাওয়াতে পারলাম এবং আমাদের মশকগুলি আবার ভরে নিতে সক্ষম হলাম। আর এতেই আমরা প্রায় ভেঙে পড়ি।

যে-সময়ে ইঁদারাটিতে পৌঁছুতে পারবো বলে আমরা আশা করেছিলাম, সেখানে পৌঁছুই তার পরে। আসলে, আমরা যখন আপনাদের জানোয়ারগুলির জন্য পানি তুলতে শুরু করি, তখন পুব আসমানে সূর্যের আভাস দেখা দিচ্ছে আর যখন আমরা তা শেষ করলাম, তখন সূর্য গিয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিম আসমানে দিগন্তের উপরে। খলিলের কথামাতো আমাদের এখনো পুরা দু'ঘণ্টা কাটাতে হবে সেই নিচু পাথুরে জায়গাটিতে পৌঁছুতে, যা হবে দিনের বেলা আমাদের লুকানোর স্থান। কিন্তু আমরা যেই আমাদের সফর শুরু করেছি, অমনি একটি উড়োজাহাজের অশুভ গুন-গুন আওয়াজ মরুভূমির নীরবতাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়ঃ এবং কয়েক মিনিট পরেই একটি ছোট্ট একক পাইলট-চালিত উড়োজাহাজ আমাদের মাথার উপর দেখা দেয় এবং সোজা নিচে নেমে ক্রমে নিচু হয়ে আসা চক্রের আকারে ঘুরতে থাকে। গা ঢাকা দেবার কোনো জায়গাই ছিলো না। তাই, উট থেকে লাফিয়ে নেমে আমরা ছিটকে পড়ি, আর ঠিক সেই মুহূর্তে পাইলট তার কামান থেকে গুলী শুরু করে।

—'শুয়ে পড়ো, মাটির উপর শুয়ে পড়ো, আমি চীৎকার করে উঠি— 'একটুও নড়ো না—মরার মতো পড়ে থাকো।

কিন্তু খলিল, মুজাহিদীনে'র সাথে তার বহু বছরের জীবনে এ ধরনের মুকাবিলার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই বহু বার তার হয়েছে, 'মরার ভান' করে সে পড়ে থাকলো না। সে একটি পাথরের উপর মাথা রেখে চিত হয়ে শুয়ে পড়লো এবং উচু করে তুলে ধরা একটি হাঁটুর ভরে তার রাইফেল ফেলে অগ্রসরমান উড়োজাহাজটির উপর গুলী করতে শুরু করলো, এলোপাতাড়ি নয়, প্রত্যেকবারই গুলী ছোঁড়ার আগে সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য স্থির ক'রে, যেনো কোনো নির্দিষ্ট টার্গেটে গুলী করার প্র্যাকটিস করছে। এ ছিলো ভয়ানক এক দুঃসাহসিক

কাজ। কারণ উড়োজাহাজটি ফ্লাট ডাইভ মেরে সোজা ছুটে আসছিলো তার দিকে, বালুর উপর বুলেট ছুঁড়তে ছুড়তে। কিন্তু খলিলের একটি গুলি নিশ্চয়ই উড়োজাহাজটিতে লেগেছিলো। কারণ, মুহূর্তের জন্য পালট খেয়ে উড়োজাহাজটি তার নাক আকাশমুখো করে দ্রুত উপরে উঠে গেলো। পাইলটটি হয়তো ভেবেছিলো, নিজের নিরাপত্তার বিনিময়ে চারজন লোককে গুলী করা লাভজনক হবে না। সে দু'একবার আমাদের উপর ঘুরে তারপর পুব মুখে জাগ্‌বুবের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

—ঐ ইতালিয়ান কুত্তার বাচ্চারা কাপুরুষ বুজ্‌দীল, 'আমরা যখন আবার জমায়েত হচ্ছি, তখন খলিল শান্তভাবে বলে, ওরা হত্যা করতে চায়—কিন্তু নিজের চামড়ায় আঁচড় লাগুক, তা চায় না।'

আমরা কেউই যখম হইনি। কিন্তু আবদুর রহমানের উটটি মরে গেলো। তার গদি এবং থলে আমরা যায়েদের উটের পিঠে চাপিয়ে দেই এবং এখন থেকে সে যায়েদের পেছনে হাল্‌কা গদিতে বসে চলতে থাকে।

তিন দিন পর আমরা জাবল আখ্‌দারের জুনিপার বনাঞ্চলে প্রবেশ করি এবং যে-ঘোড়াগুলিকে আমাদের জন্য একদল 'মুজাহিদীনে'র হিফাযতে এক গোপন জায়গায় রাখা হয়েছিলো, সেগুলির সাথে কৃতজ্ঞতার সাথে আমরা ক্লান্ত উটগুলিকে বদল করি। এখন থেকে মরুভূমি আমাদের পেছনে থাকবে। আমরা একটি পাহাড়ি শিলাময় মালভূমির উপর দিয়ে আমাদের ঘোড়া ছুটাই। মালভূমিটি অসংখ্য শুকনা স্রোত পথ দ্বারা জালের মতো চিহ্নিত আর এখানে রয়েছে জুনিপার তরুরাজি, যা কোনো কোনো জায়গায় প্রায় অভেদ্য জংগল হয়ে আছে। ইতালী অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে এই পথচিহ্নহীন বনাঞ্চলটি হচ্ছে 'মুজাহিদীনে'র শিকারের জায়গা।

... .

আরো চার রাতের সফর আমাদের নিয়ে পৌছালো ওয়াদি-আত্‌-তাআবান নামক এক স্থানে। খুব সঠিকভাবেই জা'গাটির নাম রাখা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে, 'শ্রান্ত ক্লান্ত জনের উপত্যকা'। এখানেই উমর আল-মুখতারের সংগে আমাদের মুলাকাত করার কথা। গভীর অরণ্যে ঢাকা একটি খাদের মধ্যে নিজেদের নিরাপদে লুকিয়ে আমরা আমাদের ঘোড়াগুলিকে একটি শিলার আড়ালে সামনের দু'পায় রশির বেড়ি পরিয়ে জাবল-আখ্‌দারের সিংহের আগমনের অপেক্ষায় থাকি। আজকের রাতটা বড়ো ঠাণ্ডা, নক্ষত্রহীন আর মর্মর ধ্বনি তোলা নীরবতায় ভারাক্রান্ত!

সিদি উমর আসতে আরো কয়েক ঘণ্টা লাগবে; আর রাতটা যেহেতু গাঢ় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, 'আমাদের দুই বারা'সা বন্দু দেখলো, এই সময়ের মধ্যে, কয়েক মাইল পুবে বু-স্‌ফাইয়ার ইঁদারাগুলি থেকে আমাদের মশকগুলি আবার ভর্তি করে না নেওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই! সত্যি, বু-স্‌ফাইয়া থেকে আধ মাইলেরও কম দূরে রয়েছে একটি সুরক্ষিত ইতালীয় চৌকি—

—'কিন্তু' খলিল বলে, 'ঐ খেকী কুত্তারা অমন ঘুট্‌ঘুটে আঁধার রাতে তাদের দেওয়ালের বাইরে আসতে হিম্মত করবে না।'

এভাবে, যায়েদকে সংগে নিয়ে খলির দুটি খালি মশকসহ ঘোড়ায় চড়ে রওনা দেয়। শিলাময় পথের উপর দিয়ে চলতে গিয়ে যাতে কোনো আওয়াজ না হয়, সেজন্য ওরা ছেঁড়া কাপড় পেঁচিয়ে ওদের ঘোড়ার খুর বেঁধে দেয়। ওরা দু'জন অন্ধকারে হারিয়ে গেলে, আমি আর আবদুর রহমান নিজেদের গরম করার জন্য ঘেঁষাঘেষি ক'রে নিচু শিলায় হেলান দিয়ে বসি। আগুন জ্বালানো হবে খুবই বিপজ্জনক।

ঘণ্টাখানেকের পর জুনিপার গাছগুলির মধ্যে কয়েকটি শাখা মর্মর করে উঠলো এবং পাথরের উপর একটি স্যাণ্ডেলের মোলায়েম শব্দ হলো। মুহূর্তেই সতর্ক আমার সংগী রাইফেল হাতে সোজা দাঁড়িয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্যে এবং অন্ধকারের দিকে তাকায় তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে। একটি নিচু গলার ডাক—যা শিয়ালের কান্নার চেয়ে অন্যরকম নয়—ভেসে এলো জংগলের মধ্য থেকে। আর আবদুর রহমান মুখের সম্মুখে হাত দুটিকে পেয়ালার মতো করে ধরে একই ধরনের ধ্বনি দিয়ে তার জবাব দেয়। আমাদের সামনে দুটি মানুষের মূর্তি দেখা দিলো। ওরা ছিলো পায়দল এবং রাইফেলধারী। আরো কাছে আসার পর ওদের একজন বললো ঃ 'আল্লাহর পথ'—এবং তার উত্তরে আবদুর রহমান বলে ঃ 'লা হাওলা ওয়ালা কূ'ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্'— 'আল্লাহ ছাড়া কোন ক্ষমতা নেই, কোনো শক্তি নেই কারো' যা আমার কাছে এক সাংকেতিক শব্দ বলেই মনে হলো।

এই দু'জন নতুন আগন্তুকের মধ্যে দুজনেরই পরণে ছিলো লিবীয় বদ্দুদের চাদর, টোটাফাঁটা 'জার্দ্'। ওদের একজন আবদুর রহমানকে চিনে বলে মনে হলো। কারণ আবদুর রহমান তার দু'হাত ধরে আন্তরিকতার সাথে তাকে সম্বর্ধনা জানায়। আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলে দুই 'মুজাহিদীন' পরপর আমার হাত ধরে একইভাবে। ওদের একজন বলে ঃ 'ফি আমানিল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনার সহায় হোন, সিদি উমর আসছেন।'

আমরা উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। সম্ভবত মিনিট দশেক পরে আবার জুনিপার ঝোঁপের মধ্যে পাতার সর্‌সর্ শব্দ...তারপর ছায়ার ভেতর থেকে বের হয়ে আসে আরো তিনটি মানুষ তিন দিক থেকে এবং উদ্যত রাইফেল তোলে এসে পড়ে একেবারে আমাদের উপর। ওরা যখন বুঝতে পারলো, ওরা আমাদেরই মুলাকাতের ইন্তেজারিতে ছিলো, সংগে সংগেই ওরা আবার ছড়িয়ে পড়লো ঝোঁপের ভেতর বিভিন্ন দিকে। স্পষ্টত ওরা ওদের নেতার নিরাপত্তার উপর সতর্ক নযর রাখার জন্যই এভাবে ঝোঁপের ভেতর নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

আর তারপর তিনি এলেন...এলেন একটি ছোট্ট ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে, যার খুর ছিলো কাপড় দিয়ে মোড়ানো। তাঁর দু'পাশে দু'জন ক'রে লোক এলো হেঁটে হেঁটে, আর তাঁর পেছনে পেছনে এলো আরো কয়েকজন। আমরা যে শিলাগুলিতে ঠেস্ দিয়ে অপেক্ষা করছিলাম, তিনি যখন তার পাশে এসে পৌছুলেন, তখন তাঁর লোকদের একজন তাঁকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করলো আর আমি দেখতে পেলাম, তাঁর চলতে কষ্ট হচ্ছে (পরে আমি জানতে পেরেছিলাম, মাত্র দশদিন আগে একটি হঠাৎ আক্রমণে তিনি যখম হয়েছিলেন); উদীয়মান চাঁদের আলোতে আমি তাঁকে এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ঃ একজন মাঝারি সাইজের লোক, মজবুত যাঁর হাড্ডিঃ খাটো, বরফের মতো সাদা দাড়ি তাঁর গভীর রেখা-চিহ্নিত মুখমণ্ডলের ফ্রেমের কাজ করছে। চোখ দু'টি তাদের কোটরের গভীরে

লুকানো; চোখের চারপাশে যে ভাঁজ পড়েছে, তাতে আন্দাজ করা যায়, ভিন্ন অবস্থায় তাঁর চোখ দুটি হয়তো সহজেই হাসিতে স্ফূরিত হতো। কিন্তু এখন আর তাঁর এ চোখে কিছুই নেই, অন্ধকার যন্ত্রণা আর হিম্মত ছাড়া।

—'খোশ আম্‌দেদ, বৎস,'—এবং তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন তাঁর চোখ দুটি আমাকে আমার পা থেকে মাথা তক দেখছিলো, তীক্ষ্মভাবে, যেনো আমাকে যাচাই করা হচ্ছে—এমন মানুষের চোখ, বিপদ যার নিত্যসাথী!

তাঁর লোকদের একজন একটি কম্বল বিছিয়ে দিলো যমিনের উপর আর সিদি উমর তাঁর শরীরের সমস্ত ভার ছেড়ে সেখানেই বসে পড়লেন। আবদুর রহমান নুয়ে তাঁর হাতে চুমু খায় এবং সর্দারের ইজাযত নিয়ে মাথার উপর ঝুলে থাকা শিলার কভারের নীচে সামান্য আগুন ধরাবার জন্য বসে পড়ে। সে আগুনের নিষ্প্রভ দীপ্তিতে সিদি উমর পড়লেন চিঠিখানা, যা আমি সাইয়িদ আহমদের কাছ থেকে সংগে করে এনেছি। চিঠিটি তিনি যত্নের সংগে পড়েন, তারপর সেটি ভাঁজ করে কিছুক্ষণের জন্য রাখেন তাঁর মাথার উপর, শ্রদ্ধা ও ভক্তির এমন একটা ভংগির সাথে, যা বলতে গেলে, আরব দেশে কখনো দেখা যায় না, দেখা যায় উত্তর আফ্রিকায়, প্রায়ই। আর তারপর স্মিত হাসির সংগে তিনি আমার দিকে মুখ ফিরান ঃ

—'সাইয়িদ আহমদ, আল্লাহ্ তাঁর হায়াত দারাজ করুন, তোমার সম্পর্কে অনেক ভাল কথা বলেছেন। তুমি আমাদের সাহায্য করতে চাও। কিন্তু আমি জানি না, সর্বশক্তিমান করুণাময় আল্লাহ্ ছাড়া আর কোথেকে মদদ আসতে পারে! বলতে কি, আমরা আমাদের জন্য বরাদ্দ সময়ের প্রায় শেষ কিনারে এসে পড়েছি!'

—'কিন্তু এই পরিকল্পনা যা সাইয়িদ আহমদ উদ্ভাবন করেছেন'—আমি মাঝপথে প্রশ্ন করি—'সেটি কি একটি নতুন সূচনা হতে পারে না? যদি নিয়মিত সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায় এবং ভবিষ্যত অভিযানের জন্য কুফ্‌রাকে কেন্দ্র করা যায়, তা'হলে কি ইতালীয়দের প্রতিহত করা সম্ভব হবে না?'

সিদি উমর যে স্মিত হাস্যের সাথে আমাকে জবাব দিলেন, তেমন তিক্ত ও অসহায় হাসি আমি জীবনে কখনো দেখিনিঃ 'কুফ্‌রা...? কুফ্‌রা আমরা হারিয়েছি। প্রায় পনেরো দিন আগেই তা ইতালীয়রা দখল করে নিয়েছে....।'

খবরটি আমাকে স্তম্ভিত করে দেয়। অতীতের এই সব ক'টি মাস আমি আর সাইয়িদ আহমদ এই ধারণার উপরই আমাদের পরিকল্পনা তৈরি করে চলেছিলাম যে, দৃঢ় প্রতিরোধের জন্য কুফ্‌রাই হতে পারে নতুন ক'রে সমাবেশের কেন্দ্র। এখন, কুফ্‌রা যখন হাতছাড়া হয়ে গেছে সেনুসিদের জন্য জাবল আখ্‌দারের নিপীড়িত মালভূমি ছাড়া আর কিছুই নেই।—কিছুই নেই নিশ্চিতভাবে ক্রমশঃ এঁটে আনা ইতালীয় দখলের অভিশাপ ছাড়া, স্থানের পর স্থান হারানো, মন্থর এবং অনিবার্যভাবে গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু মুহূর্তের জন্যও চাপ শিথিল না হয়ে!

—'কুফ্‌রার পতন হলো কেমন করে?'

একটি ক্লান্ত ভংগিতে সিদি উমর তাঁর লোকদের একজনকে আরো কাছে আসতে ইংগিত করেন ঃ 'এই লোকটি আপনাকে বলবে সে কাহিনী...কুফরা থেকে যে ক'টি লোক

পালিয়ে বেঁচেছে, ও তাদেরই একজন। মাত্র গতকাল এসেছে।'

কুফ্‌রার লোকটি আমার সামনেই তার পাছার উপর বসে পড়ে এবং তার ছেঁড়া জোড়াতালি দেয়া 'বার্নাসটি' তার চারদিকে টেনে জড়ো করে। সে কথা বলে আস্তে আস্তে, গলার আওয়াজে আবেগের কোনো কাঁপন না তুলে ; কিন্তু যে-সব বালা-মুসিবত সে দেখেছে, তার দৃঢ় মুখমন্ডলে, তা প্রতিবিম্বিত হয়েছে বলে মনে হলো।

—'ওরা আমাদের উপর হামলা করে তিন দিক থেকে তিনটি ব্যূহ রচনা ক'রে বহু সাঁজোয়া গাড়ি আর ভারী কামান নিয়ে। ওদের উড়োজাহাজগুলি একেবারে নিচুতে নেমে আসে এবং বোমা ফেলে বাড়ি-ঘরের উপর, মসজিদের উপর এবং খেজুর বাগিচার উপর। হাতিয়ার বহন করতে পারে এমন পুরুষের সংখ্যা আমাদের মধ্যে ছিলো মাত্র কয়েক শ'। এদের বাদ দিয়ে যারা বাকী রইলো, তারা হচ্ছে স্ত্রীলোক, ছেলে-মেয়ে এবং যয়ীফের দল। আমরা লড়ি একের পর এক প্রত্যেকটি ঘর বাঁচাবার জন্য। আমাদের তুলনায় ওরা ছিলো অনেক বেশি শক্তিশালী। আখেরে কেবল আল- হাওয়ারী গ্রামটি রইলো আমাদের দখলে। ওদের সাঁজোয়া গাড়ির মুকাবিলায় আমাদের রাইফেলগুলি হয়ে পড়লো অকেজো এবং ওরা আমাদের পরাভূত করে ফেললো। আমরা মাত্র ক'জন বেঁচে যাই। আমি আত্মগোপন করি পাম্-বাগিচায় একটি সুযোগের প্রতীক্ষায়, যাতে আমি ইতালীয় ব্যূহের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে পড়তে পারি। আর সারারাত আমি শুনলাম স্ত্রীলোকদের যন্ত্রণাকাতর চীৎকার, কারণ ওদের উপর বলাৎকার করছিলো ইতালীয় সৈন্যরা আর ইরিত্রীয় 'আশকারীরা'। পরদিন, এক বুড়ি আমার জন্য কিছু পানি আর রুটি নিয়ে এলো, আমি যেখানে লুকিয়েছিলাম, সেখানে। সে আমাকে বললোঃ যে-সব লোক বেঁচে আছে, ইতালীয় জেনারেল তাদের সবাইকে সাইয়িদ মুহাম্মদ আল-মাহদীর কবরের কাছে জড়ো করে এবং তাদের চোখের সামনেই একখন্ড কুরআন ছিঁড়ে টুকরা টুকরা ক'রে মাটির উপর নিক্ষেপ ক'রে এবং তার উপর নিজের বুট রেখে চীৎকার করে ওঠেঃ 'তোদের বন্দু নবী এখন তোদের সাহায্য করুক না, যদি তার ক্ষমতা থাকে।' এরপর সে হুকুম দেয় মরূদ্যানের সব পাম্ গাছ কেটে ফেলতে, ইঁদারাগুলিকে ধ্বংস ক'রে দিতে এবং সাইয়িদ আহমদের গ্রন্থাগারের সব কিতাব জ্বালিয়ে দিতে। পরদিন সে আদেশ করে—আমাদের কিছু মুরুব্বিজন ও 'উলামা'কে তোলা হবে একটি উড়োজাহাজে—এবং ওঁদের অনেক উপরে উড়োজাহাজ থেকে নিক্ষেপ করা হলো মাটির উপর—চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য...তারপরের রাতও আমি সারা বেলা আমার লুকানোর স্থান থেকে শুনতে পাই স্ত্রীলোকদের চীৎকার, আর সেপাইদের অট্টহাসি আর রাইফেলের শব্দ..। শেষে আমি সেই অন্ধকার রাতে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়ি মরুভূমিতে। আর একটি ছোটো উট পেয়ে তারই উপর সওয়ার হয়ে উধাও হই...'

কুফ্‌রার লোকটি তার ভয়ংকর কাহিনী শেষ করলে সিদি উমর তাকে সস্নেহে মোলায়েমভাবে নিজের কাছে টেনে নিয়ে পুনরাবৃত্তি করেন, 'কাজেই বৎস, দেখতে পাচ্ছো আমরা সত্যই আমাদের বরাদ্দ সময়ের কিনারে এসে পড়েছি।' এবং যেনো আমার চোখের অব্যক্ত প্রশ্নের জবাবেই আরো বললেন ঃ 'আমরা লড়ছি, যেহেতু আমরা লড়তে বাধ্য

আমাদের ধর্ম এবং আমাদের আযাদীর জন্য, যতোক্ষণ না আমরা হানাদারদের কোলে ঢলে পড়ছি। অন্য কোনো বিকল্প নেই আমাদের জন্য—'ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি উন'—'আমরা আল্লাহ্‌রই এবং তাঁরই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।' আমরা আমাদের স্ত্রীলোক আর বালক-বালিকাদের পাঠিয়ে দিয়েছি মিসর, যেনো, আল্লাহ যখন আমাদের মৃত্যু চান, তখন ওদের নিরাপত্তা সম্পর্কে আমাদের আর কোনো দুশ্চিন্তা করতে না হয়।'

চাপা গুঞ্জন ধ্বনি অন্ধকার আসমানের কোনো জায়গায় ধীরে ধীরে শ্রুতিগোচর হয়ে ওঠে, যেনো, সজ্ঞান চিন্তা ছাড়াই সিদি উমরের লোকদের একজন অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বালু ছিটাচ্ছে আগুনের উপর। জ্যোছনা-আলোকিত মেঘের পটভূমিকায় একটা অস্পষ্ট আকার ছাড়া আপর কিছুই মনে হলো মনে হলো না উড়োজাহাজটিকে; বেশ নিচু দিয়ে, আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেলো পুব দিকে এবং তার ইঞ্জিনের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো।

—'কিন্তু সিদি উমর,' আমি বলি—'এখনো যখন একটি পথ খোলা রয়েছে আপনার জন্য এবং আপনার 'মুজাহিদীনে'র জন্য—মিসরে সরে পড়াই কি বেহ্‌তর নয়? কারণ, মিসরে সাইরেনিকা থেকে আগত বহু মুহাজিরকে জমায়েত করা এবং একটা অধিকতরো কার্যকর ফৌজ গড়ে তোলা সম্ভব হতেও পারে। এখানকার সংগ্রাম কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখাই উচিত, যাতে করে লোকেরা তাদের শক্তি কিছুটা ফিরে পেতে পারে...আমি জানি, মিসরে ব্রিটিশ শক্তি—তাদের দু'পাশে শক্তিশালী ইতালীয় ফৌজের অবস্থান রয়েছে—এই চিন্তায় খুব সুখী হতে পারেনি। আল্লাহ্ জানেন, আপনারা যদি ওদের বোঝাতে পারেন যে, আপনারা ওদের দুশমন মনে করেন না, তা' হলে ওরা হয়তো আপনাদের প্রস্তুতি নিয়ে মাথা ঘামাবে না..।'

—'না বাপ, এ আর সম্ভব নয়, অনেক বেশি দেরী হয়ে গেছে। তুমি যা বলেছো তা সম্ভব ছিলো আজ থেকে পনেরো-ষোলো বছর আগে, সাইয়িদ আহমদ তুর্কীকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে। তুর্কী অবশ্য আমাদের সাহায্য করেনি.....। অনেক দেরী হয়ে গেছে; এখন আর তা সম্ভব নয়। আমাদের ভাগ্যকে সহজতরো করার জন্য ব্রিটেন আর তার কড়ে আঙুলও তুলবে না; আর ইতালীয়রা তো আমাদের নির্মূল করার জন্যই বদ্ধপরিকর। ভবিষ্যতে প্রতিরোধের সকল সম্ভাবনা চুরমার করে দিতে ওরা কসম খেয়েছে। আমি আর আমার অনুসারীরা যদি এখন মিসর যাই, আমরা আর কখনো ফিরে আসতে পারবো না। আর তুমিই বলো, কী করে আমরা আমাদের লোকজনকে ত্যাগ করতে পারি এবং নেতৃত্বহীন অবস্থায় রেখে চলে যেতে পারি—আল্লাহ্‌র দুশমনদের দ্বারা ধ্বংস হওয়ার জন্য?

—'সাইয়িদ ইদরীস কী বলেন? তিনিও কি আপনার মত পোষণ করেন, সিদি উমর?'

—'সাইয়িদ ইদরীস হচ্ছেন এক মহৎ পিতার সুবোধ পুত্র, একজন ভালো মানুষ। কিন্তু এ ধরনের একটি সংগ্রাম বরদাশ্‌ত করার কলিজা আল্লাহ্ তাঁকে দেননি...'

সিদি উমরের কণ্ঠস্বরে নৈরাশ্য ছিলো না—ছিলো গভীর আগ্রহ, যখন তিনি এভাবে তাঁর দীর্ঘ আযাদী সংগ্রামের অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে আমার সংগে আলাপ করছিলেনঃ তিনি জানতেন, মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই অপেক্ষা করছে না তাঁর জন্য। মৃত্যুভয় তাঁর নেই, মৃত্যু তিনি চাননি। কিন্তু মৃত্যুকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টাও তিনি করেননি এবং আমি নিশ্চিত

যে, কী ধরনের মৃত্যু যে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে, তা–ও যদি তিনি জানতেন, তবু তা এড়াবার চেষ্টা তিনি করতেন না। মনে হলো, তিনি তাঁর শরীর এবং মনের প্রতিটি অণুপরমাণুতে সচেতন যে, প্রত্যেক মানুষই তার পরিণাম বহন করে চলেছে নিজের সংগে— সে যেখানেই যাক এবং যে কাজই করুক।

একটি মৃদু চাঞ্চল্য শ্রুতিগোচর হয়ে ওঠে ঝোঁপটির মধ্যে, এতো মৃদু যে স্বাভাবিক অবস্থায় হয়তো তা টের পাওয়া যেতো না; কিন্তু তখনকার অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক ছিলো না। অপ্রত্যাশিত এলাকা থেকে যে–কোনো রকম বিপদের আশংকায় আমার কান দুটি খাড়া রেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, চুপি চুপি পদচারণা আকস্মিকভাবে থেমে গেছে এবং কয়েক মিনিট পরই আবার শুরু হলো তার অস্পষ্ট ধ্বনি। ঝোঁপটি ফাঁক হয়ে গেলো আর তার মধ্য থেকে বের হয়ে এলো যায়েদ এবং খলিল। তাদের সংগে দু'জন সান্ত্রী। তারা যে ঘোড়া ক'টি টেনে টেনে নিয়ে এসেছে, সেগুলির পিঠে চাপানো হয়েছে বোঝাই মশক। এমনভাবে মশকগুলি পানিতে ভর্তি করা হয়েছে যে, সেগুলি ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। সিদি উমরকে দেখে খলিল ছুটে আগিয়ে গেলো নেতাকে চুমু খাওয়ার জন্য, যখন আমি পরিচয় করিয়ে দিই যায়েদকে। সিদি উমর তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখলেন যায়েদের কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ মুখমন্ডল আর বাহুল্য–বর্জিত শরীরের উপর, স্পষ্ট অনুমোদনের সাথে। যায়েদের কাঁদের উপর তিনি হাত রেখে বললেন ঃ

—'আমার পিতৃপুরুষদের দেশ থেকে আগত হে ভাই, তোমাকে খোশ্ আম্‌দেদ। তুমি কোন্ আরব গোত্রের লোক?'—এবং যায়েদ যখন বললো তার কওমের নাম শাম্মার, উমর স্মিত হাসির সাথে মাথা নেড়ে বললেন ঃ 'ওহো, তুমি তা'হলে সেই হাতিম আত তাইর কওমের লোক, মানুষের মধ্যে যিনি ছিলেন সবচেয়ে মহানুভব...।[১]

সিদি উমরের একজন লোক একটি টুকরা কাপড়ে বাঁধা কিছু খেজুর আমাদের সামনে রাখলে তিনি নিজে এ সামান্য খাবারে আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। আমরা খেয়ে ওঠার পর প্রবীণ যোদ্ধা দাঁড়িয়ে গেলেন ঃ

—'ভায়েরা, এখন এখান থেকে সরে পড়ার সময়। আমরা বু–স্কাইয়ার ইতালীয় চৌকির একেবারেই কাছে রয়েছি। সূর্যোদয় পর্যন্ত এখানে থাকা হবে বিপজ্জনক।'

আমরা আমাদের ভাঙাচোরা ক্যাম্প গুছিয়ে ফেলি এবং সওয়ার হয়ে সিদি উমরকে অনুসরণ করি। আমাদের পেছনে পেছনে চলে তাঁর বাকী লোকেরা পায়ে হেঁটে। যেই আমরা খাদ থেকে বের হয়েছি, আমি দেখতে পেলাম সিদি উমরের দলটি—যা ধারণা করেছিলাম, তার থেকে অনেক বড়োঃ এক এক ক'রে কালো ছায়ামূর্তি টিলার আড়াল থেকে, গাছের পেছন থেকে তীরের মতো ছুটে এসে আমাদের সারিতে যোগ দিলো—যখন আরো কয়েকজন লোককে ডানে–বামে দূরে দূরে রাখা হয়েছে পাহারা দেয়ার জন্য। কোনো সাধারণ পর্যবেক্ষকের পক্ষেই ধারণা করা সম্ভব হতো না যে, আমাদের চারপাশে প্রায় ত্রিশজন লোক রয়েছে; কারণ ওদের প্রত্যেকেই আগাচ্ছে নীরবে, রেড ইণ্ডিয়ান গুপ্তচরদের মতো।

---

১. প্রাগ-ইসলামিক যুগের এই আরব যোদ্ধা ও কবি তাঁর মহানুভবতা ও বদান্যতার জন্য মশহুর। তাঁর নাম এখন এই গুণের সমার্থক হয়ে উঠেছে, যে গুণটির প্রতি আরবেরা দিয়ে থাকে পরম গুরুত্ব। যায়েদ শাম্মার গোত্রের লোক। শাম্মারেরা হাতিমের কওম — তা'ই থেকে উদ্ভূত বলে ওরা দাবী করে।

সূর্যোদয়ের আগে আমরা পৌছুই উমর আল্‌-মুখ্‌তারের নিজস্ব 'দাওঅর' বা গেরিলা বাহিনীর প্রধান তাঁবুতে। তখন দু'শর কিছু বেশি লোক নিয়ে গঠিত ছিলো এ বাহিনী। তাঁবু ফেলা হয়েছে এক গভীর সংকীর্ণ গিরিখাদের মধ্যে আর উপরে ঝুলে থাকা শিলাখণ্ডগুলির উপর জ্বলছে ছোটো আগুন। কয়েকজন লোক ঘুমাচ্ছে মাটির উপর। অন্যেরা, সুবহে সাদেকের ধূসরতায় যাদের মনে হচ্ছে কতকগুলি অস্পষ্ট ছায়ার মতো—তাঁবুর নানা রকম দায়িত্বে ব্যস্ত ঃ ওরা ওদের অস্ত্রশস্ত্র সাফ করছে, পানি আনছে, খাবার রান্না করছে অথবা এখানে ওখানে গাছের সংগে যে অল্প ক'টি ঘোড়াকে বেঁধে রাখা হয়েছে সেগুলির পরিচর্যা করছে। প্রায় সকলেরই পরণে রয়েছে ছেঁড়া জোড়া-তালি দেয়া কাপড়। তখন কিংবা তার পরে, এই পুরা দলটিতে একটি সম্পূর্ণ 'জার্দ'[১] অথবা বার্নাস[২] আমি দেখিনি। অনেকেরই গায়ে রয়েছে ব্যাণ্ডেজ, যা দুশমনের সাথে ওদের সাম্প্রতিক মুকাবিলার সাক্ষ্য বহন করছে।

বিস্ময়ের সংগে দুটি স্ত্রীলোককে আমি দেখতে পাই এই তাঁবুতে ঃ একজন বৃদ্ধা, অপরজন তরুণী। ওরা একটি আগুনের পাশে বসে মোটা ভোতা সূঁচ দিয়ে তন্ময় হয়ে মেরামত করছে একটি ছেড়া জীন।

—'আমাদের এই দু'টি বোন, আমরা যেখানেই যাই, আমাদের সংগে যায়',—আমার নির্বাক বিস্ময়ের জবাবে সিদি উমর জানান,—'ওরা আমাদের স্ত্রীলোকদের সংগে মিসরে আশ্রয় নিতে রাযী হয়নি; ওরা হচ্ছে মা-বেটি। ওদের পরিবারের সব ক'টি পুরুষই মারা গেছে সংগ্রামে।'

দুদিন এবং এক রাত ধ'রে—যখন তাঁবু উঠিয়ে নেয়া হচ্ছিলো মালভূমির খাদ এবং জংগলের ভেতরে আরেক জায়গায়—সিদি উমর এবং আমি, 'মুজাহিদীনে'র জন্য নিয়মিত রসদ কী করে সরবরাহ করা যায়, তার প্রত্যেকটি সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এবং আলাপ-আলোচনা করি। ছিটেফোঁটা রসদ তখনো আসছিলো মিসর থেকে। মনে হলো ইতালীয়দের সংগে তাঁর সন্ধি—চুক্তির সময়ে, ব্রিটেনের সংগে যে মুহূর্তে সাইয়িদ ইদ্‌রীস একটি বোঝাপড়ায় আসেন, তখন থেকেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মিসরের অভ্যন্তরে সেনুসি তৎপরতাকে নতুন ক'রে কিছুটা সহনশীলতার সংগেই দেখতে ইচ্ছুক ছিলো—অবশ্য যতোক্ষণ তা সীমিত থাকে স্থানীয় গতিবিধির মধ্যে; বিশেষ ক'রে, যোদ্ধাদের যেসব ছোটো ছোটো দল ইতালীয় ব্যূহ ভেদ করে সমুদ্দুরের উপকূলে নিকটতম মিসরীয় শহর সেলুমে আসতো তাদের গনীমত বিক্রি করার জন্য, যার বেশির ভাগই ছিলো ইতালীয় খচ্চর, তাদের জন্য অতি-প্রয়োজনীয় খাদ্যের বিনিময়ে সেই দলগুলির প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, সরকারীভাবে লক্ষ্য রাখতো না। আসলে মুজাহিদীনে'র জন্য এ ধরনের অভিযান ছিলো চরম বিপজ্জনক এবং এ জাতীয় অভিযান প্রায়ই সম্ভব হতো না, বিশেষ ক'রে এ কারণে যে ইতালীয়রা খুব দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া তুলেছিলো মিসরের সীমান্ত বরাবর। সিদি উমর আমার সংগে একমত হন, একমাত্র বিকল্প হতে পারে, যে পথে আমি এসেছি সেই পথটিকে একটি রসদ সরবরাহের পথ হিসাবে ব্যবহার করা এবং মিসরের মরূদ্যান বাহরিয়্যা,

১ কম্বলের মতো পশমী চাদর, যা মিসর এবং লিভিয়ার লোকেরা পরে।
২ মাথা ঢাকা এক ধরনের পোশাক, যা উত্তর আফ্রিকার আরবও পরে।

ফারাফ্রা ও সীবায় গোপন ডিপো স্থাপন করা। কিন্তু এই পরিকল্পনা দীর্ঘ দিন ইতালীয়দের সতর্ক নযর এড়িয়ে চলতে সক্ষম হবে কি না, এ বিষয়ে তিনি ছিলেন খুবই সন্দিহান।

[উমরের আশংকা যে খুবই বাস্তবভিত্তিক ছিলো, তা প্রমাণিত হলো। কয়েক মাস পর এ ধরনের সরবরাহ নিয়ে একটি কাফেলা সত্যি 'মুজাহিদীনে'র নিকট পৌছেছিলো; কিন্তু কাফেলাটি যখন জাগবুব এবং জালুর মধ্যবর্তী ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়ে আগাচ্ছিলো তখনি তা ইতালীয়দের নযরে পড়ে যায়। এর পরপরই দু'টি মরূদ্যান থেকে সমান দূরে, মরূদ্যান দু'টির ঠিক মাঝখানে বির তারফাবিতে ইতালীয়রা একটি মজবুত চেকপোস্ট স্থাপন করে; আর প্রায় নিরবচ্ছিন্ন বিমান পাহারার সংগে এই চেকপোস্টটি নতুন ক'রে এ ধরনের অভিযানকে চরম বিপজ্জনক করে তোলে।]

এখন আমার ফেরার চিন্তা। আমি আমার এই পশ্চিমমুখী সফরে যে দীর্ঘ কষ্টকর পথ অনুসরণ করছি আমার সেই পথে ফিরে যেতে খুব উৎসাহ বোধ করছিলাম না। তাই সিদি উমরকে জিগ্‌গাস করি, এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত কোনো পথ পাওয়া যেতে পারে কি না। তিনি বললেন, একটি পথ আছে বটে, তবে তা বিপদসংকুল ঃ কাঁটা তার ভেদ করে সেলুমে পৌছুনো। তখন সেলুম থেকে ময়দা আনার জন্য একদল 'মুজাহিদীন' এ ধরনের একটি অভিযানে বের হতে প্রস্তুত ছিলো ; আমি চাইলে ওদের সংগে যোগ দিতে পারি। আমি তা'ই করবো বলে সিদ্ধান্ত নিই।

যায়েদ এবং আমি উমর আল্‌-মুখতারের কাছ থেকে শেষবারের মতো বিদায় নিই। আর কখনো তাঁর দেখা হবে না আমার সংগেঃ আট মাসেরও কম সময় পরে ইতালীয়রা উমরকে বন্দী করে এবং ফাঁসি দেয়...

উঁচু-নিচু ভূভাগের উপর দিয়ে এবং পূর্ব জাবল আখ্‌দারের জুনিপার অরণ্যের মধ্য দিয়ে কেবল রাতে রাতে প্রায় এক হপ্তা চলার পর আমাদের বিশ জনের এই দলটি মিসর-সাইরেনিকার সীমান্ত সেই স্থানটিতে পৌছুলো, যেখানটায় কাঁটা তার ভেদ করে ঢুকে পড়বো বলে আমরা পরিকল্পনা করছিলাম। উদ্দেশ্যহীনভাবে নির্বাচন করা হয়নি এ স্থানটি। সীমান্তের বেশির ভাগ জায়গার উপর কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হলেও তখনো সে বেড়া সম্পূর্ণ পুরা হয়নি। কোনো কোনো জায়গায়, যেমন এইখানে, কেবল মাত্র কাঁটা তারের বেড়া রয়েছে আট ফুট উঁচু এবং চার ফুট চওড়া অথচ এর মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে কাঁটাতারের বেড়ার তিনটি পৃথক পৃথক সারি, যা পাকা ভিতের উপর পোঁতা খুঁটির সংগে মোটা ভারী তারের অনেক প্যাঁচ কষে বাঁধা হয়েছে। আমরা যে জায়গাটি পছন্দ করেছি, তা থেকে সুরক্ষিত এই চৌকিটি ছিলো আধ মাইলের মতো দূরে। চৌকিটিতে সাঁজোয়া গাড়ি রয়েছে বলেও আমরা জানতাম। কিন্তু এ ছিলো দু'টি বিকল্পের মধ্যে একটি গ্রহণ—হয় এই সেক্টর না হয় অন্য একটি সেক্টর—যা হয়তো কম সুরক্ষিত হতে পারে, অথচ যেখানে থাকতে পারে ডবল বা তিন লাইন কাঁটা তারের বেড়া।

মিসরীয় এলাকার কয়েক মাইল ভেতরে সেনুসি তরীকার সমর্থকরা যাত্রী ও মালবাহী জানোয়ার নিয়ে আমাদের সাথে দেখা করবে, এ ব্যবস্থা করা হয়েছে পূর্বাহ্নেই। কাজেই আমাদের ঘোড়াগুলিকে বিপদে ফেলার কোনো প্রয়োজন হবে না। কয়েকজন 'মুজাহিদীনে'র দায়িত্বে আমরা সে ঘোড়াগুলিকে ফেরত পাঠিয়ে দিই আর যায়েদ এবং

আমি সহ বাকী সকলে মাঝ রাতের কিছু আগে পায়ে হেঁটে তারের বেড়ার নিকট পৌছুই। অন্ধকারই ছিলো আমাদের আবরণ। কারণ ইতালীয়রা সমস্ত গাছপালা এবং ঝোঁপঝাড় কেটে সাফ করে ফেলেছিলো।

উত্তরে এবং দক্ষিণে কয়েক শ' গজ ব্যবধানে পাহারাদার মোতায়েন করে আমাদের ছয়জন লোক তার কাটার যন্ত্রে এবং ইতালীয় মজুরদের উপর ইতিপূর্বে হামলা চালিয়ে যেসব পুরু চামড়ার দস্তানা কব্জা করেছিলো সেগুলিতে সজ্জিত হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আগাতে থাকে। ওরা যখন আগাচ্ছিলো, তখন আমরা আমাদের রাইফেল নিয়ে ওদের কভারিং দিচ্ছিলাম। এ এক উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত। মৃদুতম শব্দের জন্য উৎকর্ণ আমি। শুনছি কেবল অগ্রসরমান দেহগুলির ভারে চাপ খাওয়া নুড়ির শব্দ আর কখনো কখনো নিশাচর পাখির ডাক। তারপরে এলো কাঁটা তারে প্রথম দাঁত বসানো তার-কাটা কাচির কচ্‌কচ্‌ শব্দ। মনে হলো, একটা বিস্ফোরণ ঘটলো আমার কানের ভেতরে আর তারপরই ধাতব তন্তু কর্তনের মৃদুতরো আলাদা ধ্বনি...খশ্‌ খশ্‌ খশ্‌...ঘষে ঘষে কেটে কেটে, কাঁটা তারের গভীর থেকে গভীরে...।

আরেকবার পাখির ডাক ধ্বনিত হলো রাতের আসমানেঃ কিন্তু এবার আর তা পাখি নয়, একটি সংকেতঃ এই সংকেত আসছে উত্তরদিকে আমরা যে পাহারাদার রেখেছি, তাদেরই একজনের কাছ থেকে—আসন্ন বিপদের সংকেত...এবং ঠিক একই মুহূর্তে আমরা শুনতে পাই মোটরের গুঞ্জন ধ্বনি যা আসছে আমাদের দিকে। একটি সন্ধানী আলো তীর্যকভাবে বিচ্ছুরিত হয় আকাশে। একটিমাত্র লোকের মতো আমরা নিজেদের নিক্ষেপ করি যমিনের উপর, কেবল তার কাঁটায় নিয়োজিত লোকগুলি ছাড়া; ওরা তখন মরিয়া হয়ে তাড়াহুড়া ক'রে ওদের কাজ করে চলেছে। এখন আর ওরা চুপি চুপি কাজ করার কথা ভাবছে না। বরং ভূতে পাওয়া মানুষের মতো কাঁচি দিয়ে কেটে চলেছে আর রাইফেলের বাটের আঘাতে আলগা করে দিচ্ছে কর্তিত কাঁটা তার। কয়েক সেকেণ্ড পর একটি রাইফেলের আওয়াজ শোনা যায় ঃ আমাদের উত্তরদিকের প্রহরীর সংকেত। সাঁজোয়া গাড়ির চালক নিশ্চয়ই তাকে দেখে ফেলেছে, কারণ সন্ধানী আলোর রশ্মি সহসা ধাবিত হয় নিচ দিকে আর আমরা মেশিন গানের গুলীর অশুভ শব্দ শুনতে পাই। ইঞ্জিনের গর্জন বাড়তে থাকে এবং তার কালো ছায়া শরীর আমাদের উপর দিয়ে চলে যায়, আর তার হেডলাইটের আলো সোজা এসে পড়ে যমিনে। আমাদের উপর এরপরে মেশিনগানের গুলীর এক বিস্ফোরণ হলো। স্পষ্টতই, কামান চালক তাক করেছিলো অনেক উপরের দিকে। আমি আমাদের মাথার উপর দিয়ে ছুটে যাওয়া বুলেটের শা-শা-শন-শন শব্দ শুনতে পাই। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে আমরা তার জবাব দিই আমাদের রাইফেল দিয়ে।

—'সার্চ লাইট! সার্চ লাইট।' কেউ একজন চীৎকার করে ওঠে—'সার্চ লাইটটিকে তাক করে গুলী ছোঁড়ো।' এবং কয়েক মুহূর্তেই সার্চ লাইটটি নিভে গেলো।

সন্দেহ নেই যে, আমাদের অব্যর্থ লক্ষ্য রাইফেলধারীদের বুলেট লেগে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে সার্চ লাইটটি। সাঁজোয় গাড়িটি থেমে যায়। কিন্তু তার মেশিনগান অন্ধের মতো গুলী করে চলেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের সম্মুখে উত্থিত এক চীৎকার আমাদের জানিয়ে দিলো, কাঁটা তারের বেড়া কেটে ঢুকে পড়ার পথ তৈরি হয়ে গেছে এবং আমরা একজন

একজন ক'রে সেই সংকীর্ণ উন্মুক্ত পথটি দিয়ে গা মুচড়িয়ে মুচড়িয়ে নিজেদের নিয়ে যাই বেড়ার ওপাশে আর তাতে কাঁটা তারে লেগে আমাদের গায়ের কাপড় এবং চামড়া ছিঁড়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। এরপর শুনতে পেলাম ছুটে আসা মানুষের পায়ের শব্দ—এবং আরো দুটি 'জার্দ্' পরা মূর্তি কাঁটা তারের বেড়ার সেই ফাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের সাথীরা আমাদের সংগে মিলিত হচ্ছে আবার। বোঝা গেলো, ইতালীয়রা গাড়ির মায়া ছেড়ে আমাদের সংগে সামনাসামনি মুকাবিলা করতে অনিচ্ছুক...আর তারপর, আমরা এসে দাঁড়ালাম মিসরের মাটিতে, অথবা এ-ও বলা যায়ঃ আমরা দৌড়াতে থাকলাম, পাথরের আড়ালে, বালুর স্তূপ ও বিচ্ছিন্ন ঝোঁপঝাড়ের আড়ালে গা বাঁচিয়ে—কারণ আমাদের পেছনে সীমান্তের ওপার থেকে, থেকে থেকে গুলী চালাচ্ছিলো ওরা।

যখন ভোর বেলা, তখন আমরা মিসরীয় এলাকার ভেতরে ঢুকে পড়েছি। আমরা এখন বিপদমুক্ত। আমাদের বিশজনের মত লোকের মধ্যে পাঁচ জনকে আমরা হারিয়েছি। সম্ভবত ওরা মারা গেছে; আর চারজন হয়েছে যখম, তবে খুব মারাত্মক নয়।

—'আল্লাহ্ আমাদের প্রতি রহম করেছেন।' আহত 'মুজাহিদীনে'র মধ্যে একজন বলে— 'কাঁটা তারের বেড়া পার হতে গিয়ে কখনো কখনো আমরা আমাদের অর্ধেক লোককে হারিয়ে বসি; কিন্তু আল্লাহ্ মহান, কেউই মরে না, যার মৃত্যু আল্লাহ্ চান না...পবিত্র কুরআন কি বলেনি?...যাঁরা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না; কারণ তারা জিন্দা, জীবিত..?'

দু'হপ্তা পর ফিরতি পথে মার্‌সা মাত্রুহ এবং আলোকজান্দ্রিয়া হয়ে আমরা পৌছুলাম উজান মিসর এবং সেখানে থেকে পূর্ব ব্যবস্থা মতো নৌকায় করে ইয়ানবো হয়ে আমি আর যায়েদ আবার ফিরে এলাম মদীনায়। গোটা অভিযানটির জন্যই লাগলো দু' মাস...মনে হলো না, হিজায থেকে আমাদের অনুপস্থিতি আদৌ কেউ লক্ষ্য করেছে....।

... ...

আমি যখন মদীনায় সেই কদীম সেনুসি আস্তানার চৌকাঠে সিদি মুহাম্মদ আজ-জুবাই-এর সংগে পা রাখি, তখন মৃত্যু আর হতাশার সেই সব অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি আমার চেতনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে আর জুনিপার গাছের গন্ধ, মাথার উপর দিয়ে ছুটে যাওয়া বুলেটের শব্দে আমার হৃদ্‌পিণ্ডের ধড়াস্ ধড়াস্। আর আশা নেই, ভরসা নেই এমন এক অভিযানের যন্ত্রণা আবার জেগে ওঠে আমার বুকের ভেতর; তারপর ধীরে ধীরে মুছে যায় আমার সাইরেনিকা অভিযানের স্মৃতি। বেঁচে থাকে কেবল তার বেদনা!

চার

আবার আমি দাঁড়াই মহান সেনুসির সামনে এবং সেই বৃদ্ধ যোদ্ধার ক্লান্ত মুখের দিকে তাকাই। আবার আমি সেই হাতটিতে চুমু খাই, যা অতো দীর্ঘকাল তলোয়ার ধারণা করেছে যে এখন আর তালোয়ার বহনের সামর্থ্য তার নেই।

—'আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন, বাবা, তুমি আরাম ক'রে বসো...এক বছরেরও বেশি হলো আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিলো, আর এই বছরের সাথে সাথে আমাদেরও আশা

নিঃশেষ হয়েছে। কিন্তু তা'রীফ আল্লাহ্‌র তিনি যা ইচ্ছা করেন...।'

নিশ্চয়ই বছরটি ছিলো সাইয়িদ আহমদের জন্য দুঃখময়। তাঁর মুখের রেখাগুলি আরো গভীর হয়েছে আর তাঁর গলার আওয়াজ খুবই নিচু হয়ে পড়েছে যা আগে কোনোদিই তেমন ছিলো না। যরীফ ঈগল মুষড়ে পড়েছেন। জড়োসড়ো হয়ে বসেছেন গালিচার উপর। তাঁর সাদা বার্নাস তাঁর শরীরে আঁটসাট করে বাঁধা—যেনো শরীরটাকে গরম করার জন্যই, আর তিনি অনন্ত শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছেন নির্বাক, নিশ্চুপ।

—'আমরা যদি কেবল উমর আল-মুখতারকে বাঁচাতে পারতাম', তিনি ফিসফিস করে বলেন, 'আমরা যদি সময় থাকতে পালিয়ে মিসর চলে আসার জন্য তাঁকে কেবল রাযী করাতে পারতাম...'

—'কেউই পারতো না সিদি উমরকে বাঁচাতে', আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিই, 'তিনি নিজেই তাঁকে বাঁচতে চাননি। বিজয়ী হতে না পারলে তাঁর মৃত্যু হোক, তা'ই তিনি চেয়েছিলেন, যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিই, তখনি তা আমি বুঝেছিলাম হে সিদি আহমদ!'

সাইয়িদ আহমদ সজোরে তাঁর মাথা নাড়েন, —'হ্যাঁ' আমিও তা জানতাম... আমিও তা... জানতাম কিন্তু জানতে পেরেছিলাম খুব দেরীতে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, সতেরো বছর আগে ইস্তাম্বুল থেকে যে আহ্বান এসেছিলো, তাতে সাড়া দেয়া আমার ভুল হয়েছে... আর তা কি, সম্ভবত কেবল উমরেরই নয়, বরঞ্চ সকল সেনুসিরই মৃত্যুর শুরু ছিলো না?'

এ প্রশ্নের কোনো জবাব আমার কাছে নেই। কারণ, হামেশাই আমার মনে হয়েছে, ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অযথা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য সাইয়িদ আহমদের সিদ্ধান্ত ছিলো তাঁর জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল।

—'কিন্তু', সাইয়িদ আহমদ আবার বলেন, 'ইসলামের খলীফা যখন আমার কাছে মদদ চাইলেন, তখন অন্য সিদ্ধান্তই বা আমার পক্ষে কি ক'রে সম্ভব ছিলো? আমি কি ঠিক করেছিলাম, না নির্বোধের মত কাজ করেছি? কিন্তু আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কে-ই বা বলতে পারে, মানুষ যখন তার বিবেকের ডাকে সাড়া দেয়, তখন সে কি ঠিক করলো, না ভুল করলো?'

—'সত্যিই কে তা বলতে পারে?'

মহান সেনুসির মাথা দুলতে থাকে ডানে বাঁয়ে, যন্ত্রণায়-বিমূঢ়তায়। ঝুলে পড়া চোখের পাতার পেছনে চোখ দুটি ঢাকা আর আকস্মিক এক নিশ্চয়তার সাথে আমি বুঝতে পারলাম, এ চোখ আশার শিখায় আর ঝলসে উঠবে না কখনো। [১]

---

১ সাইয়িদ আহমদ মদীনায় ইন্তেকাল করেন পর বৎসর (১৯৩৩)।

পথের শেষ

এক

অনেক রাতে আমরা মদীনা ত্যাগ করি 'পুব দিকে'র পথ ধ'রে, যে পথে রসূলুল্লাহ তার বিদায় হজ্ব করতে মক্কা গিয়েছিলেন, তাঁর ইন্তেকালের কয়েক মাস আগে।

রাতের বাকি সময় চলতে থাকি ঘনিয়ে আসা ভোরের মধ্য দিয়ে। আমরা আমাদের উটের পিঠে সওয়ার হয়ে চলতে থাকি; ফজরের সালাতের জন্য কিছুক্ষণ থেমে আমরা দিবসে প্রবেশ করি; ধূসর এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবস। দুপুরের আগে বৃষ্টি শুরু হয় এবং দেখতে দেখতে আমরা ভিজে যাই। শেষপর্যন্ত বাঁয়ে অনেক দূরে বদ্দুদের একটি ছোট্ট ছাউনি দেখতে পেলাম এবং স্থির করলাম তাদেরই একটি কালো তাঁবুতে আশ্রয় নেবো।

তাঁবুটি ছোট্ট। হার্‌বের বদ্দুদের তাঁবু এটি। ওরা আমাদের দেখে স্বাগত জানায় উচ্চৈঃস্বরে, 'হে মুসাফিরেরা, আল্লাহ্‌ আপনাদের হায়াত দারাজ করুন। খোশ্‌ আমদেদ!' আমি 'শাইখে'র তাঁবুতে ছাগ-পশমের মাদুরের উপর আমার কম্বল বিছিয়ে দিই আর শাইখের জরু, এই এলাকার প্রায় সকল বদ্দু আওরতের মতোই যাঁর মুখ অনাবৃত, তাঁর সোয়ামীর সুন্দর স্বাগত সম্ভাষণটির পুনরাবৃত্তি করেন। নির্ঘুম রাতের পর দ্রুত নিদ নেমে এলো আমার উপর, তাঁবুর ছাদের উপর বৃষ্টি পতনের মৃদংগ ধ্বনির মধ্যে। কয়েক ঘণ্টা পর আমি যখন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম, তখনো বৃষ্টির মৃদংগ বাজছে। আমাকে ঢেকে আছে রাতের অন্ধকার— ও হো. তা তো নয়— এ তো রাত নয়, কেবল তাঁবুর গাঢ় কালো চাঁদোয়া; আর এর গন্ধ ভেজা পশমের গন্ধেরই মতো। আমি আমার বাহু দুটি প্রসারিত করি, আর আমার হাত গিয়ে লাগে আমার পেছনে মাটির উপর রাখা উটের একটি জীনের উপর। তার পুরানো কাঠের মসৃণতা স্পর্শ করতে চমৎকার লাগে। আঙুল দিয়ে এর উপর খেলা করা কী আনন্দদায়ক, যতক্ষণ না জীনের সম্মুখের উঁচুভাগ পর্যন্ত আঙুলগুলি গিয়ে মিশেছে লোহার মতো শক্ত ধারালো উটের অন্ত্রের সংগে— যা দিয়ে জীনটিকে সেলাই করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁবুতে আমি ছাড়া আর কেউই নেই।

কিছুক্ষণ পর আমি উঠে পড়ি এবং তাঁবুর খোলা অংশটিতে পা রাখি। বৃষ্টি যেন পিটিয়ে পিটিয়ে গর্ত খুঁড়ছে বালির ভেতর... লাখে লাখে ছোট ছোট গর্ত, যা এই মুহূর্তে দেখা দিচ্ছে এবং হঠাৎ মিলিয়ে যাচ্ছে নতুন গর্তের স্থান করে দেওয়ার জন্য— এবং ঘু'রে, আমার ডানদিকে, নীল ধূসর গ্রানাইট শিলাখণ্ডের উপর স্প্রে ক'রে ছড়িয়ে দিচ্ছে পানি, আমি কাউকেই দেখছি না, কারণ, দিনের এই সময়টিতে নিশ্চয়ই ওরা বের হয়ে পড়েছে তাদের উটের খবরদারী করতে; নিচে অধিত্যকায়, আকাসিয়া গাছের কাছে অনেকগুলি কালো তাঁবু নিশ্চুপ হয়ে আছে বৃষ্টি-ঝরা বিকালের নীরবতায়। ওদেরই একটি থেকে একটি ধূসর ধূম্রকুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে উপরের দিকে... সান্ধ্য খাবারের সংকেত। ধোঁয়াটা এতোই পাতলা এবং এতোই ক্ষীণ যে, বৃষ্টির মুকাবিলায় ঠেলে ওঠার ক্ষমতাই তার নেই... এবং তা লতিয়ে উঠছে কিনার ঘেঁষে, অসহায়ভাবে কাঁপতে কাঁপতে, প্রবল

বাতাসে রমনীর কেশপাশের মতো। রূপালী ধূসর পানির ফিতার চলমান পর্দার অন্তরালে টিলাগুলি যেনো আন্দোলিত হচ্ছে; বাতাস বুনো আকাসিয়া গাছ আর স্যাঁতস্যাঁতে তাঁবুর পশমের গন্ধে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

ধীরে ধীরে পানি ছিটানো এবং ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি থেমে যায় এবং সান্ধ্য সূর্যের রশ্মির নিচে মেঘপুঞ্জ টুকরা হয়ে পালাতে শুরু করে। আমি নিচু একটি গ্রানাইট্ শিলাখণ্ডের দিকে আগিয়ে যাই। এ পাথরটির উপর এমন একটি গর্ত রয়েছে যা খাঞ্চার মতো বড়ো, যাতে আমোদ উৎসবের দিনে মেহমানদের পুরা ভেড়ার রোস্ট এবং ভাত পরিবেশন করা হয়। এখন একটি বিষ্টির পানিতে ভর্তি। আমি যখন আমার বাহু দু'টি এর ভেতর রাখি, পানি আমার কনুই পর্যন্ত পৌঁছোয়, মৃদুষ্ণ, বিস্ময়কররূপে আদুরে পরশ এবং আমি যখন পানির ভেতর আমার বাহু দুটি নাড়ি, মনে হলো আমার ত্বক যেনো পানি খাচ্ছে! একটি তাঁবু থেকে বের হয়ে আসে একটি নারী, মাথার উপর একটি বড় তামার পাত্র নিয়ে— বোঝাই যাচ্ছে, বৃষ্টির ফলে বহু পাথর ও শিলাখণ্ডের গর্তে যে পানি জমেছে, তারই একটি থেকে সে তার পাত্রটি ভরে নেবার জন্য বের হয়েছে। ও তার বাহু দুটি কখনো প্রসারিত করছে সামনের দিকে, কখনো পাশে, কখনো উর্ধ্বে, তার লাল প্রশস্ত জামার কিনার দু' হাতে পাখার মতো ধ'রে এবং মৃদু দুলতে দুলতে সে আগাতে থাকে। শিলার উপর থেকে যখন পানি ধীরে ধীরে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় তখন পানি যেমন দুলতে থাকে, তেমনি দুলে দুলে চলছে রমণী। আমি মনে মনে বলিঃ এ রমণী পানির মতোই সুন্দর... আমি দূর থেকে শুনতে পাই প্রত্যাবর্তনমুখী উটের ডাকঃ আর এই যে ওরা দেখা দিচ্ছে টিলার আড়াল থেকে একটি ছড়িয়ে পড়া দলের মতো, গাম্ভীর্যের সংগে শিথিল চরণ ফেলতে ফেলতে চলছে রাখালেরা— ওদের চালিয়ে নিয়ে আসে উপত্যকার ভেতরে, তীক্ষ্ণ ছোট্ট ডাক-হাঁকের সাহায্যে, তারপর তারা উচ্চারণ করে একটি বিশেষ শব্দ 'গ-র-র...গ-র-র...', জানোয়ারগুলি যেনো হাঁটু ভেংগে বসে পড়ে; আর দেখা যায়, অনেকগুলি উট তাদের বাদামী রঙের পিঠ মাটির দিকে নমিত করছে তরংগিত ছন্দে। সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসছে লোকেরা ওদের উটের সামনের পা দুটিতে বেড়ি পরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে নিজ নিজ তাঁবুতে।

আর, এখানে এসেছে রাত তার কোমল অন্ধকার আর স্নিগ্ধ শীতলতা নিয়ে। বেশির ভাগ তাঁবুর সামনেই জ্বলছে আগুন; রান্নার পাত্র আর কড়াইয়ের টুঙটাঙ শব্দ আর রমণীদের হাসির আওয়াজ মিশে যায় পুরুষদের আকস্মিক ডাক-হাঁক ও তাদের টুকরা বিচ্ছিন্ন কথার সাথে, যা বাতাসে ভর ক'রে ভেসে আসে আমার কাছে। উটের পরে ফিরে এসেছে ভেড়া-ছাগল; ওরাও কিছুক্ষণ ডাকে এবং কখনো কখনো কুকুর চীৎকার করে ওঠে, যেমনটি ওরা চীৎকার করে প্রতিটি রাতেই, আরবের প্রতিটি তাঁবুতে।

যায়েদকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। হয়তো কোনো একটি তাঁবুতে সে শুয়ে পড়েছে। আমি ধীরে ধীরে হেঁটে আরাম-ক'রে-শোয়া উটগুলির দিকে যাই। ওরা ওদের মস্তবড় শরীর দিয়ে ওদের নিজেদের জন্যে বালুর মধ্যে খুঁড়েছে গর্ত এবং এখন আরাম ক'রে শুয়ে আছে। কোনো কোনোটি জাবর কাটছে, আর অন্যেরা ওদের লম্বা গলা প্রসারিত করে দিয়েছে যমিনের উপর। কোনো কোনোটি মাথা উঁচু করে নাকের ভেতর দিয়ে শব্দ করে, যখন আমি পাশ দিয়ে যাই এবং খেলাচ্ছলে স্থূল কুঁজে হাত দিয়ে ধরি। একটি তরুণ উট

ছানা তার মায়ের পাশে নিবিড়ভাবে গা ঘেঁষে পড়ে আছে। আমার হাতের স্পর্শে লাফ মেরে দাঁড়িয়ে যায়, যখন তার মা মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকায় এবং বিরাট হা ক'রে মোলায়েম ডাক ছাড়ে। আমি দুই বাহু দিয়ে উট ছানাটির গলা জড়িয়ে ধরি এবং তাকে চেপে ধরে আমার মুখ গুঁজে দিই তার পিঠের গরম লোমের মধ্যেঃ আর হঠাৎ সে নীরব, নিথর দাঁড়িয়ে যায়— মনে হলো তার সব ভয় যেনো চলে গেছে। কচি জন্তু-দেহের উত্তাপ আমার মুখ এবং বুক ভেদ করে প্রবেশ করে—আমি টের পাই, আমার হাতের তালুর নীচে রক্ত উথাল-পাতাল করছে ওর ঘাড়ের শিরায় আর আমার রক্তের স্পন্দনের সংগে তা মিশে গেছে—এবং আমার মধ্যে জাগ্রত করে এক সর্বপ্লাবী অনুভূতি— খোদ্ জীবনের সংগে নিবিড় সান্নিধ্যের অনুভূতি, জীবনের মাঝে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিসর্জনের এক আকুতির উপলব্ধি।

দুই

আমরা উটের পিঠে সওয়ার হয়ে চলেছি আর ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের পথের যেখানে শেষ তারই নিকটতরো সান্নিধ্যে নিয়ে আসে আমাদের। এভাবে সূর্যকরোজ্জ্বল স্তেপ-ভূমির মধ্য দিয়ে আমরা দিনের পর দিন চলতে থাকি। রাতের বেলা নক্ষত্রের নিচে আমরা ঘুম যাই এবং ভোরের স্নিগ্ধ শীতলতায় আমরা জেগে উঠি— আর ধীরে ধীরে আমি আমার পথের শেষপ্রান্তের দিকে আগাতে থাকি!

কোনোদিনই এ পথ ছাড়া আর কোনো পথ ছিলো না আমার জন্যঃ যদিও বহু বছর তা আমি জানতাম না। এ আমাকে ডাক দিয়েছিলো মক্কা সম্বন্ধে আমার মন সচেতন হয়ে ওঠার বহু আগেই—এক প্রবল কণ্ঠস্বরে ঃ 'আমার রাজ্য এই পৃথিবীতে, আমার রাজ্য ভাবী জগতেও ঃ আমার রাজ্য অপেক্ষায় রয়েছে মানুষের দেহ এবং আত্মা এ দুয়েরই, এবং মানুষ যা কিছু চিন্তা করে, অনুভব করে, এবং করে—তার ব্যবসা-বাণিজ্য, তার ইবাদত বন্দেগী, তার শয়নকক্ষ, তার রাজনীতি সমস্ত কিছুর উপর এ রাজ্য সম্প্রসারিত। আমার রাজ্যের শেষ নেই, সীমা নেই।' এবং যখন কয়েক বছর পরে, আমার নিকট এসব পরিষ্কার হয়ে উঠলো, আমি জানতে পারলাম আমার স্থান কোথায় ঃ আমি জানতে পারলাম আমার জন্মের পর থেকেই ইসলামী ভ্রাতৃত্ব আমার ইন্তেজারে রয়েছে এবং আমি ইসলাম কবুল করলাম। আমার প্রথম যৌবনের সেই যে বাসনা—ধ্যান-ধারণার একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথ আমার চাই, একটি ভ্রাতৃ-সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে চাই আমি, এতোদিনে শেষপর্যন্ত তা পূরণ হলো।

খুবই আশ্চর্যের বিষয়—হয়তো ততো আশ্চর্যজনক নয়, যদি কেউ বিবেচনা করে ইসলামের লক্ষ্য কী—মুসলমানদের মধ্যে মুসলমান হিসাবে আমার প্রথম অভিজ্ঞতাই হচ্ছে ভ্রাতৃত্বের...।

১৯২৭ সনের জানুয়ারির প্রথম দিনগুলিতে আমি আবার বের হয়ে পড়ি মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশ্যে। এবার আমার সংগে ছিলো এলসা আর তার কচি ছেলে, আর এবারই আমি অনুভব করলাম, এটাই হবে আমার শেষ যাত্রা।

কয়েকদিন ধরে আমরা সমুদ্র সফর করি ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে, সমুদ্র ও আকাশের এক ঝিকিমিকি বৃত্তের ভেতর দিয়ে। —কখনো আমাদের অভ্যর্থনা জানায় সুদূর উপকূল

এবং আমাদের পাশ কাটিয়ে দ্রুত ছুটে চলা জাহাজের ধূঁয়া; ইউরোপ হারিয়ে গেছে আমাদের অনেক-অনেক পেছনে এবং আমি তার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছি।

প্রায়ই আমি আমাদের কেবিন-ডেকের আরাম-আয়েশের মধ্য থেকে বের হয়ে নিচে যাই জাহাজের সবচেয়ে কম ভাড়ার জীর্ণ স্থানটিতে, যেখানে রয়েছে লোহার তৈরি বাঙ্ক স্তরে স্তরে। জাহাজটি যাচ্ছিলো দূরপ্রাচ্যে তাই ডেক-যাত্রীদের বেশির-ভাগই ছিলো চীনা, ছোট ছোট কারিগর এবং ব্যবসায়ী, যারা বহু বছর ইউরোপে কঠিন পরিশ্রমের পর ফিরে যাচ্ছে স্বদেশে। তাছাড়া রয়েছে ইয়েমেনী আরবদের একটি ছোট্ট দল, যারা জাহাজে উঠেছে মার্সাই বন্দরে। দেশে ফিরছে ওরাও। পাশ্চাত্য বন্দরগুলির শব্দগন্ধ এখানো জড়িয়ে রয়েছে ওদের সংগে। ওরা এখনো বাস করছে দিন শেষের অস্তরাগের মধ্যে, যখান ওদের বাদামী হাত ইংরেজ, মার্কিন ও ওলন্দাজ জাহাজে কয়লা মারতো বেলচা দিয়ে; ওরা এখনো অদ্ভুত বিদেশী নগর বন্দরের কথা আলাপ করছে—নিউইয়র্ক, বুয়েনস আইরীজ, হেমবুর্গ। উজ্জ্বল অজানার হঠাৎ বাসনায় তাড়িত হয়ে একদিন ওরা এডেন বন্দরে স্টোকার ও কয়লার স্টীমার[১] হিসাবে নিজেদের ভাড়ায় বিকিয়ে দিয়েছিলো। ওরা ওদের পরিচিত জগত থেকে বের হয়ে পড়েছিলো ভেবেছিলো পৃথিবীর ধারণাতীত বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের আলিংগনে ওরা বেড়ে ছাড়িয়ে যাবে নিজেদেরঃ কিন্তু জাহাজ কিছুক্ষণ পরেই ভিড়বে এডেন বন্দরে আর ওদের জীবনের এই দিনগুলি হারিয়ে যাবে অতীতের মধ্যে। ওরা পশ্চিমের হ্যাটের বদলে নেবে পাগড়ী অথবা 'কুফিয়া', বিগত দিনকে বাঁচিয়ে রাখবে কেবল স্মৃতি হিসাবে এবং নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত প্রত্যেকটি মানুষ ফিরে যাবে ইয়েমেনে, তার গাঁয়ের বাড়িতে। ওরা যেমনটি একদিন ঘর থেকে বের হয়ে পড়েছিলো, ঘরে কি ঠিক সেই মানুষ হিসাবেই ফিরবে, না বদ্‌লে যাওয়া মানুষরূপে? পাশ্চাত্য জগত কি ওদের আত্মাকে কব্জা করে ফেলেছে—না কি কেবল ওদের ইন্দ্রিয়গুলিরই উপর হাত বুলিয়েছে?

এই লোকগুলির সমস্যা আমার মনে ঘনীভূত হয়ে বৃহত্তরো তাৎপর্যপূর্ণ একটি সমস্যার রূপ নিলো।

আমি চিন্তা ক'রে বুঝতে পারি, আজকের মতো অতীতে কখনো একে অপরের এতো নিবিড় সান্নিধ্যে আসেনি ইসলাম এবং পাশ্চাত্য জগত। এই নৈকট্য একটি সংগ্রাম- দৃষ্টিগোচর এবং দৃষ্টির অগোচর—দুই-ই। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চাপে বহু মুসলিম নারী এবং পুরুষের আত্মা ক্রমেই কুঁকড়ে যাচ্ছে।

জীবন মানের উন্নতি হওয়া উচিত মানুষের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে উন্নত করার উপায়—ওদের ইতিপূর্বেকার এই বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়ে ওরা নিজেদের চালিত হতে দিচ্ছে ভিন্ন পথে। ওরা 'প্রগতি' নামক সেই পৌত্তলিকতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে যে-পূজায় পাশ্চাত্য জগত নিজেদের সমর্পণ করেছিলো, ঘটনার পশ্চাদভূমিতে কোনো এক স্থানে কেবল একটি সুরেলা টুংটাঙ ধ্বনিতে ধর্মকে রূপান্তরিত করার পরে, আর এ কারণে, এসব মুসলিম নর-নারী ধীরে ধীরে নিজেদের ছোটো করে ফেলছে, বড়ো করছে না ঃ কারণ সকল সাংস্কৃতিক অনুকরণই সৃজনশীলতার বিরোধী ব'লে যে-কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীকে তা অনিবার্যভাবেই হেয় করে তোলে...

১. জাহাজের চুল্লিতে কয়লা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত হোক।

কথা এ নয় যে, পশ্চিমা জগতের কাছ থেকে মুসলমানদের খুব বেশি শেখার নেই, বিশেষ ক'রে কারিগরি ক্ষেত্রে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা এবং পদ্ধতি অর্জন করা প্রকৃতপক্ষে 'অনুকরণ' নয় ঃ আর খাস ক'রে সে জাতির পক্ষে তো নিশ্চয়ই নয়, যার ধর্মই তাকে দেয় জ্ঞান অনুসন্ধানের নির্দেশ, যেখানেই তা পাওয়া যাক। বিজ্ঞান পাশ্চাত্যের নয়, প্রাচ্যেরও নয়; কারণ সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াই হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিগত প্রয়াসের অন্তহীন এক শৃংখলের মধ্যে কতকগুলি আঙটা মাত্র, যে যে প্রয়াস বেষ্টন করে সমগ্র মানবজাতিকে। প্রত্যেক বিজ্ঞানীই তাঁর পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরা তা তাঁর নিজের জাতির হোক বা ভিন্ন জাতিরই হোক, যে বুনিয়াদ স্থাপন করে গেছেন, তারই উপর নির্মাণ করেন ইমারত। আর নির্মাণের এই প্রক্রিয়া, সংশোধন ও উন্নয়ন চলতে থাকে মানুষ থেকে মানুষে, যুগ থেকে যুগান্তরে, সভ্যতা থেকে সভ্যতায়—যে কারণে, কোনো বিশেষ যুগ বা সভ্যতার বৈজ্ঞানিক সাফল্যকেই কখনো সেই যুগ বা সভ্যতারই নিজস্ব কীর্তি বলে 'গণ্য' করা যায় না। সময়ের একেক পর্যায়ে অন্যান্য জাতির চাইতে অধিকতরো প্রাণবন্ত উদ্যমশীল একেকটি জাত বিজ্ঞানের সাধারণ ভাণ্ডারে অধিকতরো অবদান রাখতে সক্ষম হয়ে থাকেঃ কিন্তু শেষপর্যন্ত এই প্রক্রিয়ায় সকলেই অংশগ্রহণ করে এবং সংগতভাবেই। এমন একসময় ছিলো, যখন মুসলমানদের সভ্যতা ছিলো ইউরোপের সভ্যতা হতে অনেক বেশি বীর্যবান। এই সভ্যতা ইউরোপে চালান দেয় বৈপ্লবিক ধরনের বহু কারিগরি উদ্ভাবনের কল এবং তারো চেয়ে বেশি ঃ সেই 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'র নিজস্ব মৌলিক নীতিগুলি, যার উপর গড়ে উঠেছে আধুনিক বিজ্ঞান এবং সভ্যতা। তা সত্ত্বেও রসায়নশাস্ত্রকে যাবির ইব্‌নে হাইয়ানের মৌলিক আবিষ্কার 'আরবীয়' বিজ্ঞান বানিয়ে ফেলেনি; অথবা বীজগণিত এবং ত্রিকোণমিতিকেও 'মুসলিম' বিজ্ঞান বলা যায় না, যদিও এর একটি উদ্ভাবিত হয়েছিলো আল-খারিজমী কর্তৃক এবং অন্যটির উদ্ভাবক ছিলেন আল্-বাত্তানি, আর ওঁদের দুজনই ছিলেন মুসলমান—ঠিক যেমন আমরা 'ইংরেজ মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব' ব'লে কোন কিছুর উল্লেখ করতে পারি না, যদিও যে লোকটি এই তত্ত্বটির রূপ দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ। এ ধরনের সকল কৃতিত্বই হচ্ছে মানবজাতির সাধারণ সম্পদ। তাই, মুসলমানরা যদি বিজ্ঞান এবং কারিগরিশাস্ত্রে আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে, যা অবশ্যি তাদের গ্রহণ করা উচিত, তা'হলে অন্য মানুষের অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করার জন্য মানুষের মধ্যে যে বিবর্তনধর্মী বৃত্তি কাজ করে, ওরা কেবল তারই অনুসরণ করবে— তার বেশি নয়।

কিন্তু ওরা যদি পাশ্চাত্য জীবনের বহিরংগ, তার রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও সামাজিক ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করে— যা করার প্রয়োজন মোটেই ওদের নেই—তা'হলে ওরা কখনো লাভবান হবে না। কারণ এক্ষেত্রে, পাশ্চাত্য তাদের যা দিতে পারে তা তাদের নিজের সংস্কৃতি যা দিয়েছে এবং যার প্রতি তাদের নিজ ধর্ম-বিশ্বাসও পথ নির্দেশ করে, কোনোমতেই তা থেকে এ উৎকৃষ্টতরো হবে না। মুসলমানরা যদি তাদের মাথা ঠাণ্ডা রাখে এবং প্রগতিকে গ্রহণ করে উপায় হিসাবে, লক্ষ্য হিসাবে নয়, তা'হলে তারা যে কেবল তাদের নিজের অন্তরের স্বাধীনতাই বজায় রাখতে পারবে, তা নয়; হয়তো জীবনের মধুরতা হারিয়ে যাওয়া গোপন রহস্যটুকুও তারা তুলে দিতে সক্ষম হবে পশ্চিমের মানুষের হাতে ...।

... ...

জাহাজের ইয়েমেনীদের মধ্যে ছিলো একজন হালকা-পাতলা বেঁটে-খাটো লোক,

যার নাক ঈগলের ঠোঁটের মতো, আর মুখমণ্ডল এতো প্রগাঢ় যে, মনে হলো যেনো তা জ্বলছে; কিন্তু তার অংগভংগি খুবই শান্ত এবং পরিমিত। সে যখন শুনতে পেলো আমি একজন নও-মুসলিম, সে আমার প্রতি এক বিশেষ প্রীতি দেখাতে শুরু করলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা দু'জন ডেকের উপরে এক সংগে বসে কাটাই যখন সে আমাকে ইয়েমেনে তার পাহাড়ী গাঁয়ের কথা বলে চলে। নাম তার মুহাম্মদ সালিহ্।

এক সন্ধ্যায় আমি নিচে নেমে ডেকে তার সংগে দেখা করি। তার এক বন্ধু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছে লোহার বাংকের উপর। আমাকে বলা হলো, জাহাজের ডাক্তার নেমে ডেকে আসার প্রয়োজন বোধ করবে না মোটেই। লোকটি ভুগছে ম্যালেরিয়ায়। এজন্য আমি তাকে কুইনিন দিই। আমি যখন ওকে নিয়ে ব্যস্ত আছি, তখন অন্য ইয়েমেনীরা কোণায় জমা হয় ক্ষুদ্রাকৃতি মুহাম্মদ সালিহ্‌র চারপাশে। ওরা তীর্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায় এবং মুহাম্মদ সালিহ্ ফিস্ ফিস্ করে যে পরামর্শ দিচ্ছে, তা গ্রহণ করে। শেষতক ওদের মধ্যে একজন আগিয়ে আসে। লোকটির দেহ দীর্ঘ, মুখের রঙ জলপাই-বাদামী আর চোখ দুটি তপ্ত কালো। সে আমাকে অফার করে একগাদা দলানো-মোচড়ানো ফরাসী নোটঃ

—'আমরা নিজেদের মধ্যে থেকে এগুলি যোগাড় করেছি। দুঃখের বিষয়, পরিমাণে খুব বেশি নয়। আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন আর এই অর্থ গ্রহণ করুন।'

আমি চমকে উঠে পিছনে সরে দাঁড়াই এবং ওদের বুঝিয়ে বলি, ওদের দোস্তকে আমি ওষুধ দিয়েছি, টাকার জন্য নয়।

—'না, না, আমরা তা জনি; তা সত্ত্বেও দয়া করে এ টাকা গ্রহণ করুন। কোনো কিছুর মূল্য হিসাবে এ আমরা শোধ করছি না—এ অর্থ হচ্ছে একটি সওগাত, একটি উপহার আপনার ভাইদের কাছ থেকে। আমরা আপনাকে পেয়ে খুবই সুখী আর এজন্যই আপনাকে এ টাকা দিচ্ছি। আপনি একজন মুসলমান এবং আমাদের ভাই। এমনকি, আমাদের থেকেও আপনি শ্রেষ্ঠ। কারণ আমরা জন্মেছি মুসলমান হিসাবে, আমাদের পিতারা ছিলেন মুসলমান এবং আমাদের দাদারাও; কিন্তু আপনি ইসলামকে উপলব্ধি করেছেন আপনার নিজের অন্তর দিয়ে... ভাই, এই অর্থ গ্রহণ করুন রসূলুল্লাহর খাতিরে।'

কিন্তু আমি তখনো আমার ইউরোপীয় রীতি-নীতির নিগড়ে বন্দী; নিজের সমর্থনে আমি বলি, "এক রুগ্ন বন্ধুর একটু খিদমতের বদলে কোনো উপহার গ্রহণ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।... তা ছাড়া, আমার কাছে টাকাকড়ি রয়েছে যথেষ্ট। আমার চাইতে এর প্রয়োজন তোমাদের নিশ্চয়ই বেশি। তা সত্ত্বেও, তোমরা যদি এ টাকা দান করতে ইচ্ছা করো, পোর্ট সৈয়দ গিয়ে গরীবদেরে দিয়ে দিও।"

—'না', আবার বলে ইয়েমেনী লোকটি, আপনি এ টাকা নিন আমাদের কাছ থেকে—এবং আপনি যদি তা রাখতে না চান, আপনি নিজের হাতেই দিয়ে দিন গরীবদের।'

এবং ওরা যখন আমার উপর পীড়াপীড়ি করছে এবং আমার প্রত্যাখ্যানে বিচলিত হয়ে ওরা যখন করুণ এবং নীরব হয়ে গেলো, অকস্মাৎ আমি বুঝতে পারলাম ঃ আমি যেখান থেকে এসেছি, মানুষ সেখানে 'আমার' এবং 'তোমার' মধ্যে প্রাচীর গড়ে তুলতে অভ্যস্ত ঃ

কিন্তু এই সমাজ এমন একটি সমাজ—এর মধ্যে নেই কোনো প্রাচীর...

—'টাকাটা আমাকে দাও ভাইয়েরা, আমি গ্রহণ করছি—আর ধন্যবাদ তোমাদের।'

তিন

'—আসছে কাল, 'ইনশাআল্লাহ,' আমরা থাকবো মক্কায়। তুমি যে আগুন জ্বালছো যায়েদ, এটিই হবে সর্বশেষ; আমাদের সফর শেষ হয়ে আসছে!'

—কিন্তু নিশ্চয়ই চাচা, আবার ধরাতে হবে আগুন এবং আপনার আর আমার সামনে সবসময়ই থাকবে আরেকটি সফর।'

—'হতে পারে সে রকম, হে যায়েদ, আমার ভাই! কিন্তু কেমন ক'রে যেনো আমি অনুভব করছি, এদেশে আর হবে না সেই সব সফর। আমি এতো দীর্ঘদিন আরবদেশে ঘুরে বেড়িয়েছি যে, এ আমার রক্তের সাথে মিশে গেছে এবং আমার আশংকা, আমি যদি এখন বের হয়ে না পাড়ি, আর কখানো পারবো না বের...হতে ঃ কিন্তু যায়েদ আমাকে চলে যেতেই হবে। তোমার কি সেই প্রবাদটি মনে নেই, যদি পরিষ্কার থাকতে হয়, পানিকে চলতেই হবে, বয়ে যেতেই হবে! আমি আমার তারুণ্য থাকতে থাকতেই দেখতে চাই, আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা কিভাবে জীবন-যাপন করছে দুনিয়ার অন্যান্য অংশে—ভারতে, চীনে, জাভায়...।'

—'কিন্তু চাচাজনা, যায়েদ জবাব দেয় সবিস্ময় আতংকে—'নিশ্চয়ই আরব দেশের প্রতি আপনার প্রেম নিঃশেষ হয়ে যায়নি।'

—'না, যায়েদ, আমি চিরদিন যেমন ভালোবেসে এসেছি, তেমনি একে ভালোবাসি; বরং বলা যায় তার চাইতে হয়তো বেশি ভালোবাসি। এতো বেশি ভালোবাসি যে, আমি ভাবতেও কষ্ট পাই, ভবিষ্যতে এর জন্য কী অপেক্ষা করছে! আমি শুনতে পেলাম, বাদশা নাকি তাঁর দেশকে 'ফিরিংগী'দের জন্য খুলে দেবার পরিকল্পনা করেছেন, যাতে করে ওদের কাছ থেকে তাঁর অর্থাগম হতে পারে! তিনি ওদের আল্‌হাসায় তেলের জন্য এবং হিজাযে সোনার জন্য মাটি খুঁড়ে অনুসন্ধান চালাবার অনুমতি দেবেন এবং কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন, এর পরিণাম কী হবে বেদুঈনদের জন্য! এদেশ আর কখনো থাকবে না এরকম...

মরুভূমির রাতের নিশ্চুপ নীরবতার মধ্য থেকে ওঠে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলা উটের পদধ্বনি। এক একাকী উট-সওয়ার অন্ধকার থেকে আমাদের ক্যাম্প-ফায়ারের আলোতে ছুটে আসে জীনের ঝালর উড়িয়ে, 'আবায়া' তরংগায়িত করে; হঠাৎ সে তার উটটিকে থামিয়ে দেয় এবং উটটি কখন হাঁটু গেড়ে নিচু হবে, তার জন্য অপেক্ষা না ক'রেই সে লাফিয়ে নেমে পড়ে জীনের উপর থেকে। সংক্ষিপ্ত 'আস্‌সালামু আলাইকুম'-'আপনার প্রতি শান্তি হোক'-এ কথা বলে আর কোনো শব্দ উচ্চারণ না ক'রেই সে জানোয়ারটির পিঠ থেকে জীন খুলে নামাতে শুরু করে দেয়, জীনের সঙ্গে বাঁধা থলেগুলি ছুঁড়ে মারে ক্যাম্প-ফায়ারের নিকটে আর তারপর বসে পড়ে মাটির উপর—তখনো নিশ্চুপ, মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে।

—'আল্লাহ্‌ আপনাকে হায়াত দিন, হে আবু সাইয়িদ,' যায়েদ বলে। কারণ বোঝা গেলো, নবাগত লোকটিকে সে চেনে। কিন্তু লোকটি তখনো নীরব নির্বাক। সে কারণে যায়েদ তার মুখ ফিরালো আমার দিকে এবং বললো, 'এ হচ্ছে ইব্‌নে সউদের

'রাজাজিল'দের একজন—শয়তান!'

বিষণ্ন আবু সাইয়িদের গায়ের রঙ ভীষণ কালো; তার মোটা ঠোঁট এবং একটি সিঁথি কেটে সযত্নে দুই পাটে বিভক্ত তার কোঁকড়ানো চুল—তার আফ্রিকী পূর্বপুরুষের প্রমাণ ব্যক্ত করছে। তার গায়ের পোশাক-পরিচ্ছদ অতি চমৎকার। তার কোমরবন্ধে গোঁজা ডেগারটি খুব সম্ভব বাদশার দেয়া উপহার, সোনার খাপে ঢাকা, আর তার সওয়ারীটি হচ্ছে একটি চমৎকার মধু-রঙ উষ্ট্রী—উত্তরাঞ্চলের উটের বংশজাত। তার অংগ-প্রত্যংগগুলি চিকন-চাকন, বাহুল্যবর্জিত—মাথাটি সংকীর্ণ, কাঁধ আর পাছা দুটি শক্তিমন্ত, বলবান।

—'তোমার কী হয়েছে আবু সাইয়িদ, তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে কথা বলছো না কেন? তোমার উপর জ্বিনের আসর হয়েছে নাকি!'

'নূরা'...ফিস্ ফিস্ করে উচ্চারণ করে আবু সাইয়িদ এবং কিছুক্ষণ পর গরম কফি যখন ওর জিভের জড়তা ঘুচিয়ে দেয়, সে আমাদের বলতে শুরু করলো নূরা সম্পর্কে ঃ নয্‌দের আর্‌রাস্ শহরের একটি বালিকা নূরা (সে মেয়েটির পিতার নামও উল্লেখ করে; আর দেখা গেলো, আমি তাকে খুব ভালো করেই চিনি)। অন্য মেয়েদের সাথে নূরা যখন পানি তুলছিলো, তখন আবু সাইয়িদ তার প্রতি পুশিদা লক্ষ্য করে বাগিচার দেওয়ালের উপর দিয়ে, 'এবং আমি টের পেলাম, যেনো একটি জ্বলন্ত কয়লা পড়েছে আমার হৃৎপিণ্ডের ভেতর। আমি ওকে ভালোবাসি, কিন্তু ওর বাপ, ওই কুত্তা ওর মেয়েকে কিছুতেই বিয়ে দেবে না আমার কাছে—ভিক্ষুক!—এবং বলে যে, নূরা নাকি আমাকে ভয় করে! আমি ওর দেনমোহর হিসাবে অনেক টাকা অফার করেছিলাম, আমার এক খণ্ড জমিও; কিন্তু সবসময়ই সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আখেরে, ওকে শাদি দিয়ে দেয় ওর চাচাতো ভাইয়ের সাথে। আল্লাহ্‌র লানৎ পড়ুক ওর উপর; আর নূরার উপর!'

তার মজবুত, গাঢ় কালো মুখের একদিক আলোকিত হয়ে ওঠে ক্যাম্প-ফায়ারের আলোতে এবং তার মুখের উপর যে ছায়া নৃত্য করছে তা যেনো এক যন্ত্রণার জাহান্নামের ছায়া। বেশিক্ষণ বসে থাকা সম্ভব হচ্ছে না তার পক্ষে; অস্থিরতায় অধীর হয়ে সে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। মুহূর্তের জন্য সে তার হাত দুটিকে ন্যস্ত রাখে জীনের উপর, আগুনের কাছে অবার ফিরে আসে এবং হঠাৎ ছুটে বের হয়ে পড়ে শূন্য রাত্রির অন্ধকারে। আমরা শুনতে পাই, সে আমাদের তাঁবু খাটানোর জায়গার চারপাশে বৃহৎ বৃত্ত করে দৌড়াচ্ছে আর চীৎকার করছে—চীৎকার করছে ঃ

—'নূরার আগুন আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে! আমার বুকের ভেতর নূরার আগুন জ্বলছে'— এবং আবার সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছেঃ 'নূরা, নূরা!'

আবার সে আগিয়ে আসে ক্যাম্প-ফায়ারের দিকে এবং তার চারদিকে বৃত্ত করে দৌড়াতে থাকে আর তার সাথে পত্ পত্ করে উড়তে থাকে তার 'কাফতান', যেনো চঞ্চল নৃত্যপরা আগুনের আলো এবং অন্ধকারে একটি ভৌতিক নিশাচর পাখি।

ও কি পাগল? আমার তা মনে হলো না। কিন্তু এও হতে পারে যে, ওর অন্তরের গহন অন্ধকার গহ্বর থেকে জেগে উঠেছে আদিম পূর্বপুরুষের স্মৃতির সংগে সম্পর্কিত মানসিক আবেগ—আফ্রিকার অরণ্যের পূর্বপুরুষাগত স্মৃতি—সেই সব মানুষের স্মৃতি, যারা বাস করতো ভূত-প্রেত এবং অতিপ্রাকৃত রহস্যের মধ্যে—তখনো সেই সময়ের খুবই ঘনিষ্ঠ নৈকট্যে, যখন

চৈতন্যের দিব্য স্ফুলিংগ জানোয়ারকে পরিণত করেছিলো মানুষে; আর সেই স্ফুলিংগ এখনো এতোটা শক্তিশালী নয় যে, তা লাগামছাড়া প্রবৃত্তিগুলিকে এক সংগে বাঁধতে পারে এবং সেগুলিকে রূপান্তরিত করতে পারে একটি উচ্চতরো ভাবাবেগে...মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো, আমি যেনো সত্যি আমার সমুখে দেখতে পাচ্ছি আবু সাইয়িদের হৃদ্‌পিণ্ডখানি, রক্ত আর মাংসের একটি দলা জ্বলছে বাসনার আগুনে, যেনো সত্যিকার আগুনে জ্বলছে, আর কেনো যেনো আমার মনে হলো এ তো খুবই স্বাভাবিক যে, এমনি ভয়ংকরভাবেই সে কাঁদবে, কাঁদবে আর দৌড়াবে বৃত্তের পর বৃত্ত তৈরি ক'রে, এক উন্মাদের মতো, যতক্ষণ না পায়ে বেড়ি দেয়া উটগুলি তাদের গা তুলছে আতঙ্কিত হয়ে তিন পায়ের উপর...।

তারপর ও ফিরে আসে আমাদের নিকট এবং দপ্ করে মাটির উপর বসে পড়ে। এ ধরনের অনিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণের দৃশ্যে যায়েদের মুখে যে বিরক্তি ফুটে উঠলো তা আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। কারণ, একজন খাস্ আরবের শরীফ মেজাজের কাছে অমন লাগাম ছেঁড়া ভাবাবেগের চেয়ে ঘৃণ্য আর কিছুই নেই। কিন্তু যায়েদের মহৎ হৃদয় অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নেয়। সে আবু সাইয়িদের আস্তিন ধরে সজোরে টান দেয় এবং আবু সাইয়িদ যখন মাথা তুলে যায়েদের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে, যায়েদ তাকে নম্রভাবে টেনে নিয়ে এলো নিজের নিবিড় সান্নিধ্যে ঃ

—'ওহে আবু সাইয়িদ, তুমি এভাবে নিজেকে ভুলে যেতে পারছো কেমন ক'রে? আবু সাইয়িদ, তুমি তো একজন যোদ্ধা... তুমি অনেক মানুষকে মেরেছো এবং প্রায়ই তুমি মানুষের হাতে মরতে মরতে বেঁচে গেছো! আর এখন কি না তুমি এক আওরতের আঘাতে কুপোকাত? দুনিয়াতে নূরা ছাড়াও রয়েছে অন্য আওরত..ওহে আবু সাইয়িদ, যোদ্ধা, নির্বোধ...'

আফ্রিকীটি যখন কাৎরাচ্ছে আস্তে আস্তে এবং দু'হাত দিয়ে তার মুখ ঢেকে দিচ্ছে তখনো যায়েদ বলে চলে ঃ

—'খামুশ, হে আবু সাইয়িদ... মুখ তুলে চাও ঃ তুমি আসমানের আলোকিত পথটি দেখতে পাচ্ছো?'

আবু সাইয়িদ সবিস্ময়ে আকাশের দিকে তাকায় আর আমি নিজের অজ্ঞাতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে যায়েদের তর্জনী অনুসরণ করি আর আমার চোখ ফিরাই পাণ্ডুর অসমান পথটির দিকে—যা আকাশের মধ্য দিয়ে চলে গেছে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত। আপনারা এটিকে বলবেন ছায়াপথ; কিন্তু বদ্দুরা তাদের মরুসুলভ প্রজ্ঞার মাধ্যমে জানে, এ আর কিছু নয়—-এ হচ্ছে সেই মেষের পথ যা ইব্‌রাহীমের নিকট পাঠানো হয়েছিলো, যখন তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর আনুগত্যবশে এবং তাঁর অন্তরের নৈরাশ্যে ছুরি তুলে ধরেছিলেন তাঁর প্রথম-জাত পুত্রকে কুরবানী করার জন্য। সেই মেষের পথটিই আকাশে দৃশ্যমান রয়ে গেছে চিরকালের জন্য—রহমত ও করুণার প্রতীক—এক মানব হৃদয়ের যন্ত্রণা উপশমের জন্য নিষ্কৃতি প্রেরণ করা হয়েছিলো, তারই স্মৃতি হিসাবে, আর এ কারণেই, তা তাদের জন্যও একটি সান্ত্বনা যারা আসবে পরে, ভবিষ্যতেঃ তাদের জন্য, যারা মরুভূমিতে একাকী অথবা দিশাহারা, আর তাদের জন্য যারা পথ চলে নিজ জীবনের মরু প্রান্তরের মধ্য দিয়ে কেঁদে কেঁদে নিঃসংগ পরিত্যাক্ত অবস্থায় টলতে টলতে, হোঁচট খেতে খেতে!

আর, যায়েদ আকাশের দিকে তার হাত তুলে কথা বলতে থাকে গাম্ভীর্যের সংগে কোনো রকম অহংকার না করেই, যেমনটি কেবল একজন আরব-ই পারে ঃ

—'এটি হচ্ছে সেই মেষের পথ যা আল্লাহ্ পাঠিয়েছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ ইব্‌রাহীমের নিকট, যখন তিনি কুরবানী করতে যাচ্ছিলেন তাঁর প্রথম সন্তানকে। এভাবেই আল্লাহ্ দয়া প্রদর্শন করেছিলেন তাঁর বান্দাকে...তুমি কি মনে করো আল্লাহ্ তোমাকে ভুলে যাচ্ছেন ?' যায়েদের মর্মস্পর্শী কথায় আবু সাইয়িদের কালো মুখখানা শিশু-সুলভ বিস্ময়ে নমনীয় হয়ে ওঠে এবং তাতে ফুটে ওঠে অধিকতরো স্থৈর্যের অভিব্যক্তি এবং—ছাত্র যেমন উস্তাদকে অনুসরণ করে তেমনি মনোযোগের সাথে সে তাকায় আকাশের দিকে আর চেষ্টা করে সেখানে, তার নৈরাশ্যের একটি ফয়সালা খুঁজে পাওয়ার জন্য...।

চার

ইবরাহীম এবং তাঁর বেহেশতী মেষ ঃ এ জাতীয় চিত্রকল্প অতিসহজেই আসে এদেশের মানুষের মনে। সেই প্রাচীন গোষ্ঠীপতির স্মৃতি আমাদের মধ্যে এতো স্পষ্ট ও জীবন্ত যে, তা পাশ্চাত্যের খৃষ্টানের মধ্যে এই স্মৃতি যতোটা জীবন্ত, তার চাইতে অনেক অনেক বেশি। খৃষ্টানেরা আর যা-ই হোক, তাদের ধর্মীয় চিত্রকল্পের জন্য প্রথমেই নির্ভর করে তৌরাতের উপর; এমনকি, ইহুদীদের চাইতেও এ স্মৃতি অনেক অনেক বেশি উজ্জ্বল ও জীবন্ত আরবদের কাছে, যদিও তৌরাত হচ্ছে ইহুদীর দৃষ্টিতে মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রথম ও শেষ কথা। হযরত ইব্‌রাহীমের আধ্যাত্মিক উপস্থিতি প্রতিটি মুহূর্তে অনুভূত হয় আরবে, ঠিক যেমনটি হয় গোটা মুসলিম বিশ্বে, কেবল মুসলিম ছেলেদের ঘন ঘন তাঁর নামে (তাঁর আরবী রূপ ইব্‌রাহীম'রূপে) নামকরণে নয়, বরং ক্রমাগত ঘুরে আসে আল-কুরআনে এবং মুসলমানদের দৈনিক সালাতে; উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র একত্ব সম্পর্কে প্রথম সচেতন প্রচারক হিসাবে গোষ্ঠীপতির ভূমিকার স্মরণেও ঃ যার মধ্যে মেলে প্রতি বছর মক্কায় হজ্জ করার উপর ইসলাম কেনো অমন বিপুল গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তার ব্যাখ্যা। যে মক্কার সঙ্গে আদিকাল থেকেই নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে হযরত ইব্‌রাহীমের কাহিনী। পাশ্চাত্যের বহু লোক যেমন ভুল করে মনে করে থাকে-হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক ইহুদী ধর্মের কিসসা-কাহিনীর উপাদান 'ধার' করার চেষ্টাই যেনো ইব্‌রাহীমকে নিয়ে আসে মুসলিম চিন্তার কক্ষপথে, কারণ ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, ইসলামের অভ্যুদয়ের অনেক আগেই ব্যক্তি হিসাবে হযরত ইব্‌রাহীমের কথা সুপরিজ্ঞাত ছিলো আরবদের কাছে। আল্-কুরআনে এই গোষ্ঠীপতি সম্পর্কে প্রত্যেকটি উল্লেখ এমন শব্দ বিন্যাসের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা)-এর আমলের বহু-বহু যুগ আগেও যে তিনি আরব মনের সম্মুখে জীবন্ত ছিলেন, এতে কোনো সন্দেহ থাকে না। তাঁর নাম এবং তাঁর জীবনের রূপরেখা সবসময় উল্লিখিত হয় কোনো ভূমিকা বা ব্যাখ্যা ছাড়াই, যা এমন এক ব্যাপার, যার সাথে আল্-কুরআনের একেবারে প্রথমদিকের শ্রোতারাও নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন। বস্তুত ইসলাম-পূর্বকালেও অরবদের নসবনামায় ইবরাহীমের একটি বিশিষ্ট স্থান দেখা যায় হাজেরার পুত্র ইসমাঈলের মাধ্যমে 'উত্তর অঞ্চলে'র আরব-গোষ্ঠীর জনক হিসাবে, যে গোষ্ঠীটি আজ গোটা আরব-জাতির অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত।

আর এই গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত ছিলো মুহাম্মদের নিজের গোত্র কুরাইশ।

তৌরাতে ইসমাঈল এবং তাঁর মায়ের কাহিনীর শুরুই কেবল উল্লিখিত হয়েছে। কারণ এ কাহিনীর পরবর্তী পরিণতির সাথে হিব্রু জাতির ভাগ্যের প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই, আর হিব্রু জাতির ভাগ্যই হচ্ছে তৌরাতের মূল উদ্দিষ্ট। কিন্তু ইসলাম-পূর্ব যুগের আরব ঐতিহ্যে অনেক বেশি বক্তব্য রয়েছে এ বিষয়ে।

এই ঐতিহ্য অনুসারে, আজ যেখানে মক্কা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে হাজেরা এবং ইসমাঈলকে রেখে চলে গিয়েছিলেন ইব্রাহীম। এ কাহিনী যেভাবে চলে আসছে তা কোনো দিক দিয়েই অসম্ভব নয়, যদি আমরা মনে করি যে, উট-সাওয়ার কোনো যাযাবরের কাছে তিরিশ কিংবা তার বেশি দিনের সফর মোটেও অস্বাভাবিক ছিলো না, এবং অস্বাভাবিক নয়। যা-ই হোক, আরব ঐতিহ্য বলে, ইবরাহীম হাজেরা এবং তাঁদের শিশুকে নিয়ে এসেছিলেন এই উপত্যকাতেই—আরবের সূর্যের নীচে নগ্ন এবং ঊষার শিলা-গঠিত পাহাড়ের মধ্যকার এই গিরিখাতের মধ্যে, যার উপর দিয়ে বয়ে যায় লেলিহান আগুনের শিখার মতো মরুবায়ু, যে স্থান এড়িয়ে চলে শিকারী পাখিরাও! এমনকি, আজো যখন ঘরবাড়ি, রাস্তা এবং বহু ভাষী ও বহু জাতির মানুষে মক্কা উপত্যকার পূর্ণ, তখনো চারপাশে যে নীরব নিথর পার্বত্য ঢাল রয়েছে, তার মধ্য থেকে মরুভূমির নির্জনতা চীৎকার করতে থাকে, আর কা'বার সম্মুখে হজ্জযাত্রী যে বিপুল সংখ্যক নর-নারী সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে তাদের উপর শূন্যে ভেসে বেড়ায় সুদীর্ঘ অতীতকালের বহু হাজার বছরের অশরিরী উপস্থিতি যাতে নিরবচ্ছিন্ন এবং প্রাণলেশহীন নীরবতা ঝুলে আছে শূন্য উপত্যকার উপর।

সেই মিসরীয় রমনী দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি হাজেরা নৈরাশ্য ও হতাশার পক্ষে এ ছিলো একটি উপযুক্ত পরিবেশ, যিনি তাঁর স্বামীর ঔরসে জন্ম দিয়েছিলেন এক পুত্র-সন্তানের, আর এ কারণে তাঁর স্বামীর প্রথমা স্ত্রীর অতোটা বিদ্বেষের কারণ হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁকে এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈলকে দিতে হয়েছিলো নির্বাসন। গোষ্ঠীপতি হযরত ইব্‌রাহীম মনে নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছিলেন যখন তাঁর অনমনীয় স্ত্রীর মন পাবার জন্য তাঁকে এ কাজ করতে হয়েছিলো। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র এতো প্রিয়পাত্র যে, তিনি এ নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতেন, আল্লাহ্‌র রহমতের কোনো সীমা নেই। তৌরাতের সৃজন বিষয়ক খণ্ডে আমরা জানতে পাই, আল্লাহ্ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এভাবে ঃ এই শিশু এবং তোমার এই স্ত্রীর এই অবস্থা দেখে তোমার যেনো কষ্ট না হয়...তাঁর পুত্র থেকে আমি উত্থান ঘটাবো এক জাতির, কারণ সে তোমার সন্তান। এবং এভাবে, হযরত ইবরাহীম সেই রোরুদ্যমানা রমণী এবং তাঁর পুত্রকে এই উপত্যকায় রেখে চলে গেলেন; ওদের দিয়ে গেলেন একটি মশক এবং খেজুর-ভর্তি একটি চামড়া, আর তিনি নিজে চলে গেলেন উত্তরদিকে মাদাঈন হয়ে কেনান দেশে।

সেই উপত্যতায় ছিলো একটিমাত্র বুনো 'সর্‌হা' গাছ। তারই ছায়ায় শিশুটিকে কোলে নিয়ে বসেছিলেন হাজেরা। তাঁকে ঘিরে সাঁতরে চলা ঢেউ-খেলানো গরম বালু এবং শিলা-গঠিত টিলার ঢালের উপর চোখ ঝলসানো আলো ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। কী চমৎকার ছিলো সে গাছের ছায়া...কিন্তু এই নীরবতা—এক ভয়ঙ্কর নীরবতা, যার মধ্যে শোনা যায় না কোনো জীবিত প্রাণীর নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত! দিন যখন বিদায় নিচ্ছে, ধীরে ধীরে হাজেরা ভাবলেন, যদি কেবল কোনো প্রাণীও আসতো এখানে—একটি পাখি, একটি জন্তু,

হ্যাঁ...এমন কি, শিকারী পশু ঃ ওহো, কী আনন্দেরই না হতো! কিন্তু কিছুই এলো না রাত ছাড়া, রাত এলো মরু-রাত্রির স্বস্তি নিয়ে, যেনো অন্ধকার ও আকাশের এক ছাদ—শীতলতা ছড়িয়ে, যা তার নৈরাশ্যের তিক্ততাকে দেয় হালকা করে। নতুন সাহস সঞ্চারিত হয় হাজেরার বুকের ভেতর। তিনি তাঁর শিশুপুত্রকে কয়েকটি খেজুর খাওয়ান এবং দু'জনই পানি খান মশক থেকে।

রাত শেষ হয় এবং আরেকটি দিন এবং পরে আরেকটি রাত। কিন্তু তিসরা রোজ যখন এলো তার আগুনে নিশ্বাস নিয়ে তখন আর মশকে পানি নেই এক ফোঁটাও এবং সমস্ত শক্তিকে ছাপিয়ে উঠলো হতাশা এবং আশা হয়ে দাঁড়ালো একটা ভাঙা পাত্রের মতো। আর শিশুটি যখন বৃথাই কাঁদতে লাগলো পানির জন্য, ক্রমেই দুর্বলতরো হয়ে আসা কণ্ঠে হাজেরা চীৎকার করে উঠলেন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। শিশুর কষ্টে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে দু'হাত উর্ধ্বে তুলে দৌড়াতে লাগলেন উপত্যকার ভেতর দিয়ে এদিক ওদিক, আর তাঁর এই হতাশার স্মরণেই মক্কায় এখন যাঁরা হজ্ব করতে আসেন, সাতবার দৌড়ান এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে—একদিন হাজেরা যেমন আর্ত চীৎকার করেছিলেন তেমনি চীৎকার করতে করতে, 'হে দয়াময়, হে করুণাময়, কে আমাদের প্রতি দয়া করবে, যদি না দয়া করো তুমি ?'

এবং তখনই এলো জবাবঃ আর দেখো, একটি পানির ফোয়ারা উৎসারিত হয়েছে আর বইতে শুরু করেছে বালির উপর দিয়ে! হাজেরা উল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন এবং শিশুর মুখ চেপে ধরলেন সেই মহামূল্য তরল পদার্থটিতে, যাতে করে সে পান করতে পারে এবং তিনিও তাঁর সাথে পান করলেন, শ্বাস-প্রশ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে, প্রার্থনার ভঙ্গিতে 'জুম্মি জুম্মি' বলতে বলতে—এমন একটি শব্দ যার কোনো অর্থ নেই, কেবল, জমি ফুঁড়ে উৎসারিত পানির শব্দের অনুকরণে যেনো বলতে চাইছেন—'উৎসারিত হও, উৎসারিত হও।' পাছে না পানি ফুরিয়ে যায় এবং যমিনের নীচে হারিয়ে যায়, এজন্য হাজেরা সে উৎসের চারপাশে বালি জমিয়ে জমিয়ে একটি ছোট্ট দেয়াল তৈরি করেন, যার ফলে পানির প্রবাহ থেমে গেলো এবং হয়ে উঠলো কুয়া। তখন থেকেই তা পরিচিত হয়ে আসছে জমজম কূপ নামে এবং আজো টিকে আছে।

ওঁরা দু'জন এখন তৃষ্ণার কবল থেকে রক্ষা পেয়েছেন এবং খেজুরে চললো আরো বেশ কিছুদিন। কয়েকদিন পর একদল বদ্দু, যারা তাদের পরিবার-পরিজন আর পশুপালনসহ দক্ষিণ আরবে তাদের স্বদেশ ত্যাগ করে এসেছে এবং খুঁজছে নতুন চারণ ক্ষেত্র, ঘটনাক্রমে যাচ্ছিলো এই উপত্যকার প্রবেশ-পথ হয়ে। ওরা যখন দেখলো, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি চক্রাকারে ঘুরছে এর উপর ওরা সিদ্ধান্তে এলো, এখানে নিশ্চয়ই পানি আছে। ওদেরই কোনো কোনো লোক উট হাঁকিয়ে ছুটলো উপত্যকার ভেতরে, দেখবার জন্য ওখানে কী আছে এবং দেখতে পেলো এক শিশু নিয়ে একাকী এক রমণী বসে আছে কানায় কানায় পানিতে ভর্তি এক কুয়ার কিনারে। লোকগুলি ছিলো স্বভাবের দিক দিয়ে শান্ত। তাই ওরা অনুমতি চায় হাজেরার কাছে তাঁর উপত্যকায় বসতি স্থাপনের জন্য। হাজেরা তা মনযুর করেন একটি শর্তে ঃ জমজম কুয়াটি ইসলাঈল এবং তাঁর বংশধরদের সম্পদ হয়ে থাকবে চিরকাল।

আর ইব্‌রাহীমের বেলায়—ইতিবৃত্ত বলে—কিছুকাল পরে তিনি ফিরে আসেন সে উপত্যকায় এবং আল্লাহ্‌র ওয়াদা মতো তিনি এসে জীবিত পান হাজেরা এবং তাঁর পুত্রকে। তখন থেকে তিনি প্রায়ই আসতে থাকেন ওঁদের নিকট এবং তাঁর চোখের সামনেই ইসমাঈল

হয়ে উঠলেন যৌবনে উপনীত এক পুরুষ এবং বিয়ে করেন দক্ষিণ আরবীয় কওমের এক বালিকাকে। কয়েক বছর পর গোষ্ঠীপতি ইবরাহীম স্বপ্নে নির্দেশ পান তাঁর প্রভুর উদ্দেশ্যে জমজম কুয়ার কাছে একটি 'ইবাদতগাহ্' নির্মাণের। এরপর তিনি তাঁর পুত্রের সাহায্য নিয়ে নির্মাণ করেন মক্কায় যে 'ইবাদত গৃহটি' আজো বিদ্যমান এবং কা'বা নামে পরিচিত, তারই প্রথম মডেল বা নমুনাটি। এক আল্লাহ্র 'ইবাদতের জন্য নির্মিত সর্বপ্রথম গৃহ বলে যা গণ্য হবে ভবিষ্যতে, সেই ঘর তৈরির জন্য ওঁরা যখন পাথর কাটছেন, তখন ইব্রাহীম তাঁর মুখ আকাশের দিকে তোলেন এবং আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠেনঃ 'লাব্বায়েক! আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক।' "তোমার জন্য আমি প্রস্তুত হে আল্লাহ্, তোমার জন্য আমি তৈরি।" আর এজন্যই মুসলমানরা মক্কায় এক আল্লাহ্র জন্য স্থাপিত প্রথম ইবাদতগৃহে হজ্জ করতে গিয়ে যখন পবিত্র নগরীর নিকটবর্তী হয়, তখন ওরা তোলে একই ধ্বনি, 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক।'

পাঁচ

—'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক'...

আমি মক্কায় আমার পাঁচবার হজ্জে কতোবার শুনেছি এই ধ্বনি। মনে হলো এখনো আমি তা শুনতে পাচ্ছি যখন শুয়ে আছি আগুনের পাশে, যায়েদ এবং আবু সাইয়িদের কাছে।

আমি আমার চোখ বুঁজি এবং চাঁদ ও সিতারা অন্তর্হিত হয় আমার সমুখ থেকে। আমি আমার মুখের উপর রাখি আমার বাহু এবং আগুনের আলোও এখন আর ভেদ করতে পারে না আমার চোখের পাতা। মরুভূমির সকল শব্দ ও ধ্বনি তলিয়ে গেলো। আমি আর কিছুই শুনতে পাই না আমার মনে 'লাব্বায়েক' ধ্বনি এবং কানে রক্তের অস্ফুট গুঞ্জন ও স্পন্দন ছাড়া। রক্ত অস্ফুট ধ্বনি তুলছে, ধুক্ ধুক্ করছে, আছড়ে পড়ছে জাহাজের খোলে আছড়ে-পড়া সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, আর ইঞ্জিনের ধড়ফড়ানির মতো। আমি শুনতে পাই ইঞ্জিনের ধড়ফড়ানি, অনুভব করি আমার নিচে জাহাজের তক্তার কাঁপুনি এবং নাকে পাই জাহাজের ধুঁয়া ও তেলের গন্ধ এবং শুনি সেই ধ্বনি 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বয়েক' যেমন তা ধ্বনিত হয়েছিলো শত শত কণ্ঠে, সেই জাহাজে যা আমাকে বহন ক'রে এনেছিলো ছ'বছর আগে আমার পয়লা হজ্জ-যাত্রায়, মিসর থেকে আরবে একটি সাগরের উপর, যার নাম লোহিত সাগর এবং কেউই জানে না, কেনো এ নাম হয়েছে এ সাগরের। কারণ আমরা জাহাজে ক'রে চলছিলাম সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে, যার ডান পাশে পড়ে আফ্রিকার কয়েকটি পাহাড় আর বাঁদিকে রয়েছে সিনাই উপত্যকার গিরিশ্রেণী, দু-ই নগ্ন, অনাবৃত, শিলা-গঠিত পাহাড়, যাতে নেই কোনো গাছপালা। জাহাজের অগ্রগতির সাথে সাথে যা আগিয়ে চলেছে দূর হতে আরো দূরে, এবং দৃষ্টির প্রায় বাইরে, এমন আর এক কুয়াশা-ধূসর দূরত্বে গিয়ে আমরা পৌঁছুই যেখান থেকে ভূভাগ কেবল অনুভব করা যায়, ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা যায় না। সুয়েজ খালের বুকে এই সমস্ত পথটি জুড়ে আমরা যে পানি দেখতে পাই, তা লাল নয়, ধূসর এবং তারপর শেষ বিকালে আমরা যখন ঢুকে পড়ি খোলামেলা প্রসস্ত লোহিত সাগরে, দেখা গেলো, আদর করা বাতাসের মৃদু পরশের নীচে ভূমধ্যসাগরের মতোই লোহিত সাগরও নীল।

জাহাজে কেবল হজ্ব-যাত্রীরাই রয়েছে এবং তারা সংখ্যায় এতো বেশি যে, এতোগুলি লোককে বহন করার ক্ষমতা জাহাজের নেই বললেই চলে। সংক্ষিপ্ত 'হজ্ব' মৌসুমের মুনাফার জন্য পাগল লোভী জাহাজ-কোম্পানীই যাত্রীদের আরাম-আয়েশের দিকে লক্ষ্য না রেখে, আক্ষরিক অর্থেই জাহাজটিকে বোঝাই করছে কানায় কানায়। ডেকের উপর কেবিনগুলিতে, প্যাসেজে, প্রত্যেক সিঁড়িতে, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ডাইনিং রুমগুলিতে, যাত্রী বহনের জন্যই জাহাজের যে খোলগুলি খালি করে মই লাগানো হয়েছে, সেগুলিতে ঃ প্রত্যেকটি খালি জায়গা ও কোণে মানুষকে একত্র গাদাগাদি করে ঠাসা হয়েছে খুবই যন্ত্রণাদায়কভাবে। ওদের প্রায় সকলেই মিসর এবং উত্তর আফ্রিকার হজ্বযাত্রী। পরম নম্রতার সাথে, কেবলমাত্র এই সফরের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ওরা কোনো প্রতিবাদ ও অভিযোগ না ক'রে সহ্য করে যাচ্ছে এহেন অনাবশ্যক কষ্ট। কিভাবে ওরা—নারী, পুরুষ, শিশু—গাদাগাদি ঠাসাঠাসি এককেটা দল হিসাবে ডেকের পাটাতনের উপর পশুর মতো শুয়ে আছে এবং অতি কষ্টের সাথে তাদের গেরস্থালীর বাসনপত্র ঘষামাজা ক'রে পরিষ্কার করছে; রাঁধছে (কারণ, কোম্পানী কোনো খাবার সরবরাহ করছে না) কেমন ক'রে সবসময় ঠেলাঠেলি ক'রে ওরা পানির জন্য এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে টিনের মগ বা ক্যানভাস মোড়া পানির পাত্র নিয়ে, প্রতি মুহূর্তেই একটি যন্ত্রণা মানুষের এই চাপাচাপির মধ্যে; কেমন করে ওরা দিনে পাঁচবার জমায়েত হয় পানির কলের চারপাশে—কেননা অতোগুলি মানুষের জন্য অতি অল্প কটি ট্যাপই রয়েছে সালাতের আগে ওযু করার জন্য। কেমন ক'রে ওরা যাতনা ভোগ করছে জাহাজের গভীর খোলের দম বন্ধ করা বাতাসে, ডেকের দুই তলা নীচের খোলগুলিতে যেখানে অন্য সময়ে, কেবল গাঁট এবং জিনিসপত্রের কেসই ভ্রমণ করে—যে কেউ তা দেখলে সে-ই উপলব্ধি করবে ঈমানের জোর, বিশ্বাসের শক্তি, যে শক্তিতে এরা—হজ্বযাত্রীরা শক্তিমান; কারণ মক্কার চিন্তায় ওরা এমনি মশগুল, এমনি নিমগ্ন যে, ওদের এই কষ্ট ওরা আসলে অনুভব করছে বলেই মনে হয় না। ওদের মুখে কেবল 'হজ্বে'রই কথা এবং যে আবেগ নিয়ে ওরা ওদের আসন্ন ভবিষ্যতের দিকে তাকাচ্ছে, তাতে দীপ্ত-উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ওদের মন। মেয়েলোকেরা প্রায়ই কোরাসে গাইছে পবিত্র নগরীর গান আর বারবার ঘুরে-ফিরে উঠছে একটি ধ্বনি—'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক।'

দ্বিতীয় দিনের প্রায় দুপুরের দিকে জাহাজের সিটি বেজে ওঠেঃ এ তারই সংকেত যে আমরা রাবিগের অক্ষাংশে পৌঁছে গেছি। রাবিগ জেদ্দার উত্তরের একটি ছোট্ট বন্দর, যেখানে প্রাচীন এক ঐতিহ্য মুতাবিক, উত্তর অঞ্চল থেকে আগত পুরুষ হজ্বযাত্রীদের খুলে ফেলতে হয় তাদের দৈনন্দিন পেশাক-আশাক এবং পরতে হয় ইহরাম তথা হজ্বযাত্রীদের পোশাক। এ পোশাকের মধ্যে আছে সেলাই না করা দুই টুকরা সাদা পশমী অথবা সূতী কাপড়, যার এক খণ্ড পেঁচানো হয় কোমরে এবং পৌঁছে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত এবং অন্য খণ্ডটি আলগাভাবে ঝুলানো হয় একটি কাঁধের উপর আর মাথা থাকে খোলা, অনাবৃত। এই যে পোশাক, যার মূলে রয়েছে রসূলের অতীতের একটি আদেশ, এর যুক্তি এই যে, 'হজ্বের' সময় আল্লাহ্‌র ঘর যিয়ারতের জন্য পৃথিবীর সব জায়গা থেকে যে মুমিনেরা এসে ভীড় করে, তারা একে অপরের অপরিচিত, এ অনুভূতি যেনো তাদের মধ্যে না থাকে— জাত ও জাতির মধ্যে অথবা ধনী-গরীব কিংবা উঁচু-নিচুর মধ্যে কোনো ব্যবধান যেনো না থাকে, যেনো ওরা সকলেই জানতে পারে—ওরা ভাই ভাই, আল্লাহ্ এবং মানুষের কাছে সমান।

আর দেখতে না দেখতে আমাদের জাহাজ থেকে কোথায় গায়েব হয়ে গেলো পুরুষদের সকল রং-বেরংয়ের বর্ণাঢ্য পোশাক! এখন আর আপনি দেখতে পাবেন না তিউনিসের লাল 'তারবুস', মরক্কোবাসীদের জমকালো দামী 'বার্নাস' অথবা মিসরীয় 'লোহিনের' রুচি-বিবর্জিত গল্লাবিয়া' ঃ এখন আপনার চারপাশে সর্বত্র রয়েছে কেবল এই তুচ্ছ সাদা কাপড়, যাতে কোনো ফুলের কাজ বা নক্‌শাই নেই, চাপানো হয়েছে হজ্বযাত্রীদের গায়ের উপর, যারা এখন নড়াচড়া করছে মহত্তর মর্যাদার সংগে হজ্বের উদ্দেশ্যে এই পরিবর্তনের স্পষ্টতই প্রভাবিত হ'য়ে। 'ইহরাম' যেহেতু রমণীদের শরীরের অনেকখানি ব্যক্ত করে দেবে এজন্য মহিলা হজ্বযাত্রীরা ওদের স্বাভাবিক পোশাক-আশাকই পরেন। কিন্তু আমাদের জাহাজে যেমন দেখতে পেলাম—ওদের পোশাক হয়, কেবলি কালো না হয় কেবলি সাদা—মিসরীয় রমণীদের গায়ে কালো গাউন আর উত্তর আফ্রিকার স্ত্রীলোকদের পরণে সাদা—ওদের এই পোশাক বিন্দুমাত্র রঙের পরশও বুলায় না সামগ্রিক চিত্রের মধ্যে।

তৃতীয় দিনের ভোরবেলা জাহাজ নোঙর ফেলে আরবের উপকূলকে সামনে রেখে। আমরা প্রায় সকলেই দাঁড়িয়ে আছি রেলিংয়ে এবং তাকাচ্ছি স্থলভাগের দিকে, যা ভোরের কুয়াশার মধ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

সকল দিকেই দেখতে পাচ্ছি অন্যান্য হজ্বযাত্রী জাহাজের ছায়া-শরীর এবং সেই সব জাহাজ ও স্থলভাগের মধ্যে পানিতে বিবর্ণ হলুদ ও পান্না সবুজের রেখা ঃ পানির নিচে প্রবল প্রাচীর, লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূলের সমুখে যে দীর্ঘ প্রতিকূল প্রাচীরমালা রয়েছে তারই অংশ। ওগুলি ছাড়িয়ে পুবদিকে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের মতোই একটা-কিছু, নিচু এবং আলো আঁধারীতে ঢাকা; কিন্তু ওর পিছনদিকে আকস্মাৎ যখন সূর্য উঠলো এ আর পাহাড় রইলো না; হয়ে উঠলো সমুদ্র-তীরের একটি শহর, যা সমুদ্রের কিনার থেকে ধাপে ধাপে উঠে গেছে উপরদিকে, শহরের মধ্যভাগ পর্যন্ত ক্রমেই উঁচু হতে আরো উঁচু হয়ে ওঠা ঘরবাড়ি নিয়ে—একটি ছোট্ট নাজুক ইমারত যেন—যা গোলাপী এবং হলুদে-ধূসর প্রবাল পাথর দিয়ে তৈরি ঃ জিদ্দা বন্দর। ক্রমে ক্রমে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কোণ-তোলা ঝালর-দেয়া খিড়কি-জানালা এবং বেলকনির আড়াল, বহু-বছরের আর্দ্র আবহাওয়া যাকে দিয়েছে একই রকম এক ধূসর সবুজ রঙ। মধ্যস্থলে একটি মীনার উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে, সাদা এবং উর্ধ্বে তোলা একটি আঙুলের মতোই, ঋজু, সরল।

আবার ধ্বনি উঠলো 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক—আত্মসমর্পণ এবং উদ্দীপনার এক হর্ষোৎফুল্ল ধ্বনি, যা জাহাজের সাদা পোশাক পরা উত্তেজিত হজ্ব-যাত্রীদের মধ্য থেকে উঠে পানির উপর দিয়ে ধাবিত হয় তাদের পরম আশা ও স্বপ্নের দেশের দিকে!

ওদের আশা এবং আমরাও ঃ কারণ আমার কাছে আরব উপকূলের এই দৃশ্য আমার বহু বছরের অনুসন্ধানের চূড়ান্ত পরিণতি। আমি আমার স্ত্রী এল্‌সার দিকে তাকাই যে ছিলো আমার এ হজ্ব যাত্রায় আমার সহযাত্রী এবং তার চোখেও পাঠ করি একই অনুভূতি...

আর তারপর, আমরা দেখতে পাই এক ঝাঁক শুভ্র ডানা তীরবেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে মূল স্থলভাগ থেকেঃ আরবের উপকূলীয় কিশ্‌তী লাতিন পাল উঁচিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা সমুদ্রের বুক ছুঁয়ে আসছে নৌকাগুলি, মোলায়েম ছন্দে নিঃশব্দে, যেনো দুই অদৃশ্য প্রবাল প্রাচীরের মধ্যকার ফাঁক দিয়ে ঘুরে ঘুরে এঁকে বেঁকে, আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য

তৈরি আরবের পাঠানো প্রথম দূতেরা। নৌকাগুলি ধীরে ধীরে ক্রমেই কাছে ঘেঁষে আসে এবং শেষপর্যন্ত সব ক'টিই ভিড় করে এক সংগে, জাহাজের পাশে মাস্তুল হেলিয়ে দুলিয়ে আর ওদের পালগুলি গুটানো হতে লাগলো একটির পর 'একটি ক'রে, অতিশয় ব্যস্ততার সংগে সুইশ্ সুইশ্ শব্দ ক'রে আর পালে পৎ পৎ আওয়াজ তুলে'—যেনো এক ঝাঁক বিশাল সারস পাখি নেমে পড়েছে খাবারের সন্ধানে। এবং মুহূর্তকাল আগের নীরবতা থেকে ওদের মধ্যে জাগলো এক কর্কশ আওয়াজ আর চিৎকার ঃ এ হচ্ছে নৌকার মাঝিদের চিৎকার যারা এখন লাফিয়ে এক নৌকা থেকে আরেক নৌকায় উঠতে শুরু করেছে এবং হামলা চালিয়েছে জাহাজের সিঁড়ির উপর হজ্বযাত্রীদের গাট্টি বোচ্‌কা, বাক্স-পেটেরা ধরবার জন্য। আর পবিত্র ভূমির দৃশ্যে হজ্বযাত্রীরা উত্তেজনায় এতোই অভিভূত যে, ওরা নিজেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা না ক'রে ওদের উপর যা ঘটেছে তা-ই ওরা মেনে নিচ্ছে!

নৌকাগুলি ভারী এবং প্রশস্ত, ওদের খোলের পারিপাট্যবিহীন এবড়ো-থেবড়ো গড়ন, ওদের উঁচু মাস্তুল আর পালের সৌন্দর্য ও ছিমছাম রূপের সাথে বিস্ময়করভাবে বেমানান। নিশ্চয়ই এ ধরনের একটি নৌকায় চড়েই, হয়তো বা এ জাতেরই একটি আরো কিছু বড়ো এক নৌযানে চড়ে সেই দুঃসাহসী সমুদ্রজয়ী সিন্দাবাদ বের হয়ে পড়েছিলো, যে-এড্‌ভেন্‌চারের জন্য কেউ তাকে অনুরোধ করেনি এমনি সব এড্‌ভেন্‌চারের উদ্দেশ্যে এবং নেমে পড়েছিলো এক দ্বীপে যা ছিলো আসলে...ওহো কী ভয়ংকর এক তিমি মাছের পিঠ...আর এ ধরনের জাহাজে করেই সিন্দাবাদের অনেক অনেক আগে ফিনিশীয়রা এই লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে পাল তুলে রওয়ানা দিতো দক্ষিণদিকে আর আরব সাগর পাড়ি দিয়ে চলতো তাদের সফর...গরম মসলা, আগর, ধুপধুনা এবং 'ওফিরে'র রত্নভাণ্ডারের সন্ধানে...।

আর এখন আমরা, সেই সব দুঃসাহসী বীর সমুদ্র-যাত্রীদের ক্ষীণ বামন উত্তরাধিকারীরা, নৌকায় ক'রে চলেছি প্রবাল সাগরের মধ্য দিয়ে, পানির নীচে নিমজ্জিত প্রবাল প্রাচীর এড়িয়ে, প্রশস্ত বক্র রেখায়ঃ হজ্বযাত্রী সব, গায়ে সাদা কাপড়, কেস, বাক্স, ট্রাংক আর বাণ্ডিলের ফাঁকে ফাঁকে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি বোবা এক দংগল মানুষ...প্রত্যাশায় বুক আমাদের কাঁপছে, আমরা শিহরিত হচ্ছি !

প্রত্যাশায় ভরপুর ছিলাম আমিও। কিন্তু নৌকার গলুই-এ আমার হাতে আমার স্ত্রীর হাত নিয়ে যখন বসে আছি, কী ক'রে আমার পক্ষে আগাম প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হতো যে, 'হজ্ব' যাত্রার এ সহজ সামান্য একটি প্রয়াস আমাদের জীবনকে বদলে দেবে এতো গভীরভাবে, অমন সম্পূর্ণভাবে? আবার, আমি ভাবতে বাধ্য হই সিন্দাবাদের কথা। সে যখন তার দেশের উপকূল ছেড়ে গিয়ে পড়েছিলো সমুদ্দুরে, আমার মতোই তারও কোনো ধারণাই ছিলো না ভবিষ্যৎ কী বহন করে আনতে যাচ্ছে তার জন্য; পরে যেসব বিচিত্র এ্যাডভেন্‌চার তার জীবনে ঘটেছিলো সে তা আগাম দেখেনি, দেখার ইচ্ছাও তার ছিলো না; সে চেয়েছিলো কেবল সওদাগরি করতে আর টাকা কামাই করতে। আমি হজ্ব করা ছাড়া আর কিছুই চাইনি; কিন্তু তার এবং আমার জীবনে যেসব ব্যাপার ঘটবার ছিলো, প্রকৃতই যখন সেগুলি ঘটে গেলো, তখন আর আমাদের দু'জনের কারো পক্ষেই পুরানো চোখ দিয়ে তাকানো সম্ভব হলো না আমাদের পৃথিবীর দিকে।

একথা ঠিক, বসরার সে নাবিককে যে জীন, যাদুগ্রস্ত স্ত্রীলোক বা বিশাল রক্ পাখির

মুকাবিলা করতে হয়েছিলো, তেমন উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত কিছুই আমার জীবনে ঘটেনি ঃ কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার সে প্রথম হজ্ব আমার জীবনের গভীরে যে প্রভাব বিস্তার করেছিলো, ঐ নাবিকের সকল সমুদ্র যাত্রা মিলেও ওর জীবনে সে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এল্‌সার জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করছে সমুখে এবং তা কতো আসন্ন, আমাদের দু'জনের কেউ তো তার কোনো পূর্ব আলামত পাইনি। তার আর আমার নিজের বেলায়, আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমিই পশ্চিমা জগত ছেড়ে এসেছি মুসলমানদের মধ্যে থাকার জন্য; কিন্তু আমি জানতাম না যে, আমি আমার গোটা অতীতটাকেই পেছনে ফেলে যাচ্ছি। কোনো রকম হুশিয়ারী না জানিয়েই আমার পুরানো পৃথিবী ফুরিয়ে আসছিলো আমার জন্যঃ পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা ও অনুভূতি, প্রয়াস-প্রচেষ্টা ও মানসিক চিত্রকল্পের সেই পৃথিবী! আমার পেছনে একটি দরোজা বন্ধ হয়ে আসছিলো আস্তে আস্তে, এতো নীরবে, এতো চুপিচুপি যে, আমি এ বিষয়ে সচেতন পর্যন্ত ছিলাম নাঃ কিন্তু দিন সম্পূর্ণ বদলে যাবে আর তার সংগে সকল কামনা-বাসনার লক্ষ্যও—এ-ই ছিলো নিয়তি!

তখন পর্যন্ত, আমার প্রাচ্যের বহু দেশ দেখা হয়ে গেছে। ইউরোপের যে-কোনো দেশ থেকে ইরান এবং মিসরকে অনেক বেশি ভালো করে আমি জানি। বহুদিন হলো কাবুল আর অপরিচিত নয় আমার কাছে; দামেশ্‌ক ও ইস্‌ফাহানের বাজারগুলি আমার জানা-শোনা। তাই আমি, 'কতো তুচ্ছ আর মামুলি এসব' এ কথা মনে ক'রে পারিনি যখন আমি জিদ্দার একটি বাজারের মধ্য দিয়ে হাঁটছি এই প্রথমবার, আর প্রত্যক্ষ করছি প্রাচ্যের অন্যত্র যা অনেক বেশি পূর্ণরূপে দেখতে পাওয়া যায়, তারই একটা জগাখিচুড়ি এবং নিরবয়ব পুনরাবৃত্তি!

বাজারটি ঢেকে দেওয়া হয়েছে কাঠের তক্তা এবং ছালার চট দিয়ে, প্রচণ্ড রোদকে আড়াল করার জন্য; তারি ছেদা এবং ফাটা দিয়ে বশে আনা সূর্যরশ্মি আলো দিচ্ছে আর ছায়ান্ধকারকে মণ্ডিত করছে একটা সোনালী আভায়। এখানে ওখানে খোলা জায়গায় রয়েছে রান্না করার চুলা, যার সামনে নিগ্রো বালকেরা গোশ্‌তের ছোটো ছোটো টুকরা সেঁকছে গনগনে কয়লার উপরে, শিকে বিদ্ধ ক'রে। আর রয়েছে কফির দোকান, বার্নিশ করা পিতলের বাসন এবং পাম্‌পাতার তৈরি আসন সমেতঃ চোখে পড়ছে ইউরোপীয় এবং প্রাচ্য রাবিশে ভর্তি দোকানপাট! সর্বত্রই গুমোট, অসহ্য গরম, মাছের গন্ধ আর প্রবাল চূর্ণ। সব জায়গায় মানুষের ভিড়, সাদা পোশাক পরা অসংখ্য হজ্বযাত্রী আর জিদ্দার বর্ণাঢ্য সংসারধর্মী নাগরিকেরা, যাদের চেহারায় পোশাকে এবং চাল-চলনে মিলন ঘটেছে মুসলিম জাহানের সকল দেশেরঃ হয়তো পিতা একজন হিন্দুস্থানী যখন তার নানা—তিনি নিজে হয়তো মালয় ও আরবের মিশ্রণ-বিয়ে করেছেন এক নারীকে যিনি তাঁর পিতার দিক থেকে উজবেকের বংশধর আর মায়ের দিক থেকে সম্ভবত সোমালী খান্দানেরঃ এ হচ্ছে জীবন্ত সাক্ষ্য বহু শতাব্দীর হজ্বযাত্রা ও ইসলামী পরিবেশের, যাতে রঙের ভেদ বা জাতে জাতে বৈষম্যের কোনো অবকাশই নেই। স্থানীয় এবং হজ্বযাত্রীদের দ্বারা আনীত রক্তের মিশ্রণ ছাড়াও সে সময়ে (১৯২৭) হিজাযে জিদ্দাই ছিলো একমাত্র স্থান, যেখানে অমুসলমানদের বাস করতে দেওয়া হতো। মাঝে মাঝে দেখা যায় ইউরোপীয় ভাষায় লেখা দোকানের সাইনবোর্ড, আর সাদা ট্রপিক্যাল পোশাক, রোদ-ঠেকানো হেলমেট বা হ্যাট মাথায় লোকজন, কনস্যুলেটগুলির উপরে পত্‌ পত্‌ করছে বিদেশী পতাকা।

এ সবই যেনো এখনো স্থলভাগের সাথে ততোটুকু সম্পর্কিত নয় যতোটুকু সমুদ্দুরের সাথেঃ বন্দরের শব্দ ও গন্ধের সংগে, ক্ষীণ-বংকিম প্রবালরেখা ছাড়িয়ে নোঙর ফেলা জাহাজের আর শামপা ত্রিকোণ পালওয়ালা জেলে নৌকার সংগে এমন একটা জগত যা ভূমধ্যসাগর থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। যদিও কিছুটা আলাদা মনে হচ্ছে এরি মধ্যে, বাড়িগুলি, মৃদুমন্দ বাতাসের উন্মুক্ত, যার সম্মুখভাগ জমকালো সুগঠিত, কাজ-করা কাঠ দিয়ে তৈরি জানালার ফ্রেম আর বেলকনিগুলি অতি পাতলা ও চিকন কাঠের শলার স্ক্রীন দিয়ে ঢাকা—যে পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে খোলা জায়গার সবকিছু অবাধে দেখতে পারে ঘরের লোকেরা, অথচ পথচারী দেখতে পায় না ভেতরে কী রয়েছে। এ সব কাঠের কাজ গোলাপী প্রবাল পাথরের দেয়ালের উর ধূসর সবুজ ফিতার মতো বসানো, নাজুক এবং অতি সামঞ্জস্যময়। এ আর ভূমধ্যসাগর নয় এবং সম্পূর্ণরূপে আরবও নয়; এ হচ্ছে লোহিত সাগরের উপকূলীয় জগত, যার উভয় তীরে দেখা যায় এ ধরনের স্থাপত্য রীতি।

অবশ্যি, এরি মধ্যে আরব তার নিজস্বতা ঘোষণা করলো ইস্পাতের মতো আকাশে, নগ্ন শিলা গঠিত পাহাড়ে এবং পুবদিকের বালিয়াড়িগুলিতে এবং মহত্তের সেই নিশ্বাসে ও সেই নগ্ন বিরলতায়, যা হামেশাই অমন বিস্ময়করভাবে পরস্পর জড়াজড়ি করে আছে আরবের ভূ-দৃশ্যে।

পরদিন বিকালে আমাদের কাফেলা তার যাত্রা শুরু করে মক্কার পথে, এঁকে বেঁকে—হজ্বযাত্রী বেদুঈন, হাওদা পিঠে অথবা হাওদা ছাড়া উট, সওয়ারী উট, জমকালো রঙিন কাপড় দিয়ে পিঠ ঢেকে দেয়া গাধা, এ সবের ভিড়ের মধ্য দিয়ে শহরের পুব প্রবেশ পথের দিকে। প্রায়ই মোটর গাড়ি ছুটে যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে—সৌদি আরবের একেবারে প্রথমদিকের মোটরগাড়ি—বোঝাই-বোঝাই হজ্বযাত্রী নিয়ে, হর্ন বাজাতে বাজাতে। মনে হলো, উটগুলি বুঝতে পারছে এই নতুন দানবগুলি ওদের দুশমন। কারণ যখনি কোনো মোটরগাড়ি ওদের কাছে আসে ওরা সংকুচিত হয়ে পড়ে, প্রাণপণে বাড়ির প্রাচীরের দিকে ছুটে যায়, ওদের লম্বা গলা এদিক-ওদিক নাড়তে নাড়তে—হতভম্ব, অসহায় প্রাণী। ভীতিপ্রদভাবে, এক নতুন সময়ের উন্মেষ হচ্ছে এই দীর্ঘদেহী ধৈর্যশীল জানোয়ারগুলির জন্য এবং ভয় আর চরম অবলুপ্তির আলামতে ওদের ভয়ার্ত করে তুলছে। কিছুক্ষণ পরেই আমরা নগরীর সাদা প্রাচীর পেছনে ফেলে যাই এবং হঠাৎ আমরা নিজেদের দেখতে পাই একটি মরুভূমিতে—একটি প্রশস্ত প্রান্তরে, ধূসর-বাদামী, নির্জন—এখানে ওখানে কাটাবন ও স্তেপ ঘাসের গুচ্ছ, আর সেই প্রান্তর ভেদ করে নীচু বিচ্ছিন্ন কতকগুলি পাহাড় উঠেছে সমুদ্দুরে দ্বীপপুঞ্জের মতো, যার পুবদিকে প্রাচীর হেন দাঁড়িয়ে আছে কিছুটা উঁচু শিলা-গঠিত সব পাহাড়, নীল ধূসর, দেখতে এবড়ো-থেবড়ো, প্রাণের চিহ্ন-বর্জিত। সেই ভয়াবহ প্রান্তরের সর্বত্র আনাগোনা করছে কাফেলা, অনেকগুলিই দীর্ঘ মিছিল ক'রে—শত শত, হাজার হাজার উট, জানোয়ারের পেছনে জানোয়ার, একই সারিতে, হাওদা, হজ্বযাত্রী এবং গাট্টি-বোচকাতে বোঝাই—কখনো হারিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের আড়ালে আবার ফের ভেসে উঠছে চোখের সামনে। ক্রমশ সকল পথ গিয়ে মিলিত হয় একটিমাত্র ধূলি-ধূসর পথে, একই ধরনের কাফেলার দীর্ঘ শত শত বছরের পদচিহ্ন দ্বারা তৈরি যে পথ।

মরুভূমির সেই নীরবতা, উটের পায়ের ঝপ্ ঝপ্ শব্দ, মাঝে মাঝে বেদুঈন উট

চালকদের ডাক-হাঁক এবং এখানে ওখানে, কোনো হজ্বযাত্রীর নিচু গলার গানে যে নীরবতা ভাঙে না বরং আরো গাঢ় হয়ে ওঠে, আমি হঠাৎ তারই বিরাট এক লোমহর্ষক অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়ি—সে সর্বপ্লাবী সেই অনুভূতি আমাকে এতোই বিহ্বল করে দিলো যে, বলা যেতে পারে এ যেনো এক দিব্যদৃষ্টি ঃ আমি নিজেকে দেখতে পেলাম এক অদৃশ্য অতল গহ্বরের উপর ঝুলন্ত এক সেতুর উপরঃ যে সেতু এতোই দীর্ঘ যে, আমি যে প্রান্ত থেকে এসেছি এরি মধ্যে তা হারিয়ে গেছে সুদূর অস্পষ্ট দূরত্বে, অথচ তার অন্য প্রান্তের আভাসও আমার চোখে ভেসে ওঠেনি এখনো। আমি দাঁড়িয়ে আছি মাঝখানে ঃ আর আমার হৃদপিণ্ড আতংকে কুঁকড়ে গেলো যখন আমি এভাবে নিজেকে দেখতে পেলাম একটি সেতুর দুই প্রান্তের মাঝখানে— ইতিমধ্যেই এক প্রান্ত থেকে অনেক-অনেক দূরে এবং এখনো অন্য প্রান্তের খুব কাছে নই—আর দীর্ঘ কয়েক সেকেণ্ডের জন্য আমার মনে হলো, আমাকে এভাবে সবসময়ই থাকতে হবে দুই প্রান্তের মাঝখানে, হামেশাই গর্জনশীল অতল গহ্বরের উপর...

—যখন আমার সামনের উটের উপর সওয়ার এক মিসরীয় রমণী হঠাৎ তোলে হজ্বযাত্রীদের সেই সুপ্রাচীন ধ্বনি 'লাব্বায়েক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক—আর ভেঙে খান খান হয়ে যায় আমার স্বপ্ন!

সবদিক থেকে আমি শুনতে পাচ্ছি মানুষেরা কথা বলছে, গুন গুন করছে নানান ভাষায়; কখনো কখনো কয়েকজন হজ্বযাত্রী এক সংগে, কোরাসে ধ্বনি তুলছে 'লাব্বায়েক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক'—অথবা একজন মিসরীয় 'কিষাণ' রমণী গান গাইছে রসূলুল্লাহ্‌র সম্মানে, যার পর অপর একজন রমণীর কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে একটি 'গাত্রাফা', আরব রমণীদের সেই হর্ষোৎফুল্ল ধ্বনি, যা রমণীরা তুলে থাকে সকল উৎসবের সময়ে—যেমন বিয়ে-শাদি, শিশুর জন্ম, খৎনা আর সকল প্রকার ধর্মীয় মিছিলে এবং হজ্বের মিছিলে তো বটেই। আগেকার দিনের বীরের দেশ আরবে, যখন সর্দারের কন্যারা সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করে তাদের কবিলার পুরুষদের সাথে যুদ্ধে যেতো, ওদের অধিকতর বীরোচিত কার্যে অনুপ্রাণিত ও উত্তেজিত করার জন্য (কারণ এই সব রমণীদের কোনো একজনকে নিহত হতে দেয়া এবং তারো চাইতে খারাপ, দুশমন কর্তৃক বন্দিনী হতে দেয়া চরম অসম্মানের কাজ বলে গণ্য হতো) তখন এই 'গাত্রাফা' প্রায়ই শোনা যেতো যুদ্ধের ময়দানে।

প্রায় সকল হজ্বযাত্রীই হাওদায় করে চলছে—একেকটি উটের পিঠে দুটি করে হাওদা, আর এই হাওদাগুলির দুলনি ধীরে ধীরে আরোহীকে করে তোলে মানসিক দিক দিয়ে ক্লান্ত, এলোমেলো আর স্নায়ুগুলিকে দেয় নিদারুণ যন্ত্রণা, এমনি অবিশ্রান্ত সে আন্দোলন আর দুলনি। কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ঝিমাতে থাকে আরোহী, হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে ওঠে, আবার ঘুমিয়ে পড়ে, আবার জেগে ওঠে ঘুম থেকে। যে-সব উট চালক কাফেলার সংগে সংগে চলেছে পায়ে হেঁটে, কিছুক্ষণ পর পর ওরা ওদের উটগুলিকে হাঁক ছেড়ে ডাকে। ওদের কেউ কেউ উটের দীর্ঘায়িত পদক্ষেপের ছন্দে মাঝে মাঝে গান ধরে।

সকালের দিকে আমরা বাহ্‌রা পৌঁছুই। ওখানে কাফেলা থামলো দিনের জন্য, কারণ গরম এতো বেশি যে, কেবল রাতের বেলায়ই সফর সম্ভব।

এ গ্রামটি—আসলে যা অগোছালো পর্ণকুটির, কফির দোকান, পাম্‌পাতার কয়েকটি কুঁড়ে ঘর এবং একটি ছোট্ট মসজিদ নিয়ে তৈরি দুটি সারি ছাড়া কিছুই নয়—জিদ্দা এবং

মক্কার ঠিক মাঝখানে এমন একটি জায়গায় অবস্থিত, যেখানে কাফেলা এসে দিনের জন্য থামে, বহুকাল ধ'রে। আমরা উপকূল পেছনে ফেলে আসার পর সারা পথে যে-দৃশ্য দেখতে দেখতে এসেছি এখানকার ভূ-দৃশ্যও তা'ইঃ এক মরুভূমি, এখানে ওখানে রয়েছে আলাদা আলাদা সব পাহাড়, আর পুবদিকে রয়েছে আরো উঁচু নীচু পর্বতমালা, যা উকূলের নিচু অঞ্চলগুলিকে পৃথক করে দিয়েছে মধ্য আরবের মালভূমি থেকে। কিন্তু এখন আমাদের চারপাশের এ গোটা মরুভূমিকে মনে হচ্ছে সেনাবাহিনীর এক বিশাল ছাউনি, অসংখ্য তাঁবু, উট, হাওদা, গাট্টি-বোচকা, আর বহু ভাষার মিলন—আরবী, হিন্দুস্তানী, মালয়ী, ফারসী, সোমালী, তুর্কী, পশ্‌তু, আমহারা এবং আল্লাহ্‌ই জানেন আরো কতো ভাষা! আসলে এ হচ্ছে জাতিপুঞ্জের সত্যিকার জমায়েত, এক সমাবেশ। কিন্তু প্রত্যেকেই যেহেতু পরেছে সবাইকে এক-রূপ করে দেয়া 'ইহ্‌রাম' সেজন্য কোন্ লোক কোন্ বংশ বা কোন্ জাতির তা প্রায় নযরে পড়ছে না বললেই চলে এবং সকল জাতি মিলে দেখাচ্ছে যেনো একটিমাত্র জাতি!

সারারাত চলার পর হজ্বযাত্রীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে খুব কম লোকই জানে—বিশ্রামের সময়টিকেও কাজে লাগানো যেতে পারে। ওদের প্রায় সকলের কাছেই সফর খুব সম্ভব একটি অতি অস্বাভাবিক উদ্যম, আর ওদের অনেকের কাছেই এ হচ্ছে ওদের জীবনের প্রথম সফর—যা অমনি এক নতুন সফর, অমনি এক মহান লক্ষ্যের অভিমুখে। স্বভাবতই চঞ্চল হবার কারণ রয়েছে ওদের ওদের ছোটাছুটি করতে হবে এদিক-ওদিক—কোনোকিছু করবার জন্য ওদের হাতগুলিকে হাতড়াতে হবে, যদি তা ওদের থলে, বস্তা এবং গাট্টি-বোচকা খোলা ও বাঁধার চাইতে বেশি কিছু না-ও হয়, তবুঃ অন্যথায় পৃথিবীর সাথে ওদের সম্পর্ক হয়ে পড়বে ছিন্ন, ওরা নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে বসবে অপার্থিব সুখে, যেমন হারিয়ে যায় মানুষ সমুদ্দুরে... ...

আমার মনে হলো, আমার তাঁবুর ঠিক পরের তাঁবুটিতে যে পরিবারটি রয়েছে ওদের বেলায় তা-ই ঘটেছে; বোঝা যাচ্ছে ওরা বাংলাদেশের কোনো এক গ্রাম থেকে আগত হজ্বযাত্রী। ওরা ক্বচিৎ কথা বলছে ঃ ওরা বসে আছে মাটিতে পায়ের উপর পা রেখে, ওদের অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ পুবে, মক্কার দিকে—মরুভূমির অভ্যন্তরে যা ঝিকমিক-করা উত্তাপে তেতে আছে। ওদের মুখে অমন একটি সুদূল প্রশান্তি রয়েছে যে, আমার মনে হলো, ওরা যেন ইতিমধ্যেই আল্লাহ্‌র ঘরের সম্মুখে অবস্থান করছে এবং প্রায় তাঁর উপস্থিতির মধ্যেই রয়েছে! লোকগুলির সৌন্দর্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে, হালকা পাতলা, কাঁধ পর্যন্ত ঝোলানো বাবড়ি চুল, আর কুচকুচে তেলতেলে মসৃণ কালো দাড়ি।

ওদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে একটি কম্বলের উপরঃ তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে দুটি তরুণী—ওদের লাল নীল রঙের প্রশস্ত সালোয়ার, রূপার কাজ করা জামা আর পিঠের উপর ঝুলে-পড়া গাঢ় কালো কেশদামের মধ্যে ওদের মনে হচ্ছে যেনো বহু রঙের ছোট্ট দুটি পাখি। ওদের মধ্যে যেটি বয়সে ছোট সে তার নাকের একটি ছেদায় পরেছে একটি সোনার রিঙ।

বিকালে পীড়িত লোকটি মারা গেলো। প্রাচ্যের দেশগুলিতে মেয়েরা প্রায়ই যেরূপ মাতম করে, এ মেয়েগুলি তেমন কিছু করলো নাঃ কারণ এ লোকটি হজ্বের পথে মারা গেছে, পাক যমীনে, আর এজন্য সে ধন্য। লোকগুলি লাশটিকে গোসল করায় এবং মৃত লোকটি তার পোশাক হিসাবে যে কাপড় পরেছিলো তা-ই দিয়ে ওরা তার কাফন দেয়।

তারপর ওদের মধ্যে একজন দাঁড়ায় তাঁবুর সম্মুখে, হাত দুটি পেয়ালার মতো করে মুখের কাছে আনে এবং উচ্চৈঃস্বরে আযান দেয়ঃ 'আল্লাহু আকবর, আল্লাহ্ আকবর'—আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ মহান, লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্—আল্লাহ্ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রসূল!.......মৃতের জন্য দোয়া! তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করুন।' সকল দিক থেকে 'ইহ্‌রাম' বাঁধা লোকেরা ছুটতে ছুটতে এসে জমায়েত হয় এবং 'ইমামে'র পিছে সারির পর সারি বেঁধে দাঁড়ায়, একটি বৃহৎ ফৌজের সিপাইদের মতো। জানাযায় সালাত শেষ হওয়ার পর ওরা একটি কবর খোঁড়ে, একটি বৃদ্ধ লোক কুরআন থেকে কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করে আর তারপর, ওরা ধুলি নিক্ষেপ করে মৃত হজ্বযাত্রীর উপর, যে কাঁৎ হয়ে শুয়ে আছে, তার মুখ মক্কার দিকে ক'রে...।

দ্বিতীয় দিনের সকালে সূর্যোদয়ের আগে ধূলি-প্রান্তর সংকীর্ণ হয়ে আসে, পাহাড়গুলি পরস্পরের আরো কাছ ঘেঁষে এসে মিলিত হয়; আমরা একটি গিরিখাদ পার হয়ে যাই এবং ভোরের ফিকে আলোতে মক্কার প্রথম ইমারতগুলি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে—তারপর সূর্য যখন আসমানে উঠছে, আমরা প্রবেশ করি পবিত্র নগরীর রাস্তায়।

এখনকার ঘর-বাড়িগুলি জিদ্দার ঘরবাড়ির মতোই; একই ধরনের কাজ-করা পোচ্-বিশিষ্ট জানালা আর ঢাকা বেলকনি; কিন্তু এগুলি তৈরি করতে যে পাথর ব্যবহার করা হয়েছে তা জিদ্দার হালকা রঙের প্রবাল পাথরের চেয়ে বেশি ভারি, বেশি পুরু মনে হলো। এখনো খুব সকাল; কিন্তু এরি মধ্যে গাঢ় সর্বব্যাপী উত্তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠতে শুরু করেছে। অনেকগুলি বাড়ির সামনেই পাতা রয়েছে বেঞ্চি যার উপর শ্রান্ত, ক্লান্ত লোকেরা ঘুমিয়ে আছে। যে-সব কাঁচা রাস্তা দিয়ে আমারেদ হেলে-দুলে-চলা কাফেলা নগরীর কেন্দ্রের দিকে আগিয়ে চলেছে সেগুলি সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতরো হয়ে আসছে। 'হজ্ব' উৎসবের আর মাত্র ক'দিন বাকী। এজন্য রাস্তায় ভিড় অতি প্রচণ্ড। অগণিত হজ্ব যাত্রীর গায়ে সাদা 'ইহ্‌রাম' এবং অন্যরা অনেকে সাময়িকভাবে ইহ্‌রাম বদল করে পরেছে তাদের নিত্যদিনের কাপড়—মুসলিম জাহানের সকল দেশের পোশাক; ভিস্তিরা নুয়ে পড়েছে ভারি মশকের ভারে অথবা বাঁকের নীচে, যা থেকে বালতির মতো দু'দিক থেকে ঝুলছে পানিভর্তি পেট্রোলের টিন, গাধা-চালক এবং সওয়ারী গর্দভেরা চলছে ওদের গলার ঘন্টি বাজাতে বাজাতে, পিঠ ওদের উজ্জ্বল রঙিন কাপড়ে ঢাকা; আর এই যে মহামিলন—যেনো একে পূর্ণতা দানের জন্য বিপরীত দিক থেকে আসছে উটেরা, পিঠে শূন্য হাওদা চাপানো, আসছে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে ডাক ছাড়তে ছাড়তে। সংকীর্ণ রাস্তাগুলিতে এমন হৈ হুল্লা শোরগোল চলছে যে, আপনার মনে হতে পারে 'হজ্ব' এমন কোনো জিনিস নয় যা বহু-বহু শতাব্দী ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রত্যেক বছর, বরং এ যেনো হঠাৎ একটি চমক, একটি বিস্ময়, যার জন্য প্রস্তুত ছিলো না মানুষ! শেষপর্যন্ত আমাদের কাফেলা আর কাফেলা রইলো না, হয়ে দাঁড়ালো এক বিশৃংখল জটলা—উট, হাওদা, গাট্টি-বোচকা, হজ্বযাত্রী, উট-চালক আর হট্টগোলের!

আমি জিদ্দা থেকে হাসান আবিদ নামক এক মশহুর 'মুতাব্বিফ' বা মালুমের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম। এখন এক বিশৃংখলার মধ্যে তাকে কিংবা তার ঘর খুঁজে বের করার সম্ভাবনা খুবই কম মনে হলো। কিন্তু হঠাৎ কোনো এক ব্যক্তি চীৎকার করে উঠলো, 'হাসান আবিদ,—হাসান আবিদের হজ্বযাত্রিগণ! আপনারা কোথায়?' এবং বোতলের ভেতর

থেকে বের হয়ে আসা জিনের মতো এক তরুণ আচমকা দেখা দেয় আমাদের সামনে আর খুব নীচু করে মাথা ঝুঁকিয়ে তার পিছু পিছু চলার জন্য আমাদের অনুরোধ করে। হাসান আবিদই তাকে পাঠিয়েছে পথ দেখিয়ে ওর বাড়িতে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য।

যে তরুণটি আগে আমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসেছিলো, 'মুতাব্বিফে'র বাড়িতে' পর্যাপ্ত নাশতার পর আমি তারই সংগে পবিত্র মসজিদে যাই। মানুষ ভর্তি লোকজনে গিজগিজ-করা রাস্তার ভেতর দিয়ে আমরা পায়ে হেঁটে চলি কসাইদের দোকান ছাড়িয়ে—সারি সারি, চামড়া-ছাড়ানো ভেড়া ঝুলানো রয়েছে দোকানগুলির সামনে; আমরা পেছনে ফেলে যাই তরকারী বিক্রেতাদের যারা ওদের পণ্যসমূহ মাটির উপর বিছানো খড়ের মাদুরে ছড়িয়ে রেখেছে। আমরা আগিয়ে যাই ঝাঁক ঝাঁক মাছি, তরকারী, শাক-সব্জির গন্ধ, ধূলিবালির ভেতর দিয়ে ঘামতে ঘামতে। তারপর আমরা অতিক্রম করি একটি সংকীর্ণ উপরদিকে ঢাকা বাজার, যেখানে কেবল বস্ত্র ব্যবসায়ীদেরই দোকান রয়েছে, রঙের এক মহোৎসব। পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য স্থানের বাজারের মতোই এখানকার দোকানগুলি হচ্ছে কেবল কতকগুলি তাক, মাটি থেকে এক গজ উঁচু, যেখানে দোকানী বসেছে পায়ের উপর পা রেখে, সকল উপকরণ ও রঙের কাপড়ের থান স্তূপীকৃত তার চারপাশে, আর মাথার উপর ঝুলছে সারি সারি সকল রকম পোশাকের কাপড়, মুসলিম জাহানের সকল জাতির জন্য!

এবং এছাড়াও রয়েছে সকল জাতের সকল পোশাকের সকল সুরতের মানুষ, কারো মাথায় পাগড়ী, কারো মাথা খালি, কেউ কেউ নীরবে হাঁটছে মাথা নীচু করে, হয়তো বা হাতে একটি তসবিদানা নিয়ে। আর অন্যেরা ত্বরিৎ পদে দৌড়াচ্ছে ভিড়ের মধ্য দিয়ে; সোমালীদের নমনীয় বাদামী দেহ ওদের ঢিলেঢালা রোমক পোশাকের ভাঁজের ফাঁকে ফাঁকে চিকমিক করছে তামার মতো; আর আরবের মধ্যভাগের উঁচু অঞ্চলের লোকেরা, হালকা পাতলা শরীর, চিকন-চাকন মুখ, চাল-চলনে গর্বিত; বোখারার ভারি অংগ-প্রত্যংগ ও দৃঢ় মজবুত গড়নের উজবুকেরা, যারা মক্কায় এই গরমেও পরে আছে তুলাভরা 'কাপ্তান' আর হাঁটু-উঁচা চামড়ার বুট; 'সারং-পরা জাভার মেয়েরা যাদের মুখ অনাবৃত এবং চোখের আকৃতি বাদামের মতো; মরক্কোর লোকেরা চলাফেরা করছে, ধীর পদক্ষেপে, সাদা, 'বার্নাসে' মর্যাদামণ্ডিত ওরা; মক্কার লোকদের পরণে সাদা সূতী পোশাক আর তালু ঢাকা হাস্যকর রকমের ছোট্ট গোল টুপী মাথায়; মিসরীয় 'ফেলাহীন'দের মুখে উত্তেজনা; কালো চোখওয়ালা সাদা পোশাক পরা ভারতীয়রা উঁকি মারছে তাদের বিপুল তুষারশুভ্র পাগড়ির নীচ থেকে, আর ভারতীয় রমণীরা, ওদের সাদা 'বোরখা'য় এমনি অভেদ্যভাবে আচ্ছাদিত যে, ওদের দেখাচ্ছে চলন্ত তাঁবুর মতো; তিমবুক্তু অথবা দাহমীর বিরাটকায় নিগ্রোরা রয়েছে এখানে, গায়ে ওদের নীল ঢিলে ঢালা পোশাক আর মাথায় তালু ঢাকা লাল টুপি; আর ক্ষুদ্র পরিপাটি দেহের অধিকারী চীনা মহিলারা, বিচিত্র রঙিন প্রজাপতির মতো, লঘু পদে হাঁটছে মাপা পদক্ষেপে, যা দেখাচ্ছে হরিণীর পায়ের খুরের মতো। সকল দিকেই এক চীৎকার ও ভিড়ের শোরগোলজাত উত্তেজনা, যার ফলে আমার মনে হলো, আমি রয়েছি আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের একেবারে মাঝখানে, যে ঢেউয়ের কেবল কিছু খুঁটিনাটিই আমি ধারণা করতে পারি, তার সংহত একটা চিত্র কখনো নয়। সবকিছু ভেসে চলেছে অগণিত ভাষায় গুঞ্জনের এবং উষ্ণ অংগভংগি ও উত্তেজনার

মধ্যে। আর এভাবেই এক সময় নিজেদের আমরা দেখতে পেলাম—পবিত্র মসজিদ, 'হারামে'র একটি প্রবেশ-পথের সমুখে।

এটি তিনটি খিলানের এক প্রবেশপথ, পাথর-বিছানো সিঁড়ি উঠে গেছে ধাপে ধাপে, প্রবেশ পথের মুখ পর্যন্ত; মুখে বসে আছে এক অর্ধ-উলংগ ভারতীয় ভিক্ষুক, তার জিরজিরে কংকালসার হাত দুটি আমাদের দিকে বাড়িয়ে। আর তখুনি আমি প্রথম দেখতে পেলাম—পবিত্র গৃহের ভেতরের বর্গক্ষেত্রের মতো দেখতে স্থানটি, যা রয়েছে রাস্তার সমতল থেকে অনেক নীচে, প্রবেশপথের মুখ থেকে অনেক বেশি নিচুতে, আর এজন্য আমার চোখের সামনে তা উদ্ভাসিত হলো একটি গামলার মতোঃ এক বৃহৎ চতুর্ভুজ, যা বহু স্তম্ভের উপর স্থাপিত অর্ধবৃত্তাকার অনেকগুলি খিলান দ্বারা বেষ্টিত এবং তার মধ্যখানে রয়েছে বর্গাকৃতি সমান ছ'টি পার্শ্ববিশিষ্ট চল্লিশ ফুট উঁচু এক ইমারত, কালো চাদরে ঢাকা আর চাদরটিকে বেষ্টন করে রয়েছে একটি চওড়া ডোরা যার উপর কুরআনের আয়াতগুলি লেখা হয়েছে জরির হরফে; যা গিলাফের উপরের অংশকে পেঁচিয়ে বেষ্টন করেছে গিলাফটিকেঃ কা'বাঘর...।

তাহলে এ-ই হচ্ছে কা'বা, বহু বহু শতক ধরে কতো লাখো কোটি মানুষের আকংখার লক্ষ্যস্থল! এই লক্ষ্যে পৌছুনোর জন্য যুগ যুগ ধরে অগণিত হজ্বযাত্রী কী বিপুল ত্যাগই না স্বীকার করেছে! অনেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে পথেই, অনেকেই এ লক্ষ্যে পৌছেছে বিপুল কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকারের পর; তবু ওদের সকলের কাছেই এই ছোট্ট বর্গাকৃতি ইমারতটি ছিলো ওদের আকাংখার শীর্ষবিন্দু আর এখানে পৌছুতে পারার অর্থই ছিলো সার্থকতা, পূর্ণতা। এখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রায় নিখুঁত কিউব (যা এর আরবী নামের ধাতুগত অর্থ—অর্থাৎ কা'বা) একটি কালো চাদরে সম্পূর্ণ ঢাকা, মসজিদের বিশাল চতুর্ভুজের ঠিক মাঝখানে একটি প্রশান্ত দ্বীপ যেনোঃ পৃথিবীর আর যে-কোনো স্থানের যে-কোনো স্থাপত্য-কর্মের চাইতেই অনেক বেশি শান্ত, স্নিগ্ধ। মনে অনেকটা এ কথাই উদয় হতে চায় যে, কা'বাঘর যিনি প্রথম নির্মাণ করেছিলেন—কারণ ইবরাহীমের মূল ইমারতটি কয়েকবারই পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে একই আকারে—তিনি চেয়েছিলেন আল্লাহ্‌র সামনে মানুষের বিনয় ও ক্ষুদ্রতার একটি রূপক-কাহিনী তৈরি করতে। কা'বাগৃহের নির্মাতা জানতেন স্থাপত্য-কর্মের ছন্দের কোনো সৌন্দর্যই, রেখার কোনো পূর্ণতাই—তা যতো মহৎ এবং বলিষ্ঠই হোক, আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণার প্রতি সুবিচার কখনো করতে পারে না, আর এজন্য তিনি নিজেকে সীমিত রেখেছিলেন কল্পনায় আনা যেতে পারে এমন একটি সরলতম তিন আয়তনের নক্‌শার মধ্যে—বর্গাকৃতি সমান ছয় পার্শ্বের পাথরে তৈরি একটি ইমারত।

আমি পৃথিবীর বহু মুসলিম মসজিদ দেখেছি যে-সব মসজিদের ভেতরে মহান শিল্পীদের হাত সৃষ্টি করেছে অনুপ্রাণিত শিল্প-নিদর্শন। আমি মসজিদ দেখেছি উত্তর আফ্রিকাতে, ঝলমলে ইবাদতগাহ্, মর্মর পাথর আর সাদা অ্যালাবাস্টারে তৈরি, আমি দেখেছি জেরুযালেমে মসজিদুল আক্‌সা, যা প্রচণ্ডভাবে নিখুঁত এক গম্বুজ, এক নাজুক কাঠামোর উপর স্থাপিত, কোনো রকম দ্বন্দ্ব না বাধিয়ে হালকা এবং ভারির একত্র মিলানোর স্বপ্নঃ আর ইস্তাম্বুলের আজিমুশ্‌মান প্রাসাদগুলি—যেমন সুলায়মানিয়া, ইয়েনী-ওয়ালিদে, বায়াজিদ মসজিদ আর এশিয়া মাইনরে ব্রুসার মসজিদ এবং ইরানের সাফাবিদ আমলের মসজিদসমূহ—পাথর, বহু রঙের ম্যাজোলিকা টালী, মোজাইক, রূপার এম্বোজ করা

দরোজার উপর বৃহৎ স্টেলাসিটে খিলান, শ্বেত পাথর এবং ফিরোজা নীল গ্যালারীসহ চিকন মীনার, মর্মর ঢাকা চতুর্ভুজ, যার মধ্যে রয়েছে ফোয়ারা, বয়োবৃদ্ধ কদলী বৃক্ষ—এ সকলের এক রাজকীয় সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাবেশ; আর সমরখন্দে তাইমুর লঙের মসজিদগুলির মহৎ ধ্বংসাবশেষ—ওসবের অবক্ষয়ের মধ্যেও চমৎকার!

এ সমস্তই দেখেছি আমি—কিন্তু এই মুহূর্তে আমি কা'বার সমুখে যতো প্রচণ্ডভাবে অনুভব করছি—নির্মাতার হাত এসে পৌঁছেছে নিবিড়ভাবে, একেবারে তাঁর ধর্মীয় চেতনার এতো কাছে—তেমনটি জীবনে আর কখনো অনুভব করিনি। একটি কিউবের চরম সরলতায় রেখা-কর্মের সকল সৌন্দর্য সম্পূর্ণভাবে বিসর্জনের মধ্যে উচ্চারিত হয়েছে এই ভাব ঃ 'মানুষ নিজ হাতে যে সৌন্দর্যই সৃষ্টি করতে সক্ষম হোক না কেন, তাকে আল্লাহ্‌র জন্য উপযুক্ত মনে করা হবে একেবারেই অর্থহীন আত্মশ্লাঘা; এক কারণে, আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশ করার জন্য সরলতম যে ধারণা মানুষের পক্ষে সম্ভব তাই মহত্তম।' মিসরের পিরামিডগুলির গাণিতিক সরলতার মূলেও ক্রিয়া করে থাকবে একই ধরনের অনুভূতি, যদিও সেখানে কিছুটা মানুষের আত্মশ্লাঘাও তার এক অভিব্যক্তি খুঁজে পেয়েছিলো, তার ইমারতগুলিকে যে বিপুল আকারে সে নির্মাণ করেছিলো, তার মধ্যে। কিন্তু এখানে কা'বায় এর আকার পর্যন্ত ঘোষণা করছে মানুষের আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের। এই ছোট্ট ইমারতটির দৃপ্ত বিনয়ের কোনো তুলনা সেই পৃথিবীতে।

কা'বায় প্রবেশের পথ মাত্র একটিই রয়েছে, রৌপ্যমণ্ডিত একটি দরোজা উত্তর-পুবদিকে, জমি থেকে প্রায় সাত ফুট উঁচুতে। যার ফলে, এখানে পৌঁছুনো যায় কেবল অমন একটি কাঠের সিঁড়ির সাহায্যে যা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়, যা ঐ দরোজার সামনে স্থাপন করা হয় বছরের অল্প ক'টি দিনের জন্য ভেতরটি, যা সাধারণত বন্ধই থাকে (আমি পরবর্তীকালে কয়েকবার তা দেখেছি) খুবই সাদাসিধা: মেঝেটি মর্মর পাথরে তৈরি, অল্প কটি গালিচা বিছানো থাকে মেঝেয় এবং ব্রোঞ্জ আর রূপার বাতি ঝুলে একটি ছাদ থেকে, যাকে ধরে রেখেছে ভারি কাঠের কতকগুলি কড়িকাঠ। বস্তুত কা'বার ভেতর ভাগের খাস কোনো নিজস্ব মর্তবা নেই, কারণ কা'বার পবিত্রতা গোটা ইমারতটির সংগে জড়িত—যা হচ্ছে 'কিবলা' অর্থাৎ সালাতের দিক, সমগ্র মুসলিম জাহানের জন্য। আল্লাহ্‌র একত্বের এই প্রতীকের দিকেই মুখ ফেরায় দুনিয়ার কোটি কোটি মুসলমান, দিনে পাঁচবার ক'রে।

ইমারতটির পুব কোণে প্রোথিক এবং অনাবৃত অবস্থায় রাখা হয়েছে একটি ঘোর কালো পাথর, যাকে ঘিরে রয়েছে একটি চওড়া রূপার ফ্রেম। এই কালো পাথরটি, যা পুরুষের পর পুরুষ ধরে হজ্ব-যাত্রীদের চুমোয় চুমোয়, গর্ত হয়ে গেছে, অমুসলিমদের কাছে অনেক ভুল বোঝাবুঝির কারণ হয়ে আছে। ওদের বিশ্বাস, এ হচ্ছে একটি ভৌতিক প্রতীক যা মুহাম্মদ স্বীকার করে নিয়েছেন মক্কার কাফিরদের প্রতি একটি কনসেশন হিসাবে। আসল সত্য থেকে এর চেয়ে দূরের আর কিছুই হতে পারে না। ঠিক যেমন কা'বা একটি তাজিমের বিষয়, পূজার বিষয় নয়, তেমনি হচ্ছে এ কালো পাথরটিও। এটিকে সম্মান করা হয় হযরত ইবরাহীম যে প্রথম ইমারতটি তৈরি করেছিলেন তারই একমাত্র অবশিষ্ট পাথর হিসাবে, আর যেহেতু বিদায় হজ্বের সময় রসূলুল্লাহ্‌র ওষ্ঠদ্বয় এ পাথরকে স্পর্শ করেছিলো কেবল সে কারণেই তখন থেকে একইভাবে সকল হজ্বযাত্রী

একে চুমু খেয়ে এসেছেন। মহানবী ভালো করেই জানতেন যে, পরবর্তীকালের মুমিনেরা সবসময় অনুসরণ করবে তাঁর দৃষ্টান্ত। যখন তিনি এ পাথরটিকে চুমু খাচ্ছিলেন, তিনি জানতেন, অনাগতকালের সকল হজ্বযাত্রীর ঠোঁট এখানে এসে চিরকালই সাক্ষাত পাবে তাঁর পবিত্র ওষ্ঠাধরের স্মৃতির! তাঁর পবিত্র ওষ্ঠাধরের স্মৃতির—একটা প্রতীকী আলিংগনের আকারে যা তিনি রেখে গেছেন তাঁর সমস্ত উম্মতের জন্য কালোত্তীর্ণ এবং মৃত্যুঞ্জয়ী আলিংগন—যখনি তারা কৃষ্ণ পাথরটির উপর স্পর্শ করবে তাঁর পবিত্র ঠোঁট দুটি। আর হজ্বযাত্রীরা—যখন ওরা কালো পাথারটিকে চুমু খায়, তখন অনুভব করে ওরা রসূলুল্লাহ্‌কে আলিংগন করছে এবং আলিংগন করছে অন্য সকল মুসলমানকে যারা এখানে এসেছে তাদের আগে এবং যারা আসবে তাদের পরে!

কোনো মুসলিমই এ কথা অস্বীকার করবে না যে, রসূলুল্লাহ্‌র বহু বহু আগেও অস্তিত্ব ছিলো কা'বার। আসলে এর গুরুত্ব খাস করে এই বাস্তব সত্যের মধ্যেই নিহিত। রসূলুল্লাহ্ দাবী করেননি যে, তিনি একটি নতুন ধর্মের স্থপয়িতা। পক্ষান্তরে কুরআনের দাবী অনুসারে আল্লাহ্‌র কাছে 'আত্মসমর্পণ' অর্থাৎ 'ইসলাম', মানব চেতনার উন্মোষের শুরু থেকেই 'মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা' হিসাবে রয়েছে। হযরত ইবরাহীম, মূসা, ঈসা এবং আল্লাহ্‌র আর সকল নবী এ-ই শিখিয়েছেন; এর মধ্যে কুরআন হচ্ছে ঐশী প্রত্যাদেশের সর্বশেষ। মুসলমানেরা এ কথাও অস্বীকার করেন না যে, এই পবিত্র গৃহটি ভরা ছিলো মূর্তি এবং ভৌতিক প্রতীকে, মুহাম্মদ সেগুলি ভেঙে ফেলার আগে, ঠিক যেমন মূসা সিনাইতে সোনার বাছুর ভেঙে চুরমার করেছিলেন ঃ কারণ কা'বাঘরে এ মূর্তিগুলি স্থাপন করার অনেক অনেক আগেও প্রকৃত আল্লাহ্‌র ইবাদত হতো এখানে, আর তাই মুহাম্মদ যা করলেন, তা ইবরাহীমের মসজিদকে তাঁর মূল উদ্দেশ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠার বেশি কিছু ছিলো না।

... .

এবং এইখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি হযরত ইব্‌রাহীমের ইবাদত গৃহের সামনে আর কোনো চিন্তা ছাড়াই তাকাই (কারণ চিন্তা এবং ধ্যান এসেছিলো অনেক পরে) সেই বিস্ময়কর ইমারতের দিকে এবং আমার ভেতরের কোনো লুক্কায়িত প্রসন্ন বীজ থেকে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় এক গর্বিত উল্লাস, একটা গানের মতো।

মসৃণ মর্মরখণ্ড, যার উপর নৃত্য করছে সূর্যরশ্মির প্রতিবিম্ব, তাই দিয়ে, কা'বার চারদিকে একটি প্রশস্ত বৃত্তের আকারে ঢেকে দেওয়া হয়েছে মাটি এবং এই মর্মরখণ্ডগুলির উপরে বহু মানুষ, নারী এবং পুরুষ পদচারণা করছে, কালো চাদরে ঢাকা আল্লাহ্‌র ঘর, ঘুরে ঘুরে। ওদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁদছে, কেউ কেউ আল্লাহ্‌কে চীৎকার করে ডাকছে মুনাজাতে, আর বহু জনেরই মুখে কথা নেই, চোখে পানি নেই, কেবল ওরা হেঁটে চলেছে মাথা নুচু ক'রে...।

কা'বাঘরের চারদিকে সাতবার পায়ে হেঁটে তওয়াফ করা 'হজ্বে'র অংশঃ ইসলামের এই কেন্দ্রীয় পবিত্র স্থানটির প্রতি কেবল সম্মান দেখানোর জন্যই নয়, বরং ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার বুনিয়াদী দাবিটি কী, প্রত্যেককে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই এর লক্ষ্য। কা'বা হচ্ছে আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতীক, আর কা'বাকে ঘিরে শরীরী প্রদক্ষিণ মানবিক ক্রিয়াকলাপের প্রতীকস্বরূপ এক অভিব্যক্তি, যার অর্থ এই যে, যা 'অন্তর্জীবন' পদটিতে নিহিত আমাদের চিন্তা

এবং অনুভূতিই কেবল নয়, বরং আল্লাহ্‌কে আমাদের সক্রিয় বহির্জীবন, আমাদের ক্রিয়াকলাপ এবং বাস্তব উদ্যোগ–প্রয়াসেরও কেন্দ্র করতে হবে অবশ্যই।

আর আমিও ধীরে ধীরে আগিয়ে যাই সামনের দিকে এবং কা'বার চারদিকে বৃত্তাকার প্রবাহের অংশ হয়ে পড়ি, মাঝে মাঝে আমি আমার নিকটে একটি পুরুষ বা স্ত্রীলোক সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি; আমার চোখের সামনে আল্‌গা আল্‌গা দ্রুত চলমান বহু চিত্র ভেসে ওঠে এবং মিলিয়ে যায়। সাদা 'ইহ্‌রাম' পরা এক বিশালদেহী নিগ্রোকে দেখতে পেলাম, তার মজবুত কালো কব্জিতে চেনের মতো জড়িয়ে রাখা হয়েছে একটি কাঠের তস্‌বীহ্‌। এক যয়ীফ মাল্‌য়ী পা টিপে টিপে কিছুক্ষণ হাঁটলো আমার পাশাপাশি, তার বাহু দুটি যেন অসহায়, দিশাহারা অবস্থায় ঝুলে আছে তার বাটিক সারং ঘেঁষে। ঘন উদ্ধত ভুরুর নীচে ধূসর চোখ। কার চোখ এগুলি? এবং এই মুহূর্তে তা হারিয়ে গেলো ভিড়ের মধ্যে। এই কালো পাথরের সামনে বহু মানুষের মধ্যে রয়েছে এক ভারতীয় তরুণীঃ বোঝাই যাচ্ছে, সে অসুস্থ; ওর সংকীর্ণ নাজুক মুখের উপর ফুটে আছে বিস্ময়কর রকমে প্রকাশ্য এক আরজু, যা দর্শকের কাছে দৃষ্টি–গ্রহ্য, স্বচ্ছ পরিষ্কার পুকুরের তলদেশে মাছ এবং শৈবালের পরানের মতো। সে তার ফ্যাকাশে হাত দুটির তালু উল্টিয়ে উঁচিয়ে রেখেছে কা'বার দিকে আর তার আঙুলগুলি কাঁপছে যেন এক নির্বাক প্রার্থনার সংগে তাল রেখে...।

আমি হেঁটে চলেছি; মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে এবং আমার হৃদয়ে ক্ষুদ্র এবং তিক্ত যা কিছু ছিলো সবই আমার হৃদয়কে ত্যাগ করতে শুরু করে। আমি হয়ে উঠি বৃত্তাকার স্রোতের অংশ—ওহো, আমরা যা করে চলেছি, এ–ই কি তা হলে তার অর্থ ঃ সচেতন হওয়া, উপলব্ধি করা যে, আমরা প্রত্যেকেই হচ্ছি একটা কক্ষপথে একটা গতির, এটা আন্দোলনের অংশ। এ–ই কি সম্ভবত সকল বেদিশা সকল বিভ্রান্তির শেষ? এবং মুহূর্তগুলি মিলিয়ে গেলো, সময় দাঁড়ালো চুপ করে স্থির হয়ে— আর এই হচ্ছে কেন্দ্র, বিশ্বজগতের!

নয় দিন পর এলসা মারা গেলো।

ও মারা যায় হঠাৎ এক হপ্তার কম অসুখে ভুগে। প্রথম মনে হয়েছিলো গরম এবং অনভ্যস্ত খাবারের কারণে সামান্য অসুস্থতার বেশি কিছু নয়। পরে দেখা গেলো, এ হচ্ছে গ্রীষ্মমণ্ডলের এক অজ্ঞাত ব্যাধি যার মুকাবিলায় একেবারেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে মক্কার হাসপাতালের সিরীয় ডাক্তারেরা। আমাকে ঘিরে নামলো অন্ধ তমসা আর চরম নৈরাশ্য।

ওকে কবর দেওয়া হলো মক্কার ধূলিময় গোরস্তানে। ওর কবরের উপর স্থাপন করা হলো একটি পাথর। এই শিলাখণ্ডে কোনো লিপি খোদাই করতে আমার মন মানলো না; কারণ আমার মনে হলো, শিলালিপির চিন্তা করা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করারই শামিল আর এই মুহূর্তে আমি আমার কোনো ভবিষ্যৎ আর ধারণাও করতে পারছি না।

এলসার কচি ছেলে আহ্‌মদ এক বছরেরও বেশি রয়ে গেলো আমার সাথে, আরবের অভ্যন্তরে। সে ছিলো আমার সংগী—এক সাহসী, দশ বছর বয়সের সহচর। কিন্তু কিছুদিন পর তাকেও আমার বিদায় জানাতে হলো। কারণ তার মা–এর পরিবার শেষ পর্যন্ত আমাকে রাজী করাতে সক্ষম হলো—আহমদকে অবশ্যি ইস্কুলে পাঠাতে হবে ইউরোপে। এরপর এলসার আর কিছুই রইলো না তার স্মৃতি এবং মক্কার গোরস্তানে একটি শিলা ও এক ঘোর অন্ধকার ছায়া, যা অপসৃত হয়েছিলো অনেক পরে, আরবের চিরন্তন আলিংগনে আমার নিজেকে সঁপে দেবার পর।

ছয়

রাত অনেক গড়িয়ে গেছে, কিন্তু আমরা এখনো বসে আছি নিষ্প্রভ ক্যাম্পফায়ারের চারপাশে। আবু সাঈদ, ততোক্ষণে তার কামনার প্রচণ্ড ঝড় কাটিয়ে উঠেছে; তার চোখ দুটি এখন করুণ, কিছুটা ক্লান্ত। নূরা সম্পর্কে সে আমদের সাথে এভাবে কথা বলতে লাগলো, মানুষ যেভাবে কথা বলে থাকে তার কোনো প্রিয়জন সম্বন্ধে, যে মারা গেছে অনেক আগে।

—'আপনি তো জানেন ও সুন্দরী ছিলো না, কিন্তু আমি ওকে ভালোবাসতাম।'

আমাদের মাথার উপর পূর্ণ চাঁদ—একটা জীবন্ত প্রাণীর মতো তার পূর্ণতা। বিস্ময়কর বিষয় নয় যে, ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবেরা চাঁদকে মনে করতো 'আল্লাহ্‌র এক কন্যা' বলে?—দীর্ঘকেশী দেবী 'আল-লাত', যে তার রহস্যময় প্রজননের ক্ষমতা সঞ্চারিত করতো ধরণীতে—এবং এভাবে মানুষ ও জীবের মধ্যে সে প্রাণের জন্ম দিতো। তার সম্মানে প্রাচীন মক্কার এবং তায়েফের যুবক-যুবতীরা পূর্ণিমার রাতগুলি উদ্‌যাপন করতো খোলা আসমানের নীচে, উচ্ছৃখংল মাতলামিতে, প্রেম-লীলা আর কাব্য প্রতিযোগিতায়। মাটির কলস আর চামড়ার বোতল থেকে প্রবাহিত হতো রক্তলাল সূরা, আর যেহেতু তা ছিলো অতিশয় লাল, অতিশয় উত্তেজক সেজন্য কবিরা মদনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত উন্মার্গ কবিতায় এর উপমা দিতো রমণীর খুনের সঙ্গে। এই গর্বিত আবেগান্ধ তরুণেরা তাদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ঢেলে দিতোআল্-লাতের কোলে, 'যার লাবণ্য চাঁদের কিরণের মতো, যখন চাঁদ পূর্ণ হয় ষোলকলায়, আর যার মহত্ত হচ্ছে এক ঝাঁক কালো সারস পাখির আকাশে ডানা মেলে ওড়ার মতো'—প্রাচীন-কালের তারুণ্যময়ী শক্তিমতী এই দেবী, যে তার ডানা বিস্তার করেছিলো দক্ষিণ আরব থেকে উত্তরদিকে এবং সুদূর হেল্লাস পর্যন্ত পৌছেছিল এপোলোর মাতা লেটোর আকৃতিতে।

আল্-লাতের এই পরিব্যাপ্ত ধোঁয়াটে প্রকৃতিপূজা এবং তার সাথে আরো এক দংগল দেবদেবীর পূজা থেকে, আল-কুলআনের এক আল্লাহ্‌র সমুচ্চ ধারণায় পৌছুনো ছিলো আরবদের জন্য এক দীর্ঘ দরাজ পথের সফর। সে যা-ই হোক, মানুষ সবসময় তার আত্মার পথে দূর যাত্রা করতে ভালোবেসেছে—এখানে এই আরবেও, বিশ্বের অন্যান্য দেশের চাইতে তা মোটেও কম নয়ঃ দীর্ঘ সফরকে সে অতো গভীরভাগে ভালোবেসেছে যে, তার গোটা ইতিহাসকেই বর্ণনা করা যেতে পারে তার ধর্ম অনুসন্ধানের ইতিহাস ব'লে।

আরবদের কাছে এ অনুসন্ধান সবসময়ই পরমের অনুসন্ধান। এমনকি, ওদের একেবারে আদিকালেও যখন ওদের চারপাশের পৃথিবীকে অগণিত দেবতা ও দেও-দানব দিয়ে একেবারে পূর্ণ করে ফেলেছিলো, তখনো ওরা সবসময় সচেতন চিলো সেই পরম এক সম্পর্কে, যিনি তাঁর পরম সত্য ও মাহাত্ম্যে অবস্থান করেন সকল দেবদেবীর উপরে, এক অদৃশ্য, অবোধগর্ম, সর্বময় শক্তি, মানুষের কল্পনা-সাধ্য সবকিছুর বহু উর্ধ্বে, সকল কার্যের উপর শাশ্বত হেতু। ওদের কাছে দেবী 'আল্-লাত' এবং তার ঐশী ভগ্নিদ্বয়, 'মানাত' ও 'উজ্জা' 'আল্লাহ্‌র কন্যা'র বেশি কিছু ছিলো না, যারা অজ্ঞেয় এক এবং দৃশ্যমান জগতের মধ্যে স্থাপন করে যোগসূত্র। মানুষের শৈশবকে যে-সব ধারণাতীত শক্তি ঘিরে ছিলো তারি প্রতীকঃ কিন্তু আরবীয় চিন্তার পশ্চাদ্‌ভূমির গভীরে সবসময়ই বিদ্যমান ছিলো 'এক'-এর জ্ঞান, প্রতি মুহূর্তে সচেতন সজ্ঞান বিশ্বাসে জ্বলে উঠতে উন্মুখ। এর অন্যথা কি করেই বা

হাত পারতো? ওরা এমন এক জাতি যা এক কঠোর আকাশ ও কঠিন যমীনের মাঝখানে নীরবতা ও নির্জনতায় বিকাশ লাভ করেছে। এই কঠোর সাদাসিধা অন্তহীন স্থানের মধ্যে ওদের জীবন ছিলো সত্যি কষ্টকর। তাই, ওদের পক্ষে এমন একটি শক্তির আকাংখা থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব ছিলো না, যা সকল সত্তা ও সৃষ্টিকে বেষ্টন করে থাকবে অভ্রান্ত সুবিচার ও করুণায়, কঠোরতা ও প্রজ্ঞায়ঃ আল্লাহ্...মহান আল্লাহ্। তিনি অবস্থান করেন অনন্তকালব্যাপী এবং দীপ্তি ছড়িয়ে আলোকিত করেন অনন্তকে; কিন্তু তুমি যেহেতু তাঁর কর্মের গণ্ডির মধ্যেই রয়েছো সে কারণে তিনি 'তোমার নিকটতরো— তোমার গর্দানের ধমনী থেকেও.....'

... ...

ক্যাম্পাফায়ার নিভে গেছে। যায়েদ এবং আবু সাইয়িদ ঘুমাচ্ছে আর কাছেই আমাদের তিনটি উষ্ট্রী শুয়ে আছে চাঁদের আলোয় শুভ্র বালুর উপর, আর জাবর কাটছে মৃদু কড়মড় শব্দ ক'রে, মাঝে মাঝে থেমে থেমে। চমৎকার প্রাণী...কখনো কখনো ওদের একটি অবস্থান বদলায় এবং তার শৃংগবৎ কুবের সমতল দিকে যমীনের উর ঘষে, আর মাঝে মাঝে নাকের ভেতর দিয়ে শব্দ করে, যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। চমৎকার প্রাণী। ওদের কোনো নির্দিষ্ট অভিব্যক্তি নেই, ওরা ঘোড়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন; কারণ ঘোড়া সবসময়ই তাদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে চমৎকার, সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত। হ্যাঁ, মানুষ যত জন্তুকে ব্যবহার করে, সে সবের মধ্যে এই প্রাণীগুলি আলাদা—ঠিক যেমন, মরুভূমির যে-স্তেপ অঞ্চলের জীব ওরা সেই অঞ্চল অন্য সকল ভূ-দৃশ্য থেকে স্বতন্ত্র, ভিন্নঃ সুনির্দিষ্ট কোনো অভিব্যক্তিহীন এই জীবগুলি দোল খায় বৈপরীত্যের মধ্যে, বিষণ্ন এবং তা সত্ত্বেও অপরিসীম নম্র, বিনীত।

আমার ঘুম আসছে না, আর এজন্য আমি তাঁবু থেকে হাঁটতে হাঁটতে আগিয়ে যাই এবং নিকটবর্তী একটি টিলায় গিয়ে উঠি। পশ্চিম দিগন্তের উপর একেবারে নীচুতে আকাশে ঝুলে আছে চাঁদ এবং আলোকিত করছে নীচু শিলাগঠিত পাহাড়গুলিকে, যা জেগে উঠছে ভূতের মতো, মৃত প্রান্তরের মধ্য থেকে। এখান থেকে শুরু করে হেজাজের উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলগুলি বে'য়ে চলেছে পশ্চিমদিকে, খুব আস্তে আস্তে ঢালু হতে হতেঃ এক সারি উপত্যকা, যাকে ছেদ করেছে বহু আঁকাবাঁকা শুকিয়ে যাওয়া স্রোতরেখা, যাতে কোনো প্রাণের চিহ্নই নেই, যেখানে গাঁ নেই, ঘরবাড়ি নেই, কোনো গাছপালা নেই— চাঁদের আলোর নগ্নতায় অনঢ় এসব উপত্যকা। এবং তবু, এই বিজন প্রাণহীন ভূমি থেকেই, এই বালুময় উপত্যকা আর নগ্ন পাহাড়গুলির মাঝখান থেকেই ফোয়ারার মতো উৎসারিত হলো মানব ইতিহাসে জীবনকে পরমতম স্বীকৃতি দেয়া ধর্ম...

উষ্ণ এবং নিথর এ রাত। আধো আলো এবং দূরত্বের কারণে পাহাড়গুলি যেনো নড়ছে, আন্দোলিত হচ্ছে। চাঁদের আলোর নিচে এক ম্লান, নীল, নিস্প্রভ দ্যোতি স্পন্দিত হচ্ছে। আর এই অনুজ্জ্বল নীলের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে এক দুগ্ধবৎ শুভ্র জ্যোতির আভাস ভৌতিক স্মৃতির মতো পৃথিবীর সকল রঙের; কিন্তু এ অপার্থিব নীল সব রঙকেই দেয় নিস্প্রভ করে, গলে গিয়ে দিগন্তে রূপান্তরিত না হয়েই আর এ যেন অনধিগম্য, অজ্ঞেয় বস্তুর প্রতি এক প্রবল আহ্বান!

এখান থেকে খুব দূরে নয়; আমার চোখের কাছে লুকানো আরাফাত প্রান্তর রয়েছে এই প্রাণহীন বিজন উপত্যকা ও পাহাড়গুলির মাঝখানে—মক্কায় যে-সকল হজ্জযাত্রী

আসে, সকলেই বছরে যে প্রান্তরে একদিন জামায়েত হয় রোজ হাশরের স্মারক হিসাবে, যেদিন প্রত্যেক মানুষকে তার স্রষ্টার নিকট জবাবদিহি করতে হবে, দাঁড়িয়েছি, খালি মাথায়, হজ্জযাত্রীর সাদা পোশাকে, অগণিত সাদা পোশাক-পরা হজ্জযাত্রীর মধ্যে, যারা এসেছে তিনটি মহাদেশ থেকে। আমাদের সকলের মুখ 'জাবল আর রহ্মা'র দিকে—'রহমতের পাহাড়' যা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মাঝখান থেকে ঃ দাঁড়িয়ে এবং লক্ষো ক'রে কেটে গেছে দুপুর, কেটে গেছে বিকাল, সেই অনিবার্য দিবসের কথা ভাবতে ভাবতে 'যখন তোমাদের প্রকাশ করা হবে দৃষ্টির সম্মুখে আর তোমাদের গোপন কিছুই থাকবে না লুক্কায়িত...।'

এবং আমি যখন পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে দাঁড়াই আর নীচের দিকে তাকাই, আমার সমুখের ভূ-দৃশ্যের জ্যোছনাধোয়া নীল, অদৃশ্য আরাফাত প্রান্তরের দিকে, যা মুহূর্তকাল আগেও ছিলো সম্পূর্ণ নির্জীব হঠাৎ তা জীবন্ত হয়ে ওঠে-এর মধ্য দিয়ে মানব-জীবনের যে স্রোত বয়ে গেছে তাদের সকলের জীবন প্রবাহ সমেত এবং ভরে ওঠে সব কোটি কোটি সেইসব নর-নারীর রহস্যময় কণ্ঠস্বরে যারা সব মক্কা এবং মদীনার মধ্যে পদচারণা করেছে, উটের পিঠে সওয়ার হয়ে চলেছে, তেরো শো বরেরও বেশি হজ্জ উৎসবে, তেরো শো বছরেরও অধিককাল ধরে। ওদের কণ্ঠস্বর আর ওদের পদচলা, তার সাথে ওদের পশুগুলির গলার স্বর আর পদক্ষেপ নতুন করে জিন্দা হয়ে ওঠে এবং ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে; আমি দেখতে পাচ্ছি, ওরা হেঁটে চলেছে, চলেছে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে, আর জমায়েত হচ্ছে তেরো শো বছরের সাদা পোশাক পরা কোটি কোটি হজ্জযাত্রী; আমি শুনতে পাই ওদের চলে যাওয়ার দিনগুলির শব্দ ও ধ্বনি, বিশ্বাস তথা ঈমানের সেই ডানা, যা ওদেরকে আগলে নিয়ে এসে জমা করেছে এই শিলাপাহাড় আর বালুময় দেশে এবং আপাত-নির্জীবতা আবার ঝাপ্টাচ্ছে জীবনের উষ্ণতায়, বহু শতকের পরিধির উপর, আর সে প্রবল পাখা ঝাপ্টা আমাকে টেনে নিয়ে আসে এর কক্ষপথের মধ্যে এবং আমার চলে যাওয়া দিনগুলিকে এসে হাজির করে বর্তমানের ভেতরে এবং আবার আমি উট হাঁকিয়ে চলেছি প্রান্তরের উপর দিয়ে— ।

—উট হাঁকিয়ে, ধাবমান উটের পায়ের আঘাতে বজ্রধ্বনি তুলে, প্রান্তরের উপর দিয়ে, 'ইহরাম'-পরা হাজার হাজার বেদুঈনের সংগে আমি ফিরে এসেছি আরাফাত থেকে মক্কায়—সেই গর্জনশীল, পৃথিবী কাঁপানো, অগণিত ধাবমান উষ্ট্রী ও মানুষের অনিবার্য তরংগের একটি ক্ষুদ্র কণা; মানুষগুলির হাতে উঁচু দণ্ডে ঝুলানো নিজ নিজ গোত্রের ঝাণ্ডা, যা বাতাসে বাড়ি মারছে মাদলের মতো, আর তাদের গোত্রীয় যুদ্ধের চীৎকার ছিন্ন করে দিচ্ছে বাতাসকেঃ 'ইয়া রাওগা, ইয়া রাওগা'—যে-ধ্বনি তোলে আতাইবা উপজাতির লোকেরা আহ্বান ক'রে তাদের পূর্বপুরুষকে, যার জবাবে হারব গোত্র হাক ছাড়ে 'ইয় আউফ, ইয়া আউফ', এবং এর প্রায় সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে প্রতিধ্বনি ওঠে সারির একেবারে ডানদিকের বিনার থেকে 'শাম্মার, ইয়া শাম্মার'।

আমরা উট হাঁকিয়ে ছুটে চলেছি, উড়ে চলেছি প্রান্তরের উপর দিয়ে এবং আমার মনে হলো, আমরা উড়ছি বাতাসে ভর করে, এমন একটি আনন্দের মধ্যে আমরা নিজেদের হারিয়েছি যার শেষ সেই, যার সীমা নেই....এবং বায়ু আমার কানে আনন্দের এক উন্মাদ

উল্লাস ঘোষণা করে তারস্বরে ঃ 'তুমি আর বেগানা পর রইবে না কখনো—কখখনো না, কখখনো না!'

আমার ডানদিকে রয়েছে আমার ভায়েরা এবং আমার বাঁদিকে রয়েছে ভায়েরা, ওরা সকলেই আমার অজানা; কিন্তু কেউই আমার পর নয়, বেগানা নয়ঃ আমাদের লক্ষ্যাভিমুখে ছুটে চলার এই প্রচণ্ড উল্লাসে আমরা একটি মাত্র দল, একই লক্ষ্যের সন্ধানে! প্রশস্ত এই পৃথিবী আমাদের সমুখে, আর আমাদের হৃদয়ে মিটমিট করে জ্বলছে সেই শিখার একটি স্ফূলিংগ যা জ্বলেছিল মহানবীর সাহাবাদের অন্তরে। আমার ডান দিকের ভায়েরা এবং বাঁদিকের ভায়েরা—ওরা জানে যে, ওদের কাছ থেকে যা আশা করা হয়েছিলো তা থেকে ওরা পড়ে গেছে পেছনে এবং বহু শতকের পরিক্রমায় ওদের হৃদয় হয়ে উঠেছে ছোট্ট, সংকীর্ণঃ এবং তবু সাফল্যের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করা হয়নি ওদের নিকট থেকে, আমাদের কাছ থেকে...!

সমুদ্রের মতো উদ্বেলিত ভিড়ের মধ্য থেকে কোনো একজন তার গোত্রীয় চিৎকার ছেড়ে ঈমানের ধ্বনি তোলেঃ আমরা তারই ভাই, যে নিজেকে সমর্পণ করে আল্লাহ্‌র নিকট, এবং অপর একজন তার সাথে যোগ দেয়—'আল্লাহু আকবর,—আল্লাহ্ মহান।'

আর উপজাতিগুলির প্রত্যেকটি দল এই একই ধ্বনি তোলে। এই মুহূর্তে ওরা আর গোত্রীয় অহমিকায় মাতাল নয়,দি বেদুঈন নয়ঃ ওরা এমন মানুষ যারা জানে আল্লাহ্‌র রহস্য সত্যি-সত্যি অপেক্ষা করছে ওদের'জন্য...আমাদের জন্য...হাজার হাজার ধাবমান উষ্ট্রের পদধ্বনি আর শত শত ঝাণ্ডার পত্‌পত্ আওয়াজের মধ্যে ওদের চীৎকার ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয় সাফল্যের তুমুল গর্জনেঃ আল্লাহু আকবর।

এ গর্জন প্রবল বিশাল তরংগের আকারে প্রবাহিত হয় উটের পিঠে ধাবমান হাজার হাজার মানুষের উপর দিয়ে, বিশাল বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়ে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি কিনার পর্যন্ত ঃ 'আল্লাহু আকবর!' এই লোকগুলি ওদের ক্ষুদ্র তুচ্ছ জীবন ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছে বৃহৎ, আর ওদের ঈমান এখন ওদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সামনের দিকে, একত্বে, কোনো জরিপ করা হয়নি এমন সব দিগন্তের দিকে....আকাংখা এখন আর ছোট্ট এবং গোপন থাকবে না; এর জাগরণ হয়েছে,— চোখ ধাঁধিয়ে দেয়া সাফল্যের সূর্যোদয়! মানুষ তার এই সাফল্যের দীর্ঘ পদক্ষেপে আগিয়ে চলে, আল্লাহ্‌র দেয়া সকল গৌরব ও দীপ্তির সংগে; তার পদক্ষেপই তার উল্লাস, তার জ্ঞানই মুক্তি, আর তার পৃথিবী এমন একটি মণ্ডল যার নেই কোনো সীমা...।

উষ্ট্রীগুলির দেহের গন্ধ, তাদের নিঃশ্বাস এবং হ্রেষাধ্বনি, তাদের অগণিত পায়ের আঘাতে ওঠা বজ্রের আওয়াজ, মানুষের চীৎকার, জীনের পেরেক থেকে ঝুলানো রাইফেলের টুং টাং, ধূলিবালি আর ঘাম, আর আমার চারপাশে বেপরোয়া উত্তেজিত সব চোখ মুখ; এবং আকস্মাৎ আমার ভেতরে এক আনন্দময়, সুখকর প্রশান্তি।

আমি আমার জীনের উপর ঘুরে বসি এবং আমার পেছনে দেখতে পাই হাজার হাজার সাদা কাপড়-পরা উট সওয়ারদের, ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে ভেঙে পড়া জটলা পাকানো ভিড় এবং ওদের ছাড়িয়ে সেই সেতুটি, যার উপর দিয়ে আমি এসেছিঃ এর শেষপ্রান্ত রয়েছে ঠিক আমার পেছনে আর এর শুরু ইতিমধ্যেই হারিয়ে গেছে দূর ব্যবধানের কুয়াশায়।

Author (1932)
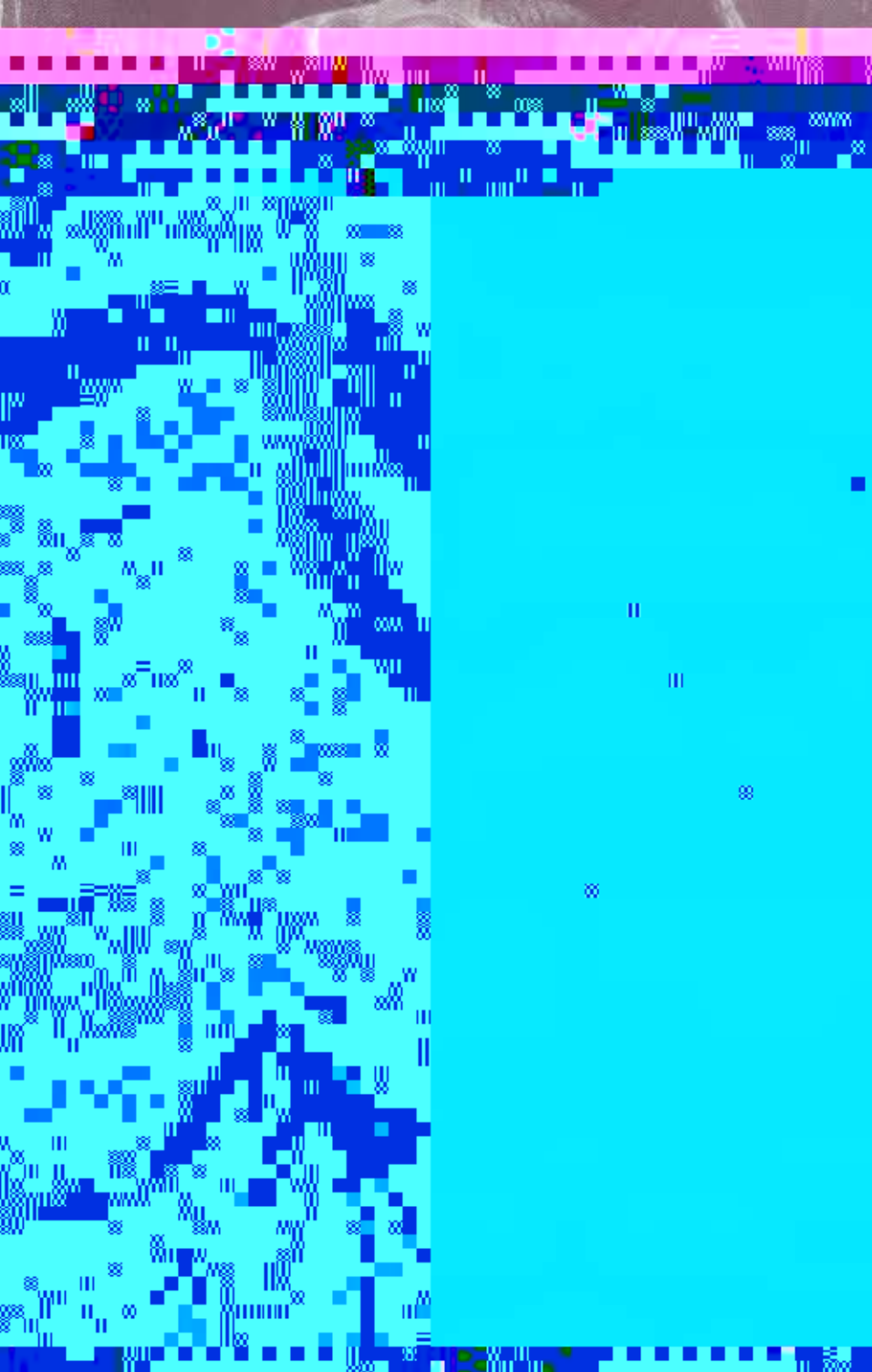
Author's Arab Wife Munira and Son Talal (1932)

Crown Prince Saud

তিনি তাঁদের মধ্যে আবিষ্কার করেন হৃদয়ের

[illegible]
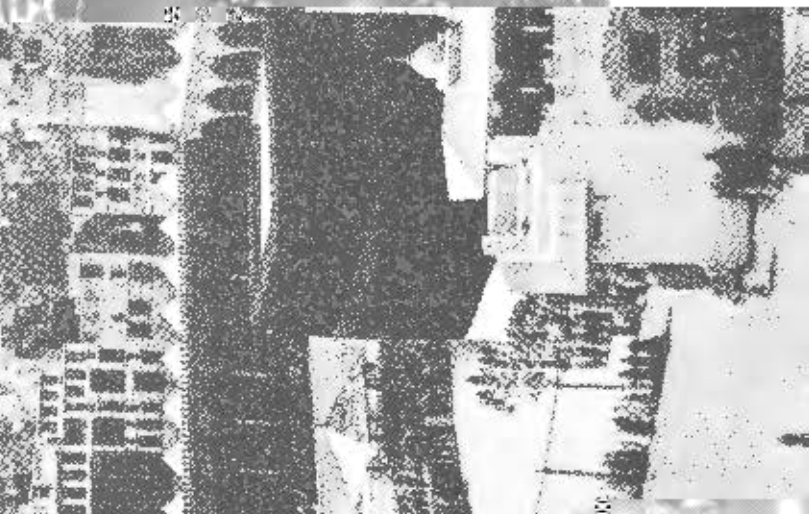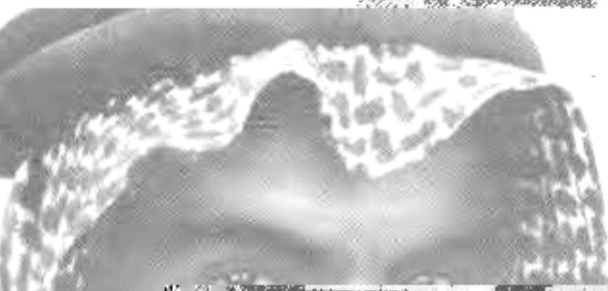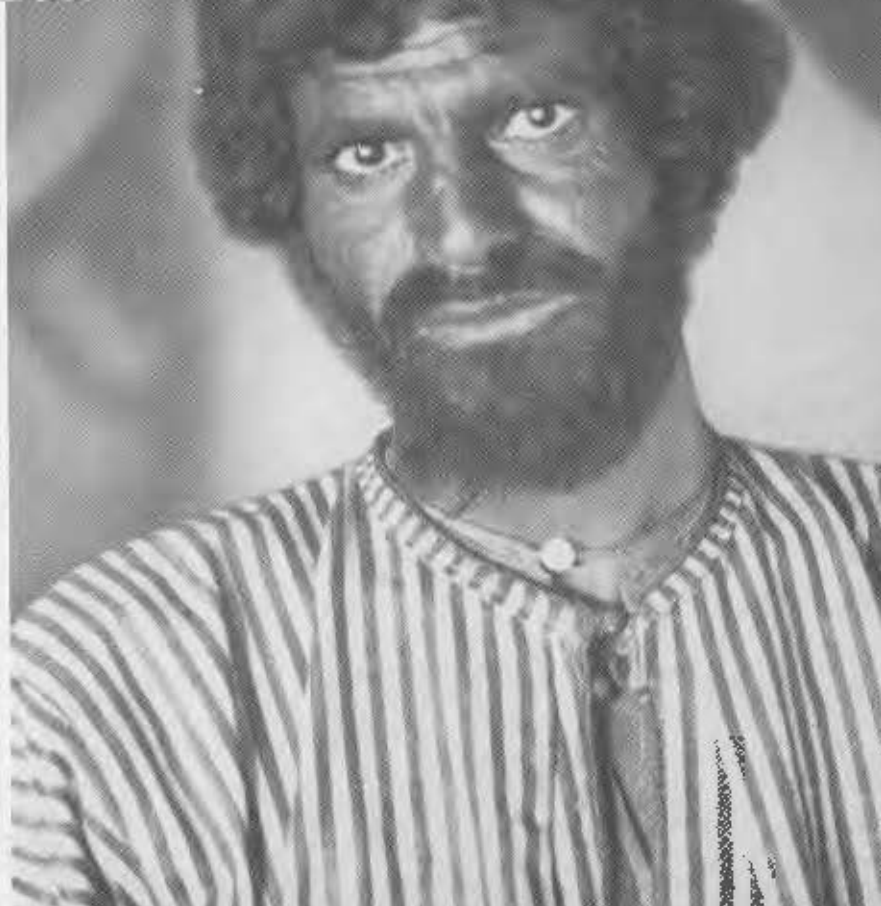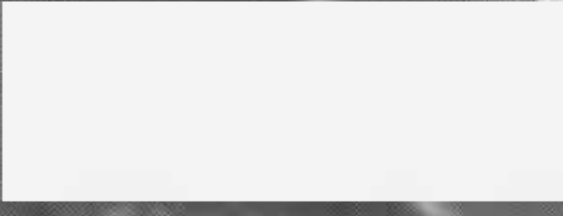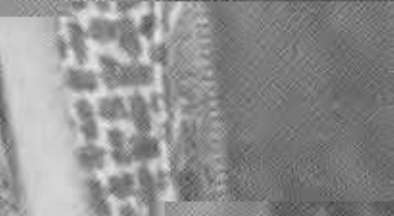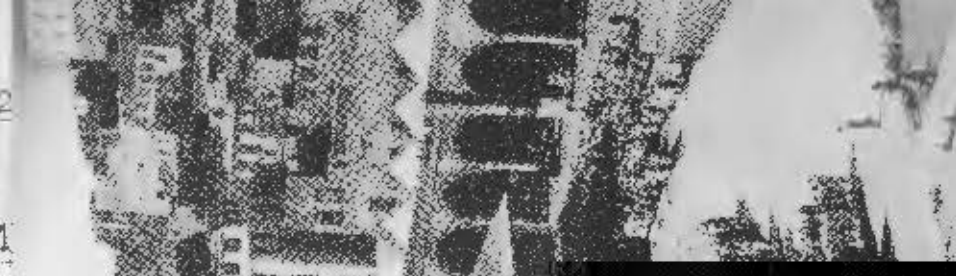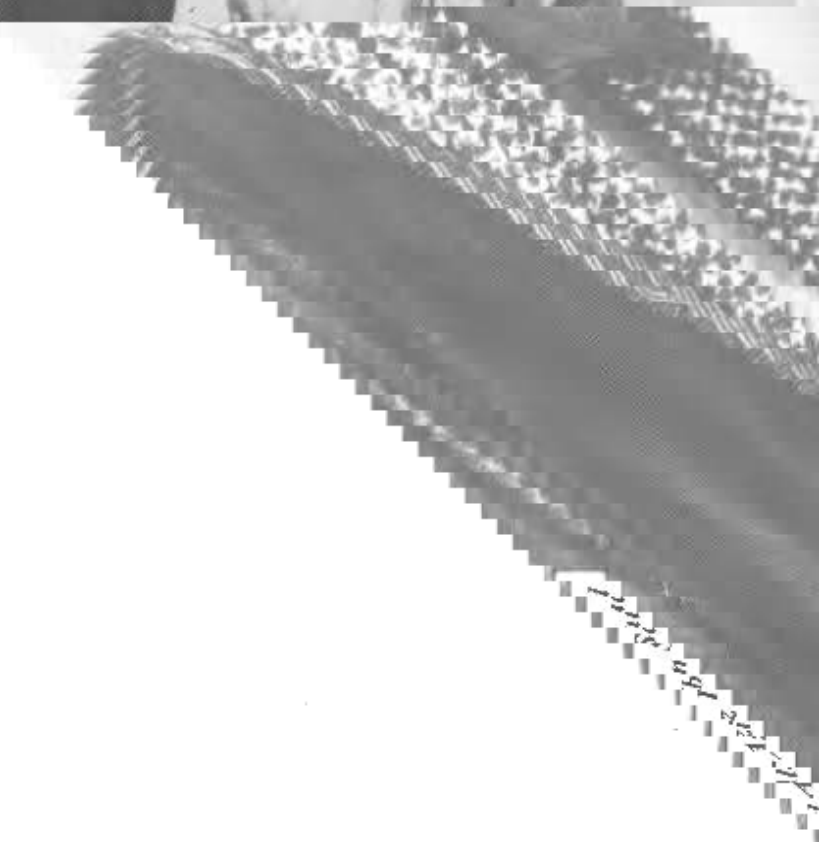
যে যুক্ত ইউরোপীয়দের স্বপ্নের অগোচর। এ

বিশ্বাসের প্রতি অনুরক্ত হয়ে তিনি ১৯২৬ সনে

[illegible]

করেন।